স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

বেলাল মোহাম্মদ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

বেলাল মোহাম্মদ

অনুপম প্রকাশনী

উৎসর্গ

একাত্তরের একচ্ছত্র বঙ্গবন্ধুকে

চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গে

বর্তমান সংস্করণে শব্দ সৈনিকদের যুদ্ধকালীন চলাপথ-নির্দেশক ৫টি মানচিত্র সংযোজিত হলো ।

'অনুষঙ্গ-৩' শীর্ষক ৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ১২টি প্রতিবাদী নিবন্ধ (২য় সংস্করণের ৭টি+ পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের ৫টি) বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হলো।

'অনুষঙ্গ-৪ : আমরা দশজন' শীর্ষক প্রতিবেদনটি 'পরিচিতি' শিরোনামে পুনর্লিখিত এবং এই সংস্করণে 'অনুষঙ্গ-৩'-এ বিন্যস্ত করা হলো। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দ সৈনিকদের অনবরত পরিবর্তনশীল হাল-নাগাদ তথ্যের চেয়ে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালীন অবস্থানকেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়েছে।

বেলাল মোহাম্মদ

০৪.১২.২০০২

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

প্রথম প্রকাশের প্রায় এক দশক পরে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো । এই দীর্ঘ সময়ে গ্রন্থটির চাহিদা লক্ষ্য করা গেলেও প্রথম প্রকাশকের অসামর্থ্য এবং দ্বিতীয় কোনো প্রকাশকের অনাগ্রহের কারণে এক্ষেত্রে উদ্যোগী হবার উপায় ছিল না ।

এই গ্রন্থের রচনাকাল এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ উল্লেখিত হলেও ঐ সময়কালটি প্রকৃতপক্ষে ১৯৭২ সাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কৃত রচনাবলীর চয়নকাল। কর্মজীবনে ১৯৮২ সালে প্রথমবারের মতো ঢাকায় পদস্থ হবার পর আমার আশপাশে জুটে গিয়েছিলেন কতিপয় বৈঠকি তরুণ শ্রোতা। এঁরা মহান একাত্তরের ন'মাসের কথা শুনতে আগ্রহী । এক পর্যায়ে খালেক বিন জয়েনউদ্দিন প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমি যেন এই ঘটনার কথা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করি । আমি বলেছিলাম, লিখলেই প্রকাশের প্রশ্ন উঠবে। আমি তো প্রকাশকের কাছে ধর্না দিতে পারবো না। সচরাচর পত্র-পত্রিকায়ও উপযাচক হয়ে লেখা পাঠানোর ব্যাপারে আমার যথেষ্ট কুণ্ঠা আছে । তাছাড়া আমি তাৎক্ষণিকতার প্রভাব কাটাতে পারি না। আজ যা লিখছি, তা পাণ্ডুলিপি আকারে দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে পরে আবার পুনর্লিখন বা পরিমার্জন অনিবার্য হবে, যা বিড়ম্বনাকর । উৎসাহী তরুণরা আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন, যেদিন আমার পাণ্ডুলিপি তৈরি হবে, সেদিনই প্রেসে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। ঢাকার সেরা প্রকাশকের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করে রাখবেন। তা আর হয়নি। তবে বৈঠকি শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন সেলু বাসিত এবং তাঁর বন্ধু আবদুল আজীজ। একটি ক্ষুদে ছাপাখানার মালিক আবদুল আজীজ সসঙ্কোচে জানিয়েছিলেন, তিনি আমার গ্রন্থটি দিয়ে তাঁর ফুলদল প্রকাশনীর কর্মযাত্রা শুরু করতে আগ্রহী। বেশ তো, সেই ডিসেম্বরেই (১৯৮৩) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। তরুণ প্রকাশকের সদিচ্ছার কার্পণ্য ছিল না, তবে বিপণন বৈদগ্ধের ঘাটতি ছিল। ইতোমধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে টাইটেল পেজটি পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রকাশের ছলে গ্রন্থটির মূল্যবৃদ্ধি করেও তিনি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি বলে স্বীকারোক্তি করেছেন। প্রথম প্রকাশকের প্রতি আমি সমমর্মী, তাই লেখক-প্রকাশকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্তাবলী আমার দিক থেকে অনবরতই উপেক্ষিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উপলক্ষে গ্রন্থটির বেশ কিছু সংস্কার সাধন করা

হলো। অবশ্য শুধু পরিমার্জন ও পরিবর্জন, কোনো নতুন সংযোজন নয়। তবে অতি সম্প্রতিকালে মতলববাজ মহলের দ্বারা মহান একাত্তরের ব্যাপক তথ্য-বিকৃতির হিড়িকে কোনো কোনো খ্যাতনামি ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত হতে লক্ষ্য করা গেছে। সেই প্রেক্ষিতে আমার প্রতিবাদী ভাষ্যমূলক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাতটি নিবন্ধ গ্রন্থের অনুষঙ্গ অংশে সংযোজিত করা হলো, যা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংগে একান্ত সম্পৃক্ত এবং পুনপুনরুক্তি বিশেষ ।

পরিমার্জন প্রসঙ্গে প্রধানত স্থানে স্থানে একই ব্যক্তি বা মহল সম্পর্কিত তথ্যকে বিক্ষিপ্ত অবস্থান থেকে এক স্থানে সংবদ্ধ ও পুনর্বিন্যস্ত করা হলো। এছাড়া একগুচ্ছ কবিতা অনুচ্ছেদ অংশ থেকে গ্রন্থের অনুষঙ্গ অংশে স্থানান্তরিত এবং তাৎক্ষণিকতার তাগিদে লেখা কিছু কিছু অতিকথন সংক্ষেপিত বা পরিবর্জিত হলো।

পরিবর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে যতোটা সম্ভব পুনপুনরাবৃত্তি এড়ানো যায় । প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৩ সালে দ্রুত হাতে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি নির্মাণকালীন প্রথম পাঠক ছিলেন আমার অগ্রজ এ এ এম ইউসুফ। কোনো প্রয়াত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কথা লেখা হলেই তিনি সে কথার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবদ্দশায় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার নিবন্ধ বা সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি সন্নিবেশনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ২৭ মার্চ মেজর জিয়াকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পটিয়া থেকে কালুরঘাটে নিয়ে আসা এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা প্রচারের প্রস্তাব দেয়া ও ঘোষণালিপি প্রণয়নে সহযোগিতা করার বিষয়টি মে ১৯৮২ সালের আগে আমার কোনো লেখায় বিধৃত হলে তা আবশ্যিকভাবে উল্লেখ্য। হ্যাঁ, ১৯৭২ সাল থেকেই আমি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন লেখায় এবং সাক্ষাৎকারে এই সত্যটি বারবার উচ্চারণ করেছি। এবং ১৯৭৯ সালেই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখসহ আমার ‘পুনরুক্তি করে বলা' শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, যা বর্তমান সংস্করণে পরিবর্জিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে রক্ষিত নথি থেকে তথ্য- সম্ভার অনুলিপি করে দিয়ে সহযোগিতা করেছিল তিন তরুণ সর্বশ্রীমান মোহাম্মদ শাহপানা, এহতেশামুল হক হায়দার চৌধুরী ও জেড কে আনন্দ। সেসব তথ্য-সম্ভার থেকে হুবহু উদ্ধৃত একটি দিনপঞ্জিকল্প দীর্ঘ বিবরণী নিষ্প্রয়োজন পুনরাবৃত্তিমূলক বিবেচিত হওয়ায় পরিবর্জিত হলো। এছাড়া বাহুল্য বোধ হওয়ায় গ্রন্থের শেষাংশের ১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ‘নাম-নির্ঘণ্ট’ অনুষঙ্গটিও পরিত্যক্ত হলো।

আমি মনে করি, আমরা যারা আদৌ ঐতিহাসিক নই, বরং ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা সংগঠক, আমাদের বর্ণনাকে সততা ও সাহসিকতাপূর্ণ দলিল হিসেবে গবেষকদের জন্যে সংরক্ষণের মানসে, আমাদের পরিবেশনা স্বয়ং প্রত্যক্ষকৃত বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকা সুকর্তব্য। এই বিবেচনায়, বর্তমান সংস্করণে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার সম্পৃক্ত বিষয়ে সহকর্মী আশফাকুর রহমান খানের বর্ণনাটি পরিবর্জিত হলো। একইভাবে চট্টগ্রাম বেতারের সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং ১৯৭০ সালের ৭ জুন ঢাকার জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ- উত্তেজনা ও তার নিরসনের জন্যে বঙ্গবন্ধুর বেতার ভাষণ প্রসঙ্গে সহকর্মী আবদুল হালিম সরদারের বর্ণনাসমূহও পরিবর্জিত হলো। তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত একটি বিষয়— পটিয়া থেকে রামগড় সীমান্তে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি স্থানান্তর সম্পর্কে দশজন প্রতিষ্ঠাতা কর্মীর অন্যতম রাশেদুল হোসেন ও আমিনুর রহমানের বর্ণনা সংগত কারণেই সংযোজিত রাখা হয়েছে। এছাড়া অপর একটি তথ্য-অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-কর্মী শারফুজ্জামানের ২৪ মে আগরতলা থেকে প্রচার-সম্ভারসহ যাত্রা করে ২৫ মে ১৯৭১-এ কলকাতায় উপনীত হবার বিবরণ নতুন সংযোজিত হলো । প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দশজনের খণ্ডস্মৃতিই তো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তথ্য-বিবরণী I

এই সংস্করণের নতুন সংযোজনী প্রামাণ্য চিত্রসমূহ শ্রী মনোরঞ্জন দাস, শ্রীমান মেরাজ তাহসিন শফী ও শফিউর রহমান দুলু এবং কবি কাজী সালাহউদ্দীনের সৌজন্যে প্রাপ্ত ।

কম্পিউটারে বর্ণ বিন্যাস এবং পরিমার্জন-পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থের কলেবর কিছুটা ক্ষীণতর হলো।

এই সংস্করণে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে বানান সংস্কারের। এক্ষেত্রে প্রীতিভাজন সাঈদ আহমদ আনীস, আইয়ুব হোসেন ও তরুণ কুমার মহলানবীশকে স্বতঃস্ফূর্ত আনুকূল্য দানের জন্যে ধন্যবাদ।

এবারে অনুপম প্রকাশনীর নাম এবং শ্রীযুক্ত মিলন নাথের বিপণন বৈদগ্ধ এই গ্রন্থের বিপুল কাটতির সহায়ক হবে, এই লেখকের এইটুকু প্রত্যাশা ।

বেলাল মোহাম্মদ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯

১৩ জুন ১৯৯২

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

'Anybody can make history, only a great man can write it.'

Oscar Wilde.

ব্যক্তির জীবনে, কখনোবা জাতীয় জীবনে, ঘটনা প্রবাহের সংঘাতে কিংবা পারম্পর্যে এমন কোনো অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যখন ব্যক্তি আর ব্যক্তি থাকে না, আবার সমষ্টি আর কল্পিত জড়পিণ্ডের বার্তাবহ থাকে না— ব্যক্তি ও সমষ্টি একাকার হয়ে যায় এক অপরূপ অস্তিত্বের মহিমায়। ব্যক্তি যদি এ মুহূর্ত চিহ্নিতকরণে ব্যর্থ হয়, সমষ্টি যদি ব্যক্তির আবির্ভাব প্রত্যাশায় নিস্পৃহ থাকে, তাহলে সার্বিক অর্থেই একটি জাতি নিজস্ব প্রাণস্পন্দন প্রতিষ্ঠায় নিদারুণ হতাশার বিবরে নিপতিত হয়। ব্যক্তির জীবনে এহেন অবস্থা যেমন সত্যি হতে পারে তেমনি রাষ্ট্রীয় কিংবা জাতীয় জীবনেও। এর ব্যতিক্রমও হতে পারে । আর ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির কারণেই ঘোর দুর্দিনের বিষণ্ন অবস্থার পচনশীল প্রক্রিয়া থেকে জাতি বেঁচে যেতে পারে। টি. এস. এলিয়ট যথার্থই বলেছেন, an age of prudence can never retract a moment's surrender. অন্যায়ের কাছে, শোষণের কাছে, অনাচারের কাছে নতজানু হওয়া, এমনকি মুহূর্তের জন্যে হলেও, জীবনব্যাপী সাধনা কিংবা অজস্র বছরের নিষ্ঠাকেও অর্থহীন করে তুলতে পারে। অতএব এখানে প্রয়োজন হলো নির্ভেজাল দেশপ্রেমের। প্রয়োজন হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল অস্বীকার করে সমষ্টির স্বার্থে আত্মপ্রসাদ অনুভবের তাবৎ উপাদান বিসর্জন দেয়া। এ ধরনের কাজ মোটেই সহজসাধ্য নয়। যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভবপর হতে পারে, অমন কথাও বলা যায় না। এর জন্যে সময়, পরিবেশ, সুযোগ, সুবিধেজনক অবস্থানসহ ইত্যাকার বিষয়াদির বিবেচনা উপেক্ষণীয় নয়। ইতিহাস বোধ করি এ দিকটির এক অনিবার্য নিয়ন্ত্রক । ইতিহাস কখনো কখনো সুযোগ সৃষ্টি করে, আর বিজ্ঞ ও সাহসী ব্যক্তি এর সদ্ব্যবহার করেন।

বেলাল মোহাম্মদ নিজে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, নাকি ইতিহাস এর এক ভয়ংকর মোড় পরিবর্তনের লগ্নে এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করার মাধ্যমে তাকে এক ঐতিহাসিক চরিত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন— এসব আলোচনা ভাবীকালের ঐতিহাসিকরা নির্ধারণ করবেন । তবু আমরা যেহেতু স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী এবং যেহেতু মহাকাল আমাদেরকে দুঃখ-যন্ত্রণা এবং

জাগরণ-সংঘাত-সৃষ্টি নৈপুণ্যের এক ভয়ংকর সুন্দর মুহূর্তে মানবিক বিকাশের উত্থান-পতনের প্রলয় দেখার সুযোগ দিয়েছিলো, সেহেতু আমরা যদি আমাদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতার কিছু ছাপ রেখে যাই তাহলে তা অনাবশ্যক বিবেচিত হবার নয় এবং সে সুবাদেই বলছি। সুন্দর, প্রশান্ত ও সৌম্য চেহারার অধিকারী বেলাল মোহাম্মদ যিনি জীবনভর সাদা পাঞ্জাবির সাথে ধবধবে সাদা লুঙ্গি পরিধান করেন এবং জীবনের প্রতি যার নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গি, তিনি কি করে জাতীয় সংগ্রামের রক্তাক্ত মুহূর্তে এক অনন্য কর্ম সাধিত করে ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়। অবশ্য একথা ঠিক, বঙ্গোপসাগরের বক্ষে শান্তসুনিবিড় সন্দ্বীপ— দিগন্ত বিস্তৃত সাগর সন্ধানী পটভূমি— রোমক-সভ্যতার স্পর্শে বেড়ে ওঠা, মহাবিপ্লবী কমরেড মুজফ্ফর আহমদ-এর স্মৃতি বিজড়িত দ্বীপ তাঁর মানস রূপায়ণে সাহায্য করেছে। সম্ভবত এ কারণেই তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের চাটগাঁ কেন্দ্রে অতি সামান্য দায়িত্বে কর্মরত থেকেও তিনি জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু কোনো সে সঠিক সিদ্ধান্ত যা অতোটা উচ্চকণ্ঠ প্রশংসার দাবিদার? সে কথাই বলা হচ্ছে। আবার এ কথা আলোচনার আগে প্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রবাহ বৈচিত্র্যে পরিভ্রমণ করা খুবই জরুরি। একটি বিতর্ক প্রায়ই শোনা যায়। আর বিতর্কটি হচ্ছে স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে। কেউ বলেছেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবার কেউ বলেছেন মেজর জিয়াউর রহমানের নাম। কোনো ঐতিহাসিক তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য জেনে এবং ঘটনাক্রমে সেসবের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও যদি কোনো ব্যক্তি বা মহল ভিন্নতর কথা বলে, অপিচ মিথ্যেকে সত্যি বলে চালানোর অপচেষ্টায় মেতে ওঠে তাহলে তা গুরুতর অপরাধ কিনা বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সহসা সংঘটিত কোনো সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি নয়। নেতা ও জনতার পারস্পরিক জানাজানি ও বিশ্বাসের সৌরভে বেড়ে উঠেছে গণ-আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত একটি প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী সরকারি যন্ত্রের সমান্তরাল আরেকটি ছায়া সরকার চালিয়ে যেভাবে বঙ্গবন্ধু জনতার আন্দোলনকে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে প্রসারিত করেছিলেন কিংবা ধাবিত করে দিয়েছিলেন, এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর যে কোনো জাতির ইতিহাসে বিরল। অথচ প্রশ্ন ওঠে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিনা— এমনকি

৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের পরেও। তদুপরি একথা জেনেও যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬শে মার্চ-২৭শে মার্চ নয় । জিয়াউর রহমান চাটগাঁয়ের কালুরঘাট বেতার স্টেশন থেকে ২৭শে মার্চ সন্ধেবেলা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাছাড়া এটা নিতান্ত হাস্যকর, কীভাবে আট কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর সমান্তরাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে মেজর জিয়াকে দাঁড় করানোর হীন ষড়যন্ত্র আজও চলতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত লেখক রবার্ট পেইন তাঁর 'ইনজিউরড্ এন্ড দ্য ড্যামড' গ্রন্থে বন্ধুবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মুহূর্তটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন । তাছাড়া চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা কীভাবে ২৬শে মার্চ বেতার কেন্দ্রে এসে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচার করেছিলেন, এর বিবরণ বেলাল মোহাম্মদ দিয়েছেন। একথা মিথ্যে নয়, মেজর জিয়া বেলাল মোহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়ে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এ ঘটনার ইতিহাস খাটো করে দেখার নয়। সহসা আঘাতে বিপর্যস্ত ও রক্তাক্ত জাতির বিভ্রান্তিকর অবস্থা নিরসনে উক্ত ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তাই বলে বিবেকসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ কথা বিবেচনারই প্রশ্ন ওঠে না যে, মেজর জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। যা হোক এসবের মনোমুগ্ধকর বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে রয়েছে। সচেতন পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থটিই যথেষ্ট বলে দাবি করা যায় ।

২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে ঢাকায় যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা অভাবিত তৎপরতার সাথে মারণযজ্ঞে লিপ্ত হয় তখন তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের 'পূর্ব পাকিস্তানের' জন্যে নির্ধারিত আসনের ১৬২টির মধ্যে ১৬০টি দখল করেছিলো। তাছাড়া আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ছ'দফাই মূলত পরবর্তীকালের অনিবার্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ভিত প্রতিষ্ঠা করেছিলো। ২৬শে মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বর্বরোচিত দম্ভোক্তি করে বলেছিলেন— This time Sheikh Mujib shall not go unpunished — অর্থাৎ এবার আর শেখ মুজিবকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়া হবে না। এয়ার মার্শাল আজগর খান, যাকে পাকিস্তানের সমষ্টিগত শুভচেতনা ও বিবেকের কণ্ঠস্বর বলে চিহ্নিত করা যায়, তাঁর General in Politics গ্রন্থে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য নেতৃত্বের পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন করে লিখেছেন — The atmosphere in Dacca was highly charged. The authority of

the central Government had almost closed to exist except in the Kurmitola Cantonment. Strikes were being held in Mujibur Rahman's orders and were totally success- ful, paralising the life in the city. Official business, banks and government offices could not function unless he so willed.' (পৃ: ৩৫)

যাহোক, কথা হচ্ছিল বেলাল মোহাম্মদ-এর সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে। প্রতিটি কাজের জন্যে একটি সঠিক মুহূর্ত থাকে । আর এ সঠিক মুহূর্তের মূল্যায়ন যতোটা সহজ শোনায় আসলে কিন্তু ততোটা সহজ নয়। সঠিক সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি ব্যক্তি জীবনে যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমন বিপর্যয়ের সূচনা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্ধকার আর বেদনার ছড়াছড়ির পেছনে রয়েছে সঠিক মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপরাগতা । বর্তমান যুগে বিশেষত: জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে; বেতার স্টেশন বা রেডিও ছাড়া আর কোনো আন্দোলনই সর্বস্তরে মানুষের কাছে আবেদনশীল হয়ে ওঠে না। মুক্তিযুদ্ধকালে সমস্ত প্রচার যন্ত্রটাই ছিলো দখলদার পাকিস্তানিদের হাতে। ২৬শে মার্চ ভোরবেলা আকাশবাণীর ইংরেজি খবরে বলা হয়েছিল — West Pakistan has attacked East Pakistan. এছাড়া রেডিও অস্ট্রেলিয়া প্রায় একই ধরনের খবর প্রচার করেছিলো। কিন্তু এসব বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল শুধু কেনো; খোদ ঢাকা শহরেই বোঝা যায়নি কেনো সর্বগ্রাসী আগুনের খেলা চারদিকে চলছে। বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে তেমন কিছু জানা সম্ভবও ছিলো না। বেলাল মোহাম্মদ একজন স্বভাব-কবি। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘর্ষ চলাকালেও তিনি কেবলমাত্র রেডিওর খবর শুনে রণাঙ্গন সম্বন্ধে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করে খবর প্রচার শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা প্রচার করতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এককভাবে তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত সন্তান একথাও মানি যে আরো ন'জন বেতার কর্মী তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই একেকটি ঐতিহাসিক চরিত্র। বেলাল মোহাম্মদের অগ্রণী ভূমিকার কথা তবুও থেকে যায়। চারদিকে যখন ভয়াল অন্ধকার মৃত্যুর কালো ছায়া বাংলার শস্য শ্যামল প্রান্তরকে গ্রাস করছিলো তখন যদি বেলাল মোহাম্মদ কোনো এক অলৌকিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং নিজের ও পরিবারের অনিবার্য ধ্বংসের সম্ভাবনাকে আমল না দিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা না করতেন তাহলে সত্য রক্ষার খাতিরে বলতেই হয় যে বাঙালিদের পক্ষে অতো দ্রুত সংগঠিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব হতো না। জীবনের প্রতি মারাত্মক

ঝুঁকি নিয়ে মেজর জিয়া বেলাল মোহাম্মদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। পরিস্থিতির ব্যাখ্যা যাই হোক না কেনো, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ পালনে জিয়ার ভূমিকা গৌণ নয় ।

বেলাল মোহাম্মদ-এর নাম বাঙালি জাতির ইতিহাসে অম্লান থাকবে— এমনকি স্বল্পকালীন সময়ের বৈরী পরিবেশের প্রতিকূল উচ্চারণ সত্ত্বেও। বেলাল মোহাম্মদ অধুনালপ্ত 'বংগবার্তা' পত্রিকার বিজয় দিবস সংখ্যায় (১৯৭৩) 'বেতার সংগ্রামের স্মৃতিচারণ' নিবন্ধে লিখেছেন .....নামকরণ ও পরিকল্পনা সহকারে উদ্বোধনী অধিবেশন প্রচার করা হয় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ৭.৪০ মিনিটে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে। প্রথম দু'দিন নামের সঙ্গে 'বিপ্লবী' শব্দটি যুক্ত থাকে, যা মেজর জিয়াউর রহমানের পরামর্শে প্রত্যাহৃত হয়। মেজর আমারই ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আহবান ক্রমে ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় ট্রান্সমিটার ভবনে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্থায়ী প্রহরা এবং বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার জন্যে এগিয়ে আসেন....'

চাঁটগায়ের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ লিখেছেন— ''বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ । বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর প্রেম তাঁকে এমনই দুঃসাহসী করে তোলে যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তিনি একক প্রচেষ্টায়, নিজের বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে চট্টগ্রামে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানাবার ব্যবস্থা করেন।.....২৬শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে জীবন বিপন্ন করে যদি তিনি ''স্বাধীন বাংলা বেতার' প্রতিষ্ঠা না করতেন তবে সে বেতারের জন্ম হতো কিনা সন্দেহ।...তিনি জাতির গৌরব....' ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম স্তম্ভ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী এম. আর সিদ্দিকী লিখেছেন '...বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম উদ্যোক্তা-সংগঠক-পরিচালক ।' মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে যিনি বা যারা ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন কিংবা যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের সূচনা করেন, তিনি বা তাঁরা মহাকালের বুকে নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে যান। বঙ্গবন্ধু জীবিতকালে স্বাধীন বাংলা বেতার-এর বেলাল মোহাম্মদসহ প্রথম দশজন কর্মীকে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর বাস্তবায়িত হয়নি । ৩০ লাখ

মানুষের রক্তক্ষরণের পরেও জাতি এর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে পারেনি। কেনো পারেনি সেসব ঘটনাপ্রবাহ একদিন ইতিহাস বিচার করবে। আর তখনি হয়তো স্বাধীন বাংলা বেতার-এর বেলাল মোহাম্মদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের যথাযথ মূল্যায়নে জাতীয় ব্যর্থতার পটভূমি জনসমক্ষে আলোকিত হয়ে উঠবে। গ্রন্থটি প্রামাণ্য উদ্ধৃতিতে ভারাক্রান্ত। তা-ই স্বাভাবিক ছিলো। কেননা বেলাল মোহাম্মদ মূলত স্মৃতিকথা লেখেননি। এ গ্রন্থ হচ্ছে ভাবীকালের মানুষের জন্যে এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত কথিকামালার সংযোজন খুবই সঠিক হয়েছে। বিধ্বস্ত মানসিকতা নিয়ে দুর্জয় সংকল্পের সাহচর্যে বিরচিত সেসব কথিকা মুজিবনগরে পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিলো । এসবই আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের এক বিশিষ্ট দিক হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। হতাশার বিবরে অবস্থান করেও মহান মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক বেলাল মোহাম্মদ যে সুললিত ভাষা ও রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যে এই গ্রন্থে প্রাণ সঞ্চার করেছেন তা ভেবে অবাক না হয়ে গত্যন্তর নেই ।

ঢাকা

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩

সিদ্দিকুর রহমান

সূচিপত্র

নং	নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	'আমি একাত্তরের লোক'-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়জাদুঘর— দলিল হস্তান্তর— তথ্য সংরক্ষণ ও নাম-তালিকা প্রস্তুতকরণ কমিটি'একাত্তরের রণাঙ্গন' গ্রন্থ— প্রেরণার উৎস— বেতার সংগ্রাম কমিটি-বাংলা ভাষায় প্রচলন	১৭-২৬
২	প্রস্তুতি কার্যক্রম— 'জরুরি ঘোষণা' : শেখ মুজিবুর রহমান— 'স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী) বেতার কেন্দ্র' :উদ্বোধনী অধিবেশন— 'এই দিনটি আমার দিন'	২৮-৩৫
৩	'হ্যালো ম্যানকাইন্ড'- — মেজর জিয়ার ঘোষণা	৩৬-৪২
৪	১-কি. ও. ট্রান্সমিটার প্রসঙ্গে— কতিপয় ক্যাপ্টেন টিক্কা খান নিহত (?)—মেজর জিয়ার দ্বিতীয় ঘোষণা— প্রথম কথিকা	৪৩-৪৭
৫	মাহমুদ হোসেন প্রসঙ্গ— বিমান হামলা— 'এখন খবর বলি'	৪৭-৫৪
৬	১-কি. ও. ট্রান্সমিটার ডিসমেন্টেল করা— পটিয়ায় দুইদিন- রামগড় অভিমুখে-প্রতিষ্ঠাতা কর্মী হিসেবে গ্রাহ্য— সাক্ষাৎকার	৫৪-৬০
৭	সীমান্ত পারাপার	৬০

৮	আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা— বাগাফা-দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান প্রচার শর্ট ওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে— দশজন কর্মীর দ্বিধাবিভক্তি	৬২-৬৪
৯	শালবাগান অভিমুখে	৬৫-৬৭
১০	ট্রানজিট ক্যাম্প— কর্নেল চৌমুহনী উপস্থিতি	৬৯-৭১
১১	সার্কিট হাউসে রেকর্ডিং-বেতারের ইথিক্স — জামাকাপড়— 'কণ্ঠস্বর-শব্দ সৈনিকেরে'	৭১-৭৫
১২	ডাক্তার শফী প্রসঙ্গ— মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পিং— ঝগড়াঝাঁটি	৭৫-৭৭
১৩	জেলে রোডের বাড়ি— লালমোহন— আমার আব্বা	৭৮-৭৯
১৪	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ-'স্বাধীন বাংলা বেতার	৭৯-৮৩
১৫	কেন্দ্র'— আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী-নন্দিনী সৎপথী— ড. ত্রিগুণা সেন'পাক লোকশিল্পী পরিষদ'— ডুপ্লিকেটিং মেশিন— 'যাদের হারায়ে খুঁজি' 'না মুক্তিযোদ্ধা না বুদ্ধিজীবী' লেনিনের ছবি	৮৩-৯৪
১৬	'লায়ন কলির'— প্রত্যয়নপত্র	৯৪-৯৬
১৭	ঢাকা থেকে "সিনিয়র অফিসার— মুজিবনগরে এডভান্স গ্রুপ — কিউ শিট— ১ কি. ও ট্রান্সমিটার ইনস্টল করা— লিফলেট	৯৭-১০৭

১৮	কলকাতায় উপস্থতিি— বালগিঞ্জরে বাড়ি— 'অপূর্ব মাতৃভক্তি'— রকের্ডিং স্টুডওি শষে সংবাদ বুলটেনি— গানরে বাণী বতোররে নীতমিালা— দক্ষিা— 'জনযুদ্ধ'	১০৭-১১৪
১৯	ফক্সিড পয়ন্টে— 'কোটি প্রাণ এক প্রাণ'— বাইশে শ্রাবণ— গানরে তালকিা— পুঁথপিাঠ— কালামে পাক	১১৪-১২৬
২০	বলোল মোহাম্মদ, এম-এন-এ (?)— আগরতলা ক্র্যাফট্স্ ইনস্টটিউিট— মুক্তযিুদ্ধে নতেৃত্ব ১৯৭৬-এর একুশে-'পুনরুক্ত িকরে বলা'	১২৮-১৩৪
২১	নয়িমতান্ত্রকি নযিুক্তি— 'বলোল তো পাইওনয়িার মুজবিনগররে হাজি'- 'অভমিত'— কর্মীদরে তালকিা— ঈদবাণী— আই আরস— প্রত্যক্ষদর্শীর ববিরণী— কুমদোন বাগান লনেরে বাড়ি	- ১৩৪-১৪৬
২২	ঐক্যফ্রন্ট— কমরডে মুজফফর আহমদ প্রসঙ্গ	১৪৬-১৫১
২৩	আমার খালা— 'জয় বালার গুণ্ডা'— আমরেকিা প্রবাসী কাকা— 'এলমে আপন দশে'— আন্তর্জাতকি ডাকটকিটি	১৫১-১৫৪
২৪	প্রতনিধিরি কণ্ঠ— দপ্তররি কাজ— 'অ্যানাইহলিশেন'	১৫৪-১৫৬
২৫	'ডকুমন্টোরি ফল্মি ডাইরক্টের— আমি কি আপনার এজন্টে, স্যার?— 'পূর্ব পাকস্তিানরে কমউিনস্টি পার্টরি মুখপত্র— ফটো:যুগান্তর — Bangladesh Unchained গ্রন্থ	১৫৬-১৫৯

২৬	শখে কামাল প্রসঙ্গ — স্বাধীন বাংলা বতোর কন্দ্ররে সূতকিাগার— বদরবাহনিীর আস্তানা— 'আপনাকে এক লক্ষ টাকা দওেয়া হবে'— রাশেনোরা দবিস	১৫৯-১৬২
২৭	কলকাতা কৃষ্টি কন্দ্রে— অসমাপ্ত প্রবন্ধ পদ্মপুকুর লনে— পাশরে বাড়ি— মুখোমুখি বাড়ি	১৬২-১৬৪
২৮	জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গ — ১৯৭৭ সালরে শহীদ বুদ্ধজীবী স্মৃতি দবিস 'অনুষঙ্গ: জাতীয় সংগীত'— একটি সাক্ষাৎকার	১৬৪-১৬৯
২৯	'খোদা হাফজে'— 'জনাব'-শ্রী'-তাজুদ্দীনরে 'ইমজে'-ব্যক্তত্বিরে লড়াই কসিরে স্ট্রাকচার?'— বকয়ো বতেন	১৭০-১৭২
৩০	'খোকার মা-কে'— ভারতরে স্বীকৃতি- বাংলাদশে বতোর	১৭৩-১৭৪
৩১	২২ ডসিম্বের— 'আমাদরে সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই'— মন্ত্রীদরে সঙ্গে যোগাযোগে— 'প্রধানমন্ত্রীর মুভমন্টেরে খবর আপনারা রাখবনে না, সটো কি আমার দোষে?'— বাংলাদশে বতোর, মুজবিনগর কন্দ্রে— শষেতম দলটরি প্রত্যাবর্তন— 'বতোর মুক্তি সংগ্রামে' : প্রবন্ধ	১৭৫-১৭৯
৩২	'পশ্চমিবঙ্গে বঙ্গবন্ধু'	১৭৯-১৮০
৩৩	কোনো কছিুই প্রাপ্য নহে-বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক-অভনিন্দন— সংবর্ধনা	১৮১-১৮৬
৩৪	সহে ১ কি. ও. ট্রান্সমটিার— ১৯৮১ সালরে প্রসেডিন্টে নর্বিাচন— জয় বংলা রডেওি 'ঐ চুঙ্গাটা যার, দশেটাও তার'- একটি সাক্ষাৎকার— 'আবারও সোচ্চোর হতে পার'	১৮৮-১৯১

৩৫	অনুষঙ্গ-১ (কয়েকটি কথিকা)	১৯২-২৫০
৩৬	অনুষঙ্গ-২ (কণ্ঠস্বর—শব্দ সনৈকিরে)	২৫৪-২৬৪
৩৭	অনুষঙ্গ-৩ (পরিচিতি)	২৬৫-২৬৭

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

‘আমি একাত্তরের লোক’— একটি কবিতার শিরোনাম। রচনাকাল ১১.০৩.৭৭। প্রকাশিত হয়েছিল সিলেটের উদীচী স্মরণিকা ‘৭৮-এ। কবিতাটি :

আজ আমি আপনাদের সাথে পরিচিত হতে চাই—

আমাকে চিনবেন আশা করি,

চিনবেন অবশ্যই, কেননা আমি একাত্তরের লোক।

আমার নামধাম জীবনযাত্রা সবই ঐ

উনিশ শ' একাত্তর সাল ।

এই আত্ম-পরিচয়ে, আমার বিশ্বাস, আপনাদের

অত্যন্ত কাছের লোক আমি

কি করে ভুলবেন আপনারা আমার একাত্তরকে,

ঐ একাত্তরই আমাদের পবিত্র অস্তিত্ব।

সেই তো আমাদের প্রাণ দিল,

দেশ দিল, স্বাধীনতা দিল ।

আজকের যাবতীয় কর্মের চাঞ্চল্য—

এসব কর্মের পথ একাত্তরই সুগম করে দিল ।

একমাত্র এ সত্যই নির্ভেজাল ।

এবং আমার নামধাম জীবনযাত্রা

আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে,

নইলে কিন্তু—

ইতিহাস অত্যন্ত নির্মম ।

আমি অনেক কথা বলেছি। অনেক কথা বলিনি। বলেছি নানাভাবে। গদ্যে এবং পদ্যে। কখনো সাক্ষাৎকারের আকারে। কখনোবা নিবন্ধের ভাষায় এবং

গল্পের ছলেও। সবই বিক্ষিপ্ত। বলতে গিয়ে অকথিত রেখেছি অনেক কথা এবং তা সচেতনভাবেই ।

আমি আগরতলাকে এতোদিন বলেছি 'মুক্ত-অঞ্চল'। কলকাতাকে বলেছি 'মুজিবনগর' । আগরতলা সীমান্তের বাগাফা ও শালবাগান এবং শহরের কর্নেল চৌমুহনী ও জেল রোড ছিল আমার কর্মকাণ্ডের দ্বিতীয় পর্যায়। কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ছিল তৃতীয় পর্যায় । আর প্রথম পর্যায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন— যা আগে বারবার বলেছি, এখন বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি করছি ।

তা সত্ত্বেও আমি কি এখন অভিনব কিছু বলতে যাচ্ছি? না। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে 'ইতিহাস প্রকল্পে'র পক্ষ থেকে সিলেটে গিয়েছিলেন সৈয়দ আল ইমামুর রশীদ। তিনি আমার ইন্টারভ্যু বাণীবদ্ধ করেছিলেন। ঝাড়া ৯০ মিনিট। ওতে আমি আগরতলা এবং কলকাতার কথা ঠিক ঠিক বলেছিলাম। বলেছিলাম অব দ্য রেকর্ড।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস থেকে বিজয় দিবস। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর। এই সীমিত সময়ের কিছু কথা— কিছু ইতিপূর্বে কথিত এবং কিছু অকথিত। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। বক্তব্য বিষয় কেবল যুদ্ধকালীন বেতার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম। বেতার কেন্দ্রের আদ্যোপান্ত ঘটনা-প্রবাহ । জাতির ইতিহাসের মতো যা অশেষ নয়। স্বত:স্ফূর্তভাবে এর উদ্ভব এবং স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল সমাপ্তি ।

এই কর্মকাণ্ডের প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে আমার তৎপরতা। আর শেষ দিনটি পর্যন্ত নিয়োজিত থাকা । এই তো অধিকার কথাগুলো বলবার । এই অধিকার আর আছে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের। আবদুল্লাহ-আল ফারুকের। দু'জনই প্রথম দিন থেকে আমার সহকর্মী ।

এই অধিকার পত্তনের হেতু আছে কি? অবশ্যই আছে ।

১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে উদযাপন করা হয়েছিল 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস'। তাৎক্ষণিক গল্প বলার পালা। একজন কথক ছিলেন ক্রীড়া সাহিত্যিক-ভাষ্যকার বদরুল হুদা চৌধুরী। মঞ্চে উঠেই খেলার কমেন্ট্রির মতো বলেছিলেন : এই যে ভাইসব, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। শুনে আপনারা চমকাবেন না। ঐ তো বসে আছেন বন্ধুবর

বেলাল মোহাম্মদ। আমি তাঁকে অস্বীকার করতে চাই না। তবে ইতোমধ্যে পত্র-পত্রিকায় অনেক দাবিদাওয়া চলছে। ঝোঁকের মাথায় আমিও একটু শরিক হয়ে গেলাম আর-কি। আসরটা তো আষাঢ়ে গল্পের....ইত্যাদি ।

এই বিভ্রান্তির প্রসঙ্গে আমি 'বেতার— মুক্তি সংগ্রামে' নিবন্ধের ভূমিকায় লিখেছিলাম: একজন সাংবাদিক যখন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তখন তিনি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পরিগ্রহ করেন। কিন্তু আমাদের সমকালীন ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আমাদের জীবনের সঙ্গে এতো বেশি সম্পৃক্ত, যার জন্যে আমরা প্রত্যেকে মুক্তি সংগ্রামে নিজের ন্যূনতম অংশগ্রহণ বা ভূমিকাকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রবণতা নিবৃত্ত করতে পারি না। বরং এ ব্যাপারে নগ্ন আত্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হই । যার ফলে একালে আমরা চোখের সামনে যা দেখেছি, তাকেই বিবৃত হতে দেখেছি নানাভাবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদের শক্তি না থাকায় নির্বিবাদে অজস্র অসত্যকে মেনে নিয়েছি....ইত্যাদি ।

'বেতার— মুক্তি সংগ্রামে' নিবন্ধটি সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গ তথ্যপুষ্ট। দেশ শত্রুমুক্ত হবার পরপর রচিত । প্রথমে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ঢাকা থেকে কামাল লোহানীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বিবিধ' সঙ্কলনে। সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের স্মারক গ্রন্থ 'ইতিহীন ইতিবৃত্ত'-এ। রেডিও বাংলাদেশের পাক্ষিক অনুষ্ঠানপত্র 'বেতার বাংলা'য়ও নিবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল— ১৯৭৮ সালের বিজয় দিবস সংখ্যায় ।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এম আর আখতার উদ্যোগী হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্যে। চট্টগ্রামে টেলিফোনে তিনি আমাকে বলেছিলেন, ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে চান ঢাকায়। উত্তরে আমি বলেছিলাম : ২৫ মে? ঐ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস তো ২৬ মার্চ । হ্যাঁ, ২৫ মে ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার থেকে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছিল। দিনটিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটারের 'পাওয়ার এনহান্সমেন্ট' (Power enhancement) দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা যেতে পারে বৈকি I

সেই অভিনব উদ্যোগ সম্পর্কে পরে আর জানতে পারিনি ।

১৯৭৪ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে একটি প্রদর্শনীর

আয়োজন করা হয়েছিল। ‘মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন' প্রদর্শনী। উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষ আমার কাছ থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কিছু দলিল নিয়েছিলেন প্রদর্শনের জন্যে। পরে সেগুলো আর ফেরত না দিয়ে সংরক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছিল। একটি আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬-এ ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট আমি দলিলগুলো হস্তান্তর করেছিলাম । সে উপলক্ষে আমার লিখিত ভাষণে বলেছিলাম :...

ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক দলিল সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের যেমন শেষ নেই— আজকের এই অনুষ্ঠানটিই আগামীকাল ইতিহাসের উপজীব্য হবে, সেরকম ঐতিহাসিক দলিলেরও নেই ইয়ত্তা । সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজক হচ্ছে, ইতিহাস যেহেতু সর্বকালে সর্বদেশেই ক্ষমতাদর্পের প্রভাবে জঘন্যভাবে প্রভাবিত, সেহেতু সংরক্ষিত ঐতিহাসিক দলিলমাত্রই এককভাবে একতরফা। ইদানীংকালের কোনো বিকৃত ইতিহাসও যদি তার প্রতিবাদ-নিবন্ধ ছাড়া আগামীদিনের মানুষের হাতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়, তবে তারই নিরিখে প্রামাণ্য দলিল গৃহীত হতে বাধ্য। একটি সাধারণ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, সুদূর ভবিষ্যতে চন্দ্রপৃষ্ঠ মানুষের অবাধ বিচরণস্থলে পরিণত হলে, একটি প্রামাণ্য দলিলসূত্রে বলা হবে, একদা এখানে চারজন পৃথিবীর বাসিন্দা পদার্পণ করেছিলেন—তাঁরা ছিলেন আর্মস্ট্রং, অলড্রিন, কলিন্স ও নিক্সন — তাঁদের নামযুক্ত শুভেচ্ছাফলক চন্দ্র-গর্ভে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস হিসেবে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে সাম্প্রতিককালে তাজমহলকে পূর্বনির্মিত শিবমন্দিরের মোগল সংস্করণ এবং কুতুব মিনারকে অশোকস্তম্ভ বলে প্রমাণের প্রাণান্ত গবেষণা।

আমরা একই মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কোমলমতি কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকে সমান চিত্রিত দেখি না। এক্ষেত্রে সীমান্তের এপার- ওপার অবিশ্বাস্যরকম বৈসাদৃশ্যমণ্ডিত ।

বস্তুত ইতিহাস আপেক্ষিক কেবল ক্ষমতাদর্পের প্রভাবের কারণেই নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণজনিত ভেদাভেদের জন্যেও। না বলে উপায় নেই, আমাদের সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধই ছিল একটি স্বত:স্ফূর্ত ব্যাপার। কোনো রাজনৈতিক সংগঠনই আমাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে আহ্বান করেনি। নিতান্তই আকস্মিকভাবে আক্রান্ত একটি জাতি আত্মরক্ষার তাগিদে যা করেছে, সেটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারই কল্যাণে একটি রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন

সাধনের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও তেমনি একটি তাগিদের ফসল। ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ স্বত:স্ফূর্তভাবেই আমরা কতিপয় নাগরিক চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে গিয়ে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজটি করে বসি, যে কেন্দ্র মারফতে মরহুম এম এ হান্নানের দূরদর্শী ভাষণ এবং ২৭ মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচারের ও প্রাথমিকভাবে অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের কর্মচাঞ্চল্যের পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে-কার্যক্রম অব্যাহত থাকে ক্রমবর্ধিত আকারে । পরবর্তীকালে তা মুক্তিযুদ্ধের জন্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উদ্যম বলে বিবেচিত হয় । আর এ রকম বিবেচিত হবার কারণেই দেখা গেছে, এই কেন্দ্রের উদ্যোক্তা হবার দাবিদার হয়েছিলেন অনেকেই ।

দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে সময় ও সুযোগের আনুকূল্য ছাড়াও বাকচাতুর্যের একটা অবদান থাকতে পারে। যেমন, একটি চুটকি । একজন ব্রিটিশ যুবক বললেন: জানো, আমাদের দেশে মাটি খুঁড়ে এক খণ্ড তার পাওয়া গেলো। তাতেই প্রমাণিত হলো, অতীতে আমাদের দেশে তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল।

বাঙালি যুবক বললেন : তাই নাকি। তবে বলি, আমাদের দেশের এক গ্রামে মাটি খুঁড়ে— অনেক খুঁড়েও তার বা অন্য কিছুই পাওয়া গেলো না। তাতেই প্রমাণিত হলো, অতীতে আমাদের দেশে 'বেতার' যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল ।

ঐতিহাসিক গবেষণা বা সত্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রামাণ্য দলিল বা সুলিখিত নিবন্ধাদি দিয়ে আমরা অবিকৃত তথ্যকে কতোটা লালন করতে পারবো? সর্বকালের ঐতিহাসিকদের কাছে আমার এটাই জিজ্ঞাসা। ইত্যাদি।

দলিল হস্তান্তর দৃশ্যটির আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছিল এবং পত্র-পত্রিকায় সেই আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে দৈনিক আজাদী 'স্বাধীন বাংলা বেতার' 'শিরোনামে এই সম্পাদকীয়টি প্রকাশ করেছিলেন :

'স্বাধীন বাংলা বেতার' বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অনন্য ভূমিকা রেখে গেছে জাতি তা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতারের সৃষ্টি, সংগঠন ও ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাবে হয়ত কালে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে । এখনো যে নেই তা নয়, এখনো এক-একজন এক-একভাবে রূপ দিয়ে থাকেন। ছড়িয়ে থাকা তথ্য উপকরণাদির সংগ্রহ, তার

ওপর সমীক্ষা হয়নি বলে এ বিভ্রান্তি ।

'স্বাধীন বাংলা বেতারের' 'জয় বাংলা, বাংলার জয়'-এর সূচক সুরটি যখন রেডিও, ট্রানজিস্টারে বেজে উঠত তখন দেশের মানুষ কি উৎসাহ, আনন্দ, সাহস ও আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন তার প্রমাণ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ।

....স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম উদ্যোক্তা জনাব বেলাল মোহাম্মদ প্রথম পর্যায়ের কিছু তথ্য উপকরণ সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে দান করেছেন। নিজস্ব সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে তিনি জাতির ঐতিহাসিক সম্পদকে সমৃদ্ধ করেছেন ।...

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যে কোনো একজনের পক্ষে বিবৃত করা সম্ভব নয় । কারণ তা সম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন বিভিন্নভাবে ঘটনা এগিয়ে গেছে। এক-একজন এক-এক পর্যায়ের সাক্ষী। বেতার কেন্দ্রের ব্যাপারেও অনেকটা তাই।....

সমকালীন ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় না, এ কথার পরও বলতে হয় যে নগ্ন সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা হওয়া উচিত এবং সে সঙ্গে মুক্তি সংগ্রামের প্রাণ স্বাধীন বাংলা বেতারের সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। বছর গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বহু সাক্ষীর বিলুপ্তি ঘটছে, তাই প্রচেষ্টা আশু হওয়া উচিত।

সেদিন যে তরুণরা জীবনকে বাজি রেখে বেতার কেন্দ্রটি চালু করেছিলেন তাঁরা আজও জাতীয় স্বীকৃতি পেলেন না। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন এলাকায় ভবিষ্যতের জন্য কোনো স্মৃতি গড়ে উঠল না। এ খুবই বেদনাদায়ক ।

যদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে মুক্তিসংগ্রামে চট্টগ্রামের ভূমিকা সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তা সত্যিই সুখকর ও গৌরবজনক হবে। কালের গতিতে বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ার আগেই এ মহতী প্রচেষ্টা গৃহীত হলে জাতি উপকৃত হবে। (সংক্ষেপিত)।

আমার অধিকারের প্রশ্নটি তখনই হয়েছিল আলোচিত। আমাকে উত্যক্ত করা হয়েছিল । তখন আমি একটি ক্ষুদ্রে নিবন্ধ লিখেছিলাম দৈনিক বাংলায় । 'কিছু তথ্য এবং একটি অকপট উক্তি' শিরোনামের নিবন্ধটি পত্রস্থ হয়েছিল ১৯৭৬ সালের স্বাধীনতা সংখ্যায় । হুবহু নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

সম্প্রতি আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কিছু দুর্লভ দলিল উপযুক্ত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে প্রদান করেছি । আমার কাছ থেকে দলিলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আবদুল করিম। এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় খবর এবং আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আমি বলেছি, আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ উক্ত দলিলগুলো আমার কাছে যথেষ্ট ভাবাবেগের উপকরণ হলেও, কালে বোঝার সামিল হতো। এসব স্মরণীয় দলিল সংরক্ষণের ব্যক্তিগত প্রস্তুতি আমার মতো ব্যক্তিবিশেষের না থাকারই কথা। তবে ভবিষ্যতে কিছু লেখার অবকাশ পেলে এগুলোর ব্যবহার আমার নিজের জন্যে একান্ত অপরিহার্য হবে। দলিলগুলো হস্তান্তরের খবর ও আলোকচিত্র পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর ইতোমধ্যে আমি কতিপয় মহলের কিছু অবাঞ্ছিত জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছি। সে সব জিজ্ঞাসাবাদের সদুত্তর প্রদান প্রসঙ্গই বক্ষ্যমান নিবন্ধের উপজীব্য বিষয় ।

প্রথমত এ সব দলিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত সময়কালের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার কার্যক্রমের বিক্ষিপ্ত উপকরণ। ঐ সময়কালের মধ্যে এই বেতার কেন্দ্রের যে দুটি স্থানিক পর্যায় ছিল, তা হচ্ছে ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত চট্টগ্রামের কালুরঘাট এবং ৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে, ১৯৭১ পর্যন্ত রামগড় সীমান্তবর্তী মুক্ত অঞ্চল। কালুরঘাট পর্যায়ে চট্টগ্রাম বেতারের ১০ কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটার এবং পরবর্তী পর্যায়ে ট্রান্সমিটার ভবন থেকে স্থানান্তরিত একটি ১ কিলোওয়াট শক্তির মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার ও অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রথমত ২০০ ওয়াট শক্তির ও পরে ৪০০ ওয়াট শক্তির শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয়।

কালুরঘাটে ৫ দিনের মধ্যে আমাদের দশজনের একটি ক্ষুদে কর্মীদল গড়ে ওঠে। দলের সদস্যরা হচ্ছেন, অনুষ্ঠান বিভাগীয় আমি (বেলাল মোহাম্মদ), আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ্-আল-ফারুক, মুস্তফা আনোয়ার ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ এবং প্রকৌশল বিভাগীয় সৈয়দ আব্দুর শাকের, রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, শারফুজ্জামান ও রেজাউল করিম চৌধুরী। ঐ সময়েই দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৭ মার্চ, ১৯৭১-এ আমি আমার বন্ধু মাহমুদ হোসেন (শহীদ)সহ পটিয়ায় গিয়ে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করি। মেজর ট্রান্সমিটার ভবনে নিরাপত্তা প্রহরার ব্যবস্থা করেন এবং সেদিনই সন্ধ্যায় বেতারে তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করেন। আলোচ্য পর্যায়ে প্রকৌশলিক দায়িত্বে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োজিত

ছিলেন মিক্যানিক আবদুশ শুকুর। দলভুক্ত কর্মীগণ ছাড়া নৈমিত্তিকভাবে অন্যান্য যাঁরা অনুষ্ঠান প্রচার বা ঘোষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি আবদুস সালাম, এম এ হান্নান, হাবিবুর রহমান জালাল, সুলতানুল আলম, তমজিদা বেগম, তৎকালীন ক্যাপ্টেন ভুইয়া, মাহমুদ হোসেন (শহীদ) প্রমুখের নাম উল্লেখ্য ।

বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা পর্যায়ে নেপথ্যে উৎসাহক ছিলেন ডাক্তার এম শফী (শহীদ), বেগম মুশতারী শফী, খোন্দকার এহসানুল হক আনসারী (শহীদ), অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, এয়ার মাহমুদ প্রমুখ । প্রত্যক্ষ সহায়ক ছিলেন অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, মাহবুব হাসান, সেকান্দার হায়াত কান, হারুন খান, আনোয়ার আলী, রঙ্গলাল দেব চৌধুরী, ড্রাইভার এনাম প্রমুখ ।

৩০ মার্চ, ১৯৭১ ট্রান্সমিটার ভবনে বিমান থেকে বোমা বর্ষণের পর ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ডিস্‌মেন্টাল করে নিয়ে আমরা পটিয়ায় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং সেখানে যুবকর্মী শামসুল আলমের আতিথ্য গ্রহণ করি । পটিয়ায় বেতার প্রকৌশলী মোসলেম খানের কাছ থেকে আমরা উপদেশ গ্রহণ করি, ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ইনস্টল করার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে ।

৩ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান আবার শুরু করা হয় মুক্ত অঞ্চলে । এখানে এসে আমরা শর্টওয়েভ ও মিডিয়াম ওয়েভ দুই ট্রান্সমিটারে আলাদা আলাদাভাবে দুই দলভুক্ত হয়ে কর্মরত হই। এই সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ উপদেশক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, এম আর সিদ্দিকী, জহুর আহমদ চৌধুরী (মরহুম), তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী প্রমুখ। এ পর্যায়ে দশজন স্থায়ী কর্মীর সঙ্গে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সুব্রত বড়ুয়াকে গ্রহণ করা হয়। ২৫ মে ১৯৭১ থেকে মুজিবনগরে ঢাকা ও রাজশাহী থেকে নবাগত অন্যান্য বেতার কর্মীদের সঙ্গে একযোগে আমরা দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া অবধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারে কার্যরত থাকি। মুজিবনগরে এক বৈঠকে সংগ্রামী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (মরহুম) চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে ২৬ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে সাধুবাদ দিতে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: 'তোমরা এমন এক সময়ে আমাদের জনমনে আশার আলো সঞ্চারিত করেছিলে, যখন

আমাদের দেশজনপদে আলো ছিল না' ।

বস্তুত ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরিবার পরিজন থেকে বিছিন্ন অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের দশজন প্রতিষ্ঠাতা কর্মীর সর্ব রকমের অপ্রস্তুতি ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃত কার্যক্রমের যে সব দলিল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের আকারে রয়েছে, সে সব সামগ্রিকভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার দুর্লভ উপকরণ । এ সবের সংরক্ষণের জন্যে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং এ ব্যাপারে কোনো মহলেরই কোনোরূপ সংশয়ের উদ্রেক হবার অবকাশই নেই । এই উক্তি অকপট । (রচনা ১৮-৩-৭৬)।

একই তারিখে (২৬-৩-৭৬) চট্টগ্রামের 'পিপল্স ভিউ' পত্রিকায় Birthday Today of Bangladesh and also of Swadhin Bangla Betar Kendra শিরোনামে নিবন্ধটির অনুবাদ পত্রস্থ হয়েছিল।

নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর আর কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি। তবে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে কি না জানি না, কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগে গৃহীত হয়েছিল একটি সাধু পরিকল্পনা। গঠিত হয়েছিল একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য-সংরক্ষণ ও নাম-তালিকা প্রস্তুতকরণ কমিটি।' প্রথম তথ্য বিবরণীটি প্রকাশিত হয়েছিল ১০ মে ১৯৭৬। শিরোনাম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানসমূহ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত'। বিবরণীটি ছিল (নং ১২১৩১) :

‘ঢাকা, ১০ মে : সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যে সকল তথ্য, বিবৃতি, বক্তৃতা, নাটক, সংগীত ও বিবরণী প্রচারিত হয়েছে সেগুলিকে সন্নিবেশিত করে সংগৃহীত সমস্ত সামগ্রী ঢাকাস্থ মিউজিয়ামে জাতীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হবে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যে সকল কর্মচারী, শিল্পী, সাহিত্যিক, মুক্তিযোদ্ধা বা কারিগরগণ অংশগ্রহণ করেছেন তাদের নামের একটি পূর্ণ তালিকাও একইভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

সরকার এ ব্যাপারে অতি শীঘ্র একটি কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' ২১মে তারিখে প্রকাশিত তথ্য বিবরণীটির (নং ১২১৯৪) শিরোনাম 'স্বাধীন বাংলা

বেতার কর্মীদের তালিকা প্রণয়ন কমিটি গঠিত।'

'ঢাকা, ২১শে মে: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ব্যবহৃত ট্রান্সমিটার যন্ত্রপাতি, কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালা জাতীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ এবং বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং কারিগরগণের নি:স্বার্থ ত্যাগ ও অপূর্ব দেশপ্রেমের নজির চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য সরকার তাদের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। রেডিও বাংলাদেশের মহাপরিচালক জনাব এম এহিয়া খান ও রেডিও বাংলাদেশের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা পরিচালক জনাব আলিমুজ্জামান চৌধুরী যথাক্রমে কমিটির চেয়্যারম্যান ও সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করবেন।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন জনাব আশফাকুর রহমান, আঞ্চলিক পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা, জনাব আবদুস শাকের, আঞ্চলিক প্রকৌশলী, রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা, জনাব বেলাল মোহাম্মদ, সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম ও জনাব ফিরোজ মোহাম্মদ, সহকারী সংরক্ষক, ঢাকা মিউজিয়াম ।

কমিটি যথাসম্ভব শীঘ্র এ বিষয়ে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন। ১০ জুন ১৯৭৬-এ অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে কমিটিতে আরো তিনজন সদস্য কো- অপট্ করা হয়েছিল : জনাব শহীদুল ইসলাম, পরিচালক, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, রেডিও বাংলাদেশ, জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, সহকারী পরিচালক, জনসংখ্যা পরিকল্পনা সেল, রেডিও বাংলাদেশ ও জনাব কামাল লোহানী, সভাপতি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ।

'মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার-এর ভূমিকা সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগ' শিরোনামে ১৭ জুন তারিখে প্রকাশিত তথ্য বিবরণীটি ছিল (নং ১২৩৬৪): 'ঢাকা, ১৭ই জুন : বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকাকে জাতীয় ভিত্তিতে অবিস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত বেতারে ব্যবহৃত ট্রান্সমিটার, যন্ত্রপাতি, অনুষ্ঠান-সামগ্রী, বেতারকর্মী, অংশগ্রহণকারী শিল্পী, কথক, ঘোষক-ঘোষিকা, ভাষ্যকার, সংবাদ পাঠক-পাঠিকা, পাণ্ডুলিপিকার প্রভৃতি ও সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নে সরকারের পক্ষ

থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

যে সকল ব্যক্তি স্বাধীন বাংলা বেতারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন অথবা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন-তাঁদের নাম, বর্তমান ঠিকানা, স্বাধীন বাংলা বেতারে তাঁদের ব্যক্তিগত ভূমিকা/অবদানের কথা বর্ণনা করে তা পাঠাতে বলা হয়েছে ।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে যদি স্বাধীন বাংলা বেতারে ব্যবহৃত কোনো রকম প্রামাণ্য সামগ্রী/বস্তু বা পাণ্ডুলিপি থেকে থাকে, তালিকাসহ তার বিবরণীও পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এছাড়া, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শ্রোতা-সাধারণের কারো কাছে যদি স্বকীয় উদ্যোগে রেকর্ডকৃত কোনো অনুষ্ঠান-সংবলিত টেপ বা তথ্য থেকে থাকে, তবে ত' কমিটিকে অবহিত করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। (সংক্ষেপিত)।

১৩ আগস্ট ১৯৭৬-এ কমিটির তৃতীয় ও শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল । ওতে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত ছিল :

(ঙ) স্বাধীন বাংলা বেতার-সংশ্লিষ্ট মূল্যবান যে সমস্ত তথ্য/দ্রব্যসামগ্রী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তার একটি তালিকা প্রণয়ন প্রয়াস। (প্রারম্ভিক কর্তব্য সম্পাদন : জনাব বেলাল মোহাম্মদ, সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, রেডিও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।)

‘ অপর একটি সিদ্ধান্ত ছিল :

(চ) প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তাকল্পে, তালিকার সূত্র এবং পরিচিতি অবলম্বনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংস্থাপন, প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ক ধারাবাহিকতাশ্রয়ী প্রামাণ্য তথ্য-নির্ভর বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ।

এ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন সর্বজনাব আশফাকুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, সৈয়দ আবদুশ শাকের, বেলাল মোহাম্মদ ও শামসুল হুদা চৌধুরী ।

কমিটির কার্যক্রম ওখানেই স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। পরে ১৯৮২ সালে শামসুল হুদা চৌধুরী ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন—— একাত্তরের রণাঙ্গন' । ওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রসঙ্গ

বিশদ আলোচিত। বিশেষ করে তৃতীয় পর্যায়ে ('তাঁর ভাষায় দ্বিতীয় পর্যায়) তাঁর সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন তথ্যাবলী বিবৃত, অর্থাৎ ২৫ মে **১৯৭১**-এর পরবর্তী সময়কাল ।

শামসুল হুদা চৌধুরী তাঁর 'একাত্তরের রণাঙ্গন' গ্রন্থে আমার একটি দ্বিভাষিক সনেট সঙ্কলিত করেছিলেন। বাংলায় 'ছাব্বিশে মার্চের আমি' আমার 'শুধু মিত্রাক্ষর' (১৯৮১) গ্রন্থে এবং ইংরেজিতে 'Say As I' শিরোনামে 'পিপল্স ভিউ'তে পূর্বাহ্নে পত্রস্থ হয়েছিল। পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে শামসুল হুদা চৌধুরী কিছু ভূমিকা ও মন্তব্য সংযোজিত করেছিলেন ।

যা বলি অলীক কি না অথবা বাস্তব,

এই প্রশ্নে আজকাল মানি নে বিস্ময় ।

গোয়েবল্‌স্‌ কালে কালে ধরে অবয়ব

যে যায় লঙ্কায়, সে তো দশানন হয় ।

ছাব্বিশে মার্চের আমি কোনো অধিকারে

সত্যের প্রবক্তা হবো দশকের প্রান্তে,

আমিও তো স্মৃতিভ্রষ্ট এই অন্ধকারে

হতে পারি নৈর্ব্যক্তিক সভয়ে একান্তে ।

হায়, আমি ট্রান্সমিটার যন্ত্রের মতন

কলের পুতুল যদি হতাম মুখর,

হতাম বিবর্ণ শোভা সুবর্ণ রতন

প্রদর্শনী যুগান্তক ঢাকা জাদুঘর ।

লোকে বলে, ইতিহাস রুদ্র ক্ষমাহীন-

কালচক্রে থাকুক সে যতো অন্তরীণ।।

Say as I if false or facts,
Wonder not for now-a-days.
At times Goebles does so acts
LANKA raises RAVANA's base.
Authorised as a truth teller
After years I how can be,
May be me a memory degrader
A mute out of fear, and flee.
Oh, a transmitter if I were
A relic all for times to come
As to handle must with care
Oft exhibited by Dhaka Museum.

But for long exists no miracle,
Let facts be fictioned at a cycle.

দলটি দশজনের । ২৭ তারিখে এসেছিলেন কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ ও আমিনুর রহমান। ২৮ তারিখে রাশেদুল হোসেন ও শারফুজ্জামান। ২৯ তারিখে সৈয়দ আবদুশ শাকের, মুস্তফা আনোয়ার ও রেজাউল করিম চৌধুরী। সবাই এসেছিলেন স্বতঃস্বেচ্ছভাবে। এসে যোগ দিয়েছিলেন সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে। এভাবেই দশজনের দলটি সংগঠিত হয়েছিল । শব্দ সৈনিকদের প্রাথমিক সংগঠন। সংগঠিত হয়েছিল যখন, দেশে তখনও সশস্ত্র সৈনিকদের সংগঠন গড়ে ওঠেনি ।

এই দশজন কর্মীর প্রেরণার উৎস কি? দু'জন-আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ও কাজী

হাবিবউদ্দীন আহমদ ছাড়া বাদবাকিরা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। বেতারেরই অনুষ্ঠান ও প্রকৌশলিক কর্মী। সবাই চট্টগ্রাম বেতারে কর্মরত। প্রেরণার উৎস যার যার সহজাত সৎসাহস। রেডিও পাকিস্তানের কর্মচারী হলেও তাঁরা বাঙালি। আর বাঙালি জাতির নেতৃকণ্ঠের ঘোষণাটি তখন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। ৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাই শুধু নয় । সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল বেতার-কর্মীদের প্রতি। বাংলাদেশের বেতার থেকে বাঙালিদের স্বার্থবিরোধী কোনো কথা প্রচার করা হবে না। যদি তা হয়, তাহলে যেন বেতার বন্ধ করে দেয়া হয়। বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র— ২৬ মার্চ প্রভাতী অধিবেশনে। তখন ঢাকা থেকে সামরিক নির্দেশ সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। সবাই আগ্রাবাদের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। প্রধান নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্তব্যরত প্রকৌশলী। কর্তব্যরত অধিবেশন তত্ত্বাবধায়ক। কারিগরি কর্মীগণ। ঘোষকগণ। তাঁদেরই অন্যতম তিনজন সৈয়দ আবদুস শাকের, মুস্তফা আনোয়ার ও আমিনুর রহমান। পরে এঁরা দু'একদিন আগে-পরে এসে গিয়েছিলেন কালুরঘাটে ।

বেতার কেন্দ্র চালু করা যে-কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না । মাইকের সামনে শব্দ ক্ষেপণ এবং শব্দকে উৎপেক্ষণ দুটি কাজের জন্যেই বেতারকর্মীদের সমাবেশ অপরিহার্য বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশলিক কর্মীদের। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন প্রতিটি বাঙালি কর্মী। প্রচলিত সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার নতুন উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের সকল বেতার কেন্দ্রে। 'রেডিও পাকিস্তান' নাম ঘোষণা রহিত করা হয়েছিল । আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো স্থানিক নাম গ্রহণ করেছিল। যেমন 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র,' 'চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র' ইত্যাদি। প্রত্যেক কেন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালি কর্মীদের সমন্বয়ে সংগ্রাম কমিটি।

কমিটির প্রধান প্রয়াস ছিল, অফিসের কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রচলন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ঐ সময়ে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ছিলাম। অফিসারদের কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না ।

অফিসের কাজকর্মে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিল চট্টগ্রামের একটি ব্যাঙ্কও। বাঙালিদের পরিচালিত ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক । সেই ব্যাঙ্কের একজন অফিসার বজলুল করিম চৌধুরী— আমার বিশিষ্ট বন্ধু। ১৯৬৯ সালের দিকে একটি ব্যালান্স শিট নিয়ে বসেছিলেন আমার সঙ্গে। সম্পূর্ণটি আমরা দু'জনে মিলে বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম। সেই পরিভাষা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ

অনুমোদনও করেছিলেন। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল দেশব্যাপী গণআন্দোলন।

২৬ মার্চ সকালবেলা আমি ছিলাম এনায়েত বাজারে। ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর বাসভবন মুশতারী লজে। রেডিওতে ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান চলছিল। শোনা গিয়েছিল সামরিক আইনের নির্দেশ ঘোষণা। হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বেতারের অনুষ্ঠান।

আমার বাসা আগ্রাবাদে। সরকারি কলোনিতে। কয়েকদিন আগে স্ত্রী-পুত্র গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। শূন্য ঘরে তালা দিয়ে আমি উঠে গিয়েছিলাম মুশতারী লজে। বেগম মুশতারী শফী মহিলা মাসিক 'বান্ধবী'র সম্পাদিকা। আমি সেই পত্রিকার পরিচালক। ২৫ মার্চ রাতে আমরা টেলিফোন পেয়েছিলাম ঢাকা থেকে। ঢাকায় গোলাগুলি শুরু হবার খবর : একজন পরিচিতা টেলিফোন করেছিল। টেলিফোন মাঝপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সারারাত আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। পরের দিন পরিস্থিতি যাচাই করছিলাম বাসায় বসে। অফিসে যেতে দেরি করছিলাম। তখনই চট্টগ্রাম বেতার স্তব্ধ হয়েছিল ।

সকাল ৮টার দিকে এসেছিলেন আবদুল্লাহ-আল ফারুক। বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক। মাত্র মাস দুয়েক আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। অফিসে রওনা হয়েছিলেন। পথে লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখে যাত্রাভঙ্গ দিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন ।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ফটিকছড়ি কলেজের সহ-অধ্যক্ষ । নতুন চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনের শেষের দু'বছর আমার বাসায় ছিলেন। চাকরিতে যোগদানের পর থেকে প্রতি সপ্তাহশেষে বেড়াতে আসতেন। ২৫ তারিখে এসে বাসায় তালা দেখে চলে এসেছিলেন মুশতারী লজে। ডাক্তার শফী চাল-ডাল কিনে রেখেছিলেন। ঘরে ফ্লোরিং-এর জন্যে অনেক পরিসর।

কিন্তু বেতার কেন্দ্র বন্ধ থাকবে কেন? কথাটা মনে আসতেই একান্তে বেগম মুশতারী শফীকে বলেছিলাম : আচ্ছা, এখন তো রেডিওটা আমরা কাজে লাগাতে পারি ।

তিনি উৎসাহী হয়েছিলেন। চালু করা হলে নিজেও যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলাম : এখন কথাটা কারো কাছে প্রকাশ করবে না ।

বেলা ১১টার দিকে বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম। শহরের পরিস্থিতি দেখার

ছলে। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ-আল-ফারুক সঙ্গী হয়েছিলেন । গন্তব্য আওয়ামী লীগ অফিস। স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে জহুর আহমদ চৌধুরীর দপ্তর । পরিচয় দীর্ঘদিনের। এম আর সিদ্দিকী, জহুর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ও অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী— এই কয়েকজনকেই শুধু চিনতাম। আমাকেও ওঁরা চিনতেন। এঁদের আনুকূল্য পেলেই বেতার চালু করা সম্ভব।

রেস্ট হাউসের গেটে কড়া প্রহরা । ভেতরে চত্বরে বারান্দায় লোকারণ্য । সব অচেনা মুখ। গেটের লাঠিয়াল রক্ষী কিছুতেই ভেতরে যেতে দেবেন না। বলেছিলাম, দেখুন, আমি রেডিওর বেলাল মোহাম্মদ। নেতাদের সঙ্গে জরুরি কথা আছে ।

: কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই ।

: তবু দয়া করে আমাকে অফিসে যেতে দিন। টেলিফোনে নেতাদের সাথে কথা বলবো ।

শুধু আমাকে যেতে দেয়া হয়েছিল। সঙ্গী দু'জনকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে বলেছিলাম ।

ভেতরে কর্মীরা সবাই করিৎকর্মা। সবাই ব্যতিব্যস্ত। কে কার কথা শোনে? তরুণ অ্যাডভোকেট রফিক টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত। ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম । জানিয়েছিলাম নিজের পরিচয়। তিনি চিনেছিলেন। উদ্দেশ্যটা বলেছিলাম। আগ্রাবাদ বেতার ভবন এবং কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে কয়েকজন শক্তসমর্থ কর্মী নিয়োগ করা দরকার। ভবন দুটো দখল করে আমরা নিজেদের কথা প্রচার করতে পারি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ-গণসঙ্গীত-ঘোষণা ।

অ্যাডভোকেট রফিক মনোযোগই দিতে পারছিলেন না। আমার কথার মাঝখানে টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আবার বলতে হচ্ছিল নতুন করে কথাটা। বারবার বলবার পর তিনি বুঝেছিলেন। একে-তাকে ডেকে বলতে চেষ্টা করছিলেন আমাকে সহায়তা করার জন্যে । কিন্তু কে কার কথা শোনে?

হতাশ হয়েই কক্ষের বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলাম। সেখানেই দেখা অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদের সঙ্গে। চোখ দু'টি রক্তজবা। চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। সারারাত ঘুমাননি নিশ্চয়। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের

বুদ্ধিজীবী সৈনিক মাত্র দিন দশেক আগে লালদীঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের আহূত জনসভা। সেই সভাস্থলে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল মমতাজ উদ্দীন আহমদের লেখা নাটক— 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

মমতাজ উদ্দীন আহমদ আমার পরিকল্পনাটি শুনেই লুফে নিয়েছিলেন। নিজের প্রভাব খাটিয়ে জোগাড় করেছিলেন একটি জিপ। সেই জিপে চেপে রেস্ট হাউস থেকে যাত্রা। কোথায় যাওয়া যায়? প্রয়োজন শুধু বেতার কেন্দ্রে প্রহরা মোতায়েন করা । মমতাজ উদ্দীন আহমদই পরামর্শ দিয়েছিলেন ই-পি-আর এর কমান্ডার রফিকের সঙ্গে যোগাযোগের । কমান্ডার তাঁর পরিচিত। রেলওয়ে বিল্ডিং-এর পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল কমান্ডার রফিককে। তিনি প্রস্তাবটি শুনে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই মনে হয়েছিল আমার। বলেছিলেন : এক ঘণ্টার মধ্যে ২০ জন জোয়ান আগ্রাবাদে এবং ১৫ জন কালুরঘাটে পৌঁছে যাবে। আপনারা যান।

আমাদের তখন অনেক কাজ। বেতার চালু করা তো মুখের কথা নয় । প্রকৌশলিক দায়িত্বটিই প্রধান। বেতারের নিজস্ব কারিগরি কর্মীদের সহযোগিতা চাই। নিজে আমি ৭ বছর থেকে বেতার কর্মী। চুক্তিভিত্তিক নিজস্ব লেখক-শিল্পী। অনুষ্ঠান বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে ওঠাবসা। প্রকৌশলিক কর্মীদের কারো সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি । একই অফিসের সবাইকেই হয়তো চিনতাম। আমাকেও চিনতেন সবাই । কিন্তু কে কোথায় থাকেন, জানা ছিল না । তখন তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। একজন ছিলেন মাহবুব হাসান। আমার মতোই চুক্তিভিত্তিক বেতারকর্মী। নাটকের রেকর্ডিং এবং ডাবিং-এর কাজে স্টুডিওতে নিত্য আনাগোনা। দেখে দেখে বেতারের বুথ- এ অপারেটিং-এর কাজও শিখে নিয়েছিলেন। জিপে রাবেয়া খাতুন লেনে মাহবুব হাসানের বাসায় গিয়েছিলাম আমি ও মমতাজ উদ্দীন আহমদ । ইতোমধ্যে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল । মাহবুব হাসান ভাত খাচ্ছিলেন। হাতে হাতে প্লেট নিয়ে আমরাও কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম ।

দু'জন বেতার প্রকৌশলী মোসলেম খান ও দেলওয়ার হোসেন। চকবাজার এলাকায় তাঁদের বাসা। সহযোগিতায় তাঁদের আপত্তি নেই। তবে একটা শর্ত ছিল। আঞ্চলিক পরিচালক এবং আঞ্চলিক প্রকৌশলীর সুস্পষ্ট অনুমতি থাকতে হবে। বেশ তো, সেই অনুমতি নেয়া হবে। তাঁদের দু'জনকে জিপে তুলে নিয়ে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল । ট্রান্সমিটার

চালু করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এখন অন্যান্য প্রস্তুতি। কালুরঘাট থেকে সেই জিপে আমরা তিনজন আগ্রাবাদের দিকে ছুটেছিলাম । পথে চট্টগ্রাম কলেজ গেটে এসে নেমে গিয়েছিলেন মমতাজ উদ্দীন আহমদ। উদ্দেশ্য, একটু বাসায় যাওয়া। সেই ভোরবেলায় বেরিয়েছিলেন । সবাই নিশ্চয় চিন্তাভাবনা করছেন । এ ছাড়া আরো কাজ ছিল । বেতার চালু করলেই তো হবে না । চালু করে কি প্রচার করা হবে! সে সব লিখতে হবে এবং ভালো ভালো কণ্ঠে প্রচার করতে হবে। কাজেই তিনি এই অবকাশে কয়েকজন ব্রডকাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁদেরকে নিয়ে আগ্রাবাদে পৌছে যাবেন। কিন্তু সেই যে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সে দিন আর আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি ।

জিপে এখন আমি ও মাহবুব হাসান। আগ্রাবাদ রোডে বাদামতলিতে প্রথম ব্যারিকেড। দু'দিন আগে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করেছিল অস্ত্রবাহী জাহাজ বাবর ও সোয়াত । সারাদেশে বঙ্গবন্ধু আহূত অসহযোগ আন্দোলন । এ সময়ে অস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ এসে বন্দরে ভিড়েছিল । রটে যাওয়ামাত্রই আক্রোশে ফেটে পড়েছিল মানুষ । বন্দর থেকে স্ট্র্যান্ড রোড-আগ্রাবাদ রোড হয়ে সেনানিবাসের পথ। অস্ত্র আর গোলাবারুদ যেন সেনানিবাসে নিয়ে যেতে না পারে, পথে পথে তৈরি হয়েছিল ব্যারিকেড। স্বত:স্ফূর্তভাবে। দেখতে-না-দেখতেই বড়ো বড়ো কাঠপাথর স্তূপাকার করা হয়েছিল এখানে-ওখানে । পিচের ড্রাম রাস্তার ওপর টেনে এনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল ।

বাদামতলিতে জিপ থেকে নেমে পড়তে হয়েছিল। হেঁটে দু'মিনিটের পথ। বেতার ভবনের গেটে কোনো প্রহরা ছিল না। সম্পূর্ণ এলাকা জনশূন্য । আমি ও মাহবুব হাসান সোজা গিয়ে প্রধান নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঢুকেছিলাম । অন্ধকার ঘর, বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে আলো জ্বালানো হয়েছিল। আর তখনই বেজে উঠেছিল টেলিফোন । ট্রান্সমিটার ভবন থেকে দুই প্রকৌশলী— তাঁরা কেটে পড়তে চেয়েছিলেন। কেননা টেলিফোনে তাঁদের কথা হয়েছিল আঞ্চলিক প্রকৌশলীদের সাথে। তিনি সম্মতি দেননি । মহাসমস্যা। বলেছিলাম : দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন আপনারা । আমরা লিখিত অনুমতি নিয়ে আসছি।

টেলিফোন করেছিলাম আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসায় । মীর্জা নাসির উদ্দীন সকাতরে বলেছিলেন : দেখুন, দুপুরবেলা আওয়ামী লীগের হান্নান সাহেব আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। ট্রান্সমিটার চালু করালেন। শেখ

সাহেবের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করলেন। তারপর সরে পড়লেন। তাঁরা তো আমাদের দিয়ে কাজ করাবেন। পরে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে?

স্বভাবত বিষয়টি আমার জানা ছিল না। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান। তাঁকে আমি চিনতাম না। ২৬ মার্চ দুপুরে তিনি আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসিরউদ্দীন এবং বেতার প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, দেলওয়ার হোসেন ও মোসলেম খানের প্রকৌশলিক সহযোগিতা আদায় করেছিলেন। পাঁচ মিনিট স্থায়ী একটি বিক্ষিপ্ত অধিবেশন । ওতে তিনি নিজের নাম-পরিচয়সহ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন।

মীর্জা নাসিরউদ্দীনকে বলেছিলাম : এখন আর ভয়ের কারণ নেই। কমান্ডার রফিকের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তিনি জোয়ান মোতায়েন করবেন। জোয়ানরা এখনই এসে পড়বে ।

: বেশ তো, বাধ্যবাধকতার পরিবেশ তৈরি হলে তো ভালোই। কিন্তু এ কাজে আমার অনুমতির প্রয়োজন কি ?-তিনি অনুনয় করে বলেছিলেন : দেখুন, বেলাল সাহেব, এসবের পরিণতি কি হবে, বলা যায় না। আমাদের পরিবার-পরিজন রয়েছে।

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। বলেছিলাম : কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, স্যার! আপনি ট্রান্সমিটারে টেলিফোন করে ওঁদেরকে অনুমতি দিয়ে দিন।

: আচ্ছা, একটা কথা কেন বুঝতে চাইছেন না। আমি অনুমতি দেবার কে? আমি তো এখানে দু'নম্বর । আপনি আর-ডি সাহেবের অনুমতি নিচ্ছেন না কেন?

আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলমের বাসায় টেলিফোন ছিল না। কয়েকদিন আগেই বাসা বদল করেছিলেন। তখনো টেলিফোন লাগেনি। মীর্জা নাসিরউদ্দীন জানিয়েছিলেন : আর-ডি সাহেব এ-আর-ডি ওয়ানের বাসায়। একটু আগে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওখানে টেলিফোন করুন।

সেই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ্ আল ফারুক । চোখমুখ শুষ্ক । চুল উস্কোখুস্কো। স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসের সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন কিছুক্ষণ। পরে শহরের এদিক-সেদিন ঘোরাঘুরি করে ফিরে গিয়েছিলেন মুশতারী লজে ।

ডাক্তার শফী উদ্বিগ্ন ছিলেন আমার জন্যে । ওঁরা আমার খবর বলতে পারেননি। অনুযুক্ত হয়েছিলেন আমাকে ছেড়ে ঘরে ফেরার জন্যে। অতিথি হিসেবে আমি মুখ্য। আমার সুবাদেই এ-বাড়িতে ওঁরা অতিথি হয়েছিলেন। দু'জনেই অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বেগম মুশতারী শফী পথনির্দেশ করেছিলেন, বেতার কেন্দ্রে আমাকে পাওয়া যাবে ।

সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ আবদুল কাহ্হারের নাম্বারে ডায়াল করে কি মনে করে রিসিভারটি ধরিয়ে দিয়েছিলাম আবুল কাসেম সন্দ্বীপের হাতে। সৈয়দ আবদুল কাহ্হার জানতে চেয়েছিলেন, ওখানে আমাদের কে আছে?

: বেলাল ভাই আছেন ।

: টেলিফোন ওঁকে দিন ।

রিসিভার হাতে নিয়ে অস্পষ্ট আলাপ শুনেছিলাম । নাজমুল আলম ও সৈয়দ আবদুল কাহ্হারের কণ্ঠ। কথা আবদুল কাহ্হারই বলেছিলেন।

: বেলাল সাহেব, আপনারা বেতার চালু করতে চান, করুন। তবে আগ্রাবাদে থাকবেন না। আপনারা কালুরঘাটে চলে যান। ওখানে একটা ক্ষুদে স্টুডিও আছে। ও থেকেই সব প্রচার করতে পারবেন। আপনাদেরও সুবিধা হবে। আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খুব কাছে। এলাকাটার যে-কোনো সময়ে পতন ঘটতে পারে। তখন গোলাগুলি হলে আপনারাও মরবেন, বেতারের যন্ত্রপাতিও নষ্ট হবে।

শব্দ প্রক্ষেপণের জন্যে ট্রান্সমিটার ভবন স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরামর্শটি মাহবুব হাসানও এক কথায় মেনে নিয়েছিলেন। দ্রুত বেরিয়ে এসেছিলাম আমরা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ।

বেতার ভবনের গাড়ি বারান্দায় হোসনে আরাকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের একজন অনুষ্ঠান ঘোষিকা। সঙ্গে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। নিজের চাচা হিসেবে ডাক্তার আনোয়ার আলীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হোসনে আরা। আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। বলেছিলেন : আপনারা তো বেতার চালু করবেন— কিন্তু কি প্রচার করবেন, ঠিক করেছেন কি?

বলেছিলাম : সে তো ঠিক করাই আছে। বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনতা। এর বেশি আর এ মুহূর্তে প্রচার করার কিছুই নেই ।

আনোয়ার আলী আমার হাতে একটি সাইক্লোস্টাইল-করা ক্ষুদে হ্যান্ডবিল এগিয়ে দিয়েছিলেন। শিরোনাম 'জরুরি ঘোষণা'। নিচে 'স্বাক্ষর শেখ মুজিবুর রহমান' । বক্তব্য বিষয় : অদ্য রাত ১২টায় বর্বর পাক-বাহিনী ঢাকার পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিতে হামলা চালায়। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধ চলছে। আমি এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং সমস্ত বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করছি। 'জয় বাংলা'।

এটি পাঠ করেই আমি তো উচ্ছ্বসিত । বলেছিলাম : বাহ্, এটা দিয়েই অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করবো।-কাগজটি হাতে নিয়ে ছুটেছিলাম রাস্তার দিকে। সদ্য পরিচিত ডাক্তার আনোয়ার আলীকে ধন্যবাদ জানানো ছাড়াই ।

মাহবুব হাসান বলেছিলেন : কাছেই তো আর-ই সাহেবের বাসা। চলুন, একটা কাগজে অনুমতি লিখিয়ে নিয়ে যাই। নইলে —

বলেছিলাম : ভালোই হয় ।

: আর না-হয় বলবো, ট্রান্সমিটারে টেলিফোন করে বলে দিতে। তারপর টেলিফোন লাইনটা কেটে দিয়ে যাবো ।

মীর্জা নাসিরউদ্দীন তখন আর দ্বিমত করেননি। শুধু বলেছিলেন : এমন একটা পরিবেশ তৈরি করবেন, যেন কর্মীরা বাধ্য হয়ে কাজ করেছেন, প্রমাণ থাকে। বোঝেন তো, পরিণতি কি হবে, আমরা কেউ বলতে পারি না ।

আগ্রাবাদ রোডে আমাদের জিপটি ছিল না। এদিকে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। এখন কালুরঘাটে যাওয়ার উপায়? এগিয়ে এসেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার আলী। তাঁর গাড়ি ছিল । তিনি আমাদের পৌছিয়ে দিতে পারেন। গাড়িতে ছিলেন হোসনে আরা এবং স্টিয়ারিং ধরে অন্য একজন ।

পথে জনতার মধ্য থেকে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে গাড়িতে উঠেছিলেন প্রবীণ কবি আবদুস সালাম। হাতে খোলা কলম । খোলা খাতার পাতায় বেতার ভাষণের খসড়া ।

: নাতি, এটাই আমার লেখা । আমি প্রচার করতে চাই । পড়ে দেখে ঠিক করে দাও । চলন্ত গাড়িতেই সংশোধন ও শব্দান্তর করে নিয়েছিলাম। ভাষণটিতে কোরানের বাণী ছিল । চমৎকার বক্তব্যটি ছিল : 'দেশবাসী ভাই-বোনেরা!....

সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। যারা নিরস্ত্র তারা অন্তত সোডার বোতল বাজি প্রস্তুত করে মরিচের গুঁড়ার ঠোঙ্গা বানিয়ে ওদের (অবাঙালি সৈনিক) প্রতি নিক্ষেপ করলে টিয়ার গ্যাসের কাজ করবে। বিজলি বাতির বাল্বে এসিড ভরে তা-ও নিক্ষেপ করুন।' ইত্যাদি ।

রেয়াজুদ্দীন বাজারের কাছাকাছি গাড়ি থামানো হয়েছিল । মাহবুব হাসান বলেছিলেন : এক কাজ করলে হয়। আর-ই সাহেব তো বলেছেন বাধ্যবাধকতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন রফিক কি জোয়ানদের পাঠিয়েছেন? মনে তো হয় না। পাঠালে তারা আগ্রবাদে পৌছে যেতো। কালুরঘাটে গিয়েও দেখা যাবে কেউ যায়নি।

: সত্যি তাই। এখন কি করা যায়?

: আমি বরং এখানেই নেমে পড়ি। দেখি, আওয়ামী লীগ অফিস থেকে লাঠিয়াল গোছের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে যেতে পারি কি না।-মাহবুব হাসান নেমে পড়েছিলেন । সেদিন বা আর কোনোদিন তিনি আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেননি।

গাড়িতে ড্রাইভিং সিটের পাশে বসেছিলাম । ট্রান্সমিটার ভবনের সামনে বাঁক ফেরার জন্যে গাড়ির গতি কমানো হয়েছিল । তখনই লাফিয়ে নেমে পড়েছিলাম আমি । পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলাম একটি রিকশার। রিকশাটির আরোহী মোসলেম খান ও দেলওয়ার হোসেন।

: কি ব্যাপার, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? চলে যাচ্ছেন কেন?

তাঁরা অনুনয় করে জানিয়েছিলেন, একটু আগেই আর-ই সাহেব টেলিফোনে তাঁদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। যদি বেতার চালু করা হয়, সেটা তাঁদের নিজ দায়িত্বে করা হবে। কাজেই এতো বড় ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারেন না ।

আমিও অনুনয় সহকারেই বলেছিলাম : দয়া করে আপনারা চলে যাবেন না। আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই । আপনারা যেন বাধ্য হয়েই সহযোগিতা করছেন, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

কথাটা বলেছিলাম। তাঁদের ট্রান্সমিটার ভবনে ফিরিয়েও নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্যাটির প্রতিকার কি? এগিয়ে এসেছিলেন ডাক্তার আনোয়ার আরী। দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। ফিরেও এসেছিলেন

অল্প সময়ের মধ্যে। সঙ্গে কয়েকজন জোয়ান। সবাই রাইফেলধারী। এবারে পরিস্থিতি অনুকূল হয়েছিল ।

এখন তৈরি করতে হবে ঘোষণালিপি । ট্রান্সমিটার ভবনের অফিস কক্ষের টেবিলটা পূর্ণ দখলে । এক খণ্ড কাগজে লিখেছিলাম ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বলেছিলেন : বেলাল ভাই, 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' বললে ভালো হতো না?

: বেশ তো। ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’। লেখার মাঝখানে তীর-চিহ্ন দিয়ে ‘বিপ্লবী’ শব্দটি লিখেছিলাম। অবশ্য দু’দিন পরেই ২৮ মার্চ কেন্দ্রের নাম থেকে ‘বিপ্লবী’ শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমানের বরাত দিয়ে লে: শমশেরের প্রস্তাবক্রমে ।

লেখালেখির সময় সেখানে এসেছিলেন সুলতানুল আলম— চট্টগ্রাম বেতারের একজন নৈমিত্তিক ঘোষক । আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ঘোষণা প্রচার করার। আমি সম্মতি দিয়েছিলাম । হোসেনআরাকে অনুষ্ঠান ঘোষণা করার সুযোগ দেয়া হয়নি। বলেছিলাম : আপনার উপস্থিতিতে আমরা উৎসাহিত। কিন্তু আমাদের এটি একটি গুপ্ত বেতার কেন্দ্র । আমরা শুধু কেন্দ্রের নাম প্রচার করবো । স্থানের উল্লেখ করবো না । এখানে মহিলা কর্মীর সমাবেশ শোভন দেখাবে না। বিশেষ করে রক্ষণশীল শ্রোতাদের কাছে।

যুক্তিটি হোসনেআরার মনঃপুত হয়েছিল কি না, জানি না । পরে আর তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেননি ।

ঘোষণালিপি চূড়ান্ত হবার পর আবুল কাসেম সন্দ্বীপ আমার কানে কানে বলেছিলেন : কেন্দ্রের নাম-ঘোষণাটি সুলতানুল আলমকে দিয়ে করাবেন না। কারণ সে ‘বিপ্লবী’ শব্দটি বলতে চাইবে না ।

: তার মানে? আমি যা লিখে দিচ্ছি, সেটাই তো প্রচার করা হবে।

: না, আপনি জানেন না। এটা মানসিকতার ব্যাপার।

বলেছিলাম : আমি অতশত বুঝি না। সমাধান কি, তাই বলো ।

তিনি বলেছিলেন : প্রথম নাম ঘোষণাটি আপনি অথবা আমি করবো।

: বেশ তুমিই করো ।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্টুডিওতে যাবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই টেলিফোন বেজে উঠেছিল । অন্য প্রান্ত থেকে দ্রুত এবং চাপা কণ্ঠ ভেসে এসেছিল ।

: বেলাল সাহেব, আপনারা দেরি করছেন কেন ? যা পারেন, প্রচার শুরু করে দিন । এখন সাড়ে সাতটা । লোকেরা রেডিওর কাঁটা ঘোরাচ্ছে। পৌনে ৮টা বাজলেই 'আকাশ- বাণী' ধরবে। আপনাদেরটা কেউ শুনবে না ।

বলেছিলেন বার্তা সম্পাদক সুলতান আলী। তিনি দু-একটা সংবাদ-তথ্যও বলে দিয়েছিলেন ।

ঠিক সন্ধে ৭-৪০ মিনিটে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল : "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি।

একই নাম-ঘোষণা পরে আবদুল্লাহ আল ফারুক এবং সুলতানুল আলমের কণ্ঠেও প্রচারিত হয়েছিল সেই অধিবেশনে। ডাক্তার আনোয়ার আলীর কাছ থেকে পাওয়া হ্যান্ডবিলটিও বারবার প্রচারিত হয়েছিল আমাদের বিভিন্ন কণ্ঠে। বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত 'জরুরি ঘোষণা' এবং কবি আবদুস সালামের ভাষণ ।

অধিবেশন চলাকালে আমি স্টুডিওতে অবস্থানরত ছিলাম। ক্ষুদে স্টুডিও। জরুরি অবস্থায় কাজ চালাবার উপযোগী। কেউ একজন আমাকে হাত ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়েছিলেন। স্টুডিওর বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন দু'জন আগন্তুক। একজন আমার পূর্ব পরিচিত ডাক্তার আবু জাফর। অন্যজন এম এ হান্নান। বলেছিলেন : আপনারা মাইকে আমার নাম ঘোষণা করুন। আমি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করবো ।

: জি, আচ্ছা। তবে একটা কথা। আপনার নামটা প্রচার করা হবে না। আপনি নিজের কণ্ঠে শুধু এটি পাঠ করবেন।

: কেন, দুপুরবেলা আমি তো আমার নামসহ এটি প্রচার করেছিলাম । এখন অবশ্য বক্তব্যটি একটু বড়ো করে লেখা হয়েছে।

বলেছিলাম : দুপুর বেলা আপনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেছিলেন। এখন তা নয়। এখন থেকে এ হচ্ছে একটি গুপ্ত বেতার

কেন্দ্র । এখান থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। তাই কোথায় এর অবস্থান, তা আমরা শত্রুদেরকে জানাতে চাই না । জানলেই বিপদ। সহজেই ওরা আক্রমণ করতে পারবে। এমনিতেও তারা যন্ত্রের (ম্যাগনেটিক ওয়েভ) সাহায্যে আমাদের অবস্থান জানতে পারবে। তবে তার জন্যে তাদের কিছুটা সময় লাগবে ।

আরো বলেছিলাম : চট্টগ্রামের শ্রোতারা কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর ঠিকই চিনতে পারবেন ।

এম এ হান্নান মেনে নিয়েছিলেন এবং নাম ঘোষণা ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। বেতারে নিজের কণ্ঠে দ্বিতীয়বার।

প্রায় আধঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল এই সূচনা অধিবেশন। প্রক্ষেপণের কাজে নিজের ইচ্ছায় এসে যোগ দিয়েছিলেন মেকানিক আবদুশ শুকুর। কালুরঘাট পর্যায়ে তিনি শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রকৌশলিক সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিলেন।

অধিবেশনের সমাপ্তিতে আমরা পরদিন সকাল ৭টার পর আবার অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে, এই ঘোষণা দিয়েছিলাম ।

ভাবাবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। বলেছিলেন : বেলাল ভাই, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন রাজনীতি করে পাকিস্তানের কাছে দেশদ্রোহী হয়েছেন। আর আমরা আজ একটিমাত্র ঘোষণা প্রচার করেই দেশদ্রোহী হলাম।

বলেছিলাম : দেশদ্রোহী বা দেশপ্রেমিক যা-ই হই, এখন আর পিছু হটবার পথ নেই। এগিয়েই যেতে হবে ।

কাগজপত্র গুছিয়ে বাইরে এসে দেখেছিলাম সব ফাঁকা। ভবনের প্রাঙ্গণ জনশূন্য। ডাক্তার আনোয়ার আলী বা তাঁর পিক-আপটিও নেই। রাইফেলধারী জোয়ানরাও নেই । কেবল গেটের কাছে একটি জিপ স্টার্ট নিচ্ছে । এম এ হান্নানের জিপ। ছুটে গিয়ে তাঁকে বলেছিলাম : আমরা তিনজন শহরে যাবো।

: গাড়িতে জায়গা হবে না।— বলেই ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করেছিলেন গাড়ি ছেড়ে দিতে। আমরা তিনজন— আমি, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ্-আল ফারুক । সেই বিজন এলাকায়, সেই উদ্বেগের রাতে আমরা জিপটির ছুটে চলে যাওয়া দেখেছিলাম হতবাক দাঁড়িয়ে থেকে। আমিই মুখ খুলেছিলাম : এরাই নেতৃত্ব দেবে! গাড়িতে জায়গা নেই, কিন্তু তিনি তো একটু জানতে

চাইবেন সমস্যাটা! একটু তো ভাববেন! পিতৃত্ব ছাড়া নেতৃত্ব হয় না।

সারা পথে রিকশা ছিল না। আলো ছিল না। ৩/৪ মাইল পথ পায়ে হেঁটে আমরা মুশতারী লজে পৌছেছিলাম। তখন রাত সাড়ে ১০টা।

ডাক্তার মোহাম্মদ শফী প্রাণবন্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। জড়িয়ে ধরে আমার কপালে চুমো খেয়েছিলেন। আনন্দে আর গরবে ছিলেন অশ্রুসজল ।

'এই দিনটি শিরোনামে ১৯৭৩-এর ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের দৈনিক 'স্বাধীন' তায়' পত্রস্থ হয়েছিল আমার কবিতা :

এই দিনটি আমার দিন

হান্নানের দিন

সালামের দিন

কাসেমের দিন, ফারুকের দিন

— এই দিনটিতে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে

একটি ছিন্নপত্রে আমি

লিখেছিলাম একটি নাম :

''স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'—

মাইকের সামনে কাসেমকে

সেটা পড়তে দিয়েছিলাম ।

হান্নান ঘোষণা করেছিলেন।

সালাম ভাষণ দিয়েছিলেন ।

১৯৭১-এর এই দিনটির পর পটিয়া থেকে

আমি ডেকে এনেছিলাম ট্রান্সমিটারে

মেজর জিয়াকে— তারপর এসেছিল

একে একে আমাদের হাবিবুদ্দীন,

আমিন, রাশেদ, শারফুজ্জামান,

শাকের, মুস্তফা, রেজাউল ।

কিন্তু আল্লার কসম, সেদিন

আমি জানতাম না, এ দিনটি

হবে একটা দেশের স্বাধীনতা দিবস (১৮. ৩. ৭৩}

কবিতাটি আমার 'সামনে আছে মুক্তিযুদ্ধ : সবার আগে খাদ্য' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত । একই কবিতার স্বকৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'People's view' পত্রিকায় ১৯৭৬ সালে :

O' let me commemorate a day of mine

And this is a day of mine

The day of late Hannan

The day of poet Salam

The day of Kasem and Faruq-

On this day at Kalurghat Transmitter

I wrote on a loose sheet of paper

A golden name

'Swadhin Bangla Beter Kendra'

(The Free Bangla Radio).

And I allowed Kasem to b'cast it

And Hannan made an announcement.
Salam read out a script.

O'let me commemorate a day-
This day of 1971.
And a day after this day
I contacted the thes Major Zia, for Security and
Hurried he from Patia to the Transmitter,
is an instant response.
Wherefrom his voice ethered
The historic message of Banbgaandhu
Declaring independence of Bangladesh.
Then assembled there
A team of ten word-warriors
Including Habibuddin,
Amin, Rashed, Sharfuzzaman.
Shaker, Mustafa and Rezaul.

And O'let me commemorate a day-
This day of 1971.
While, I swear, I was unaware,

This day would be the day

For an Independent country.

সেই রাতে অনেক ভাবনা-চিন্তা । অনেক কাজ । গভীর রাত পর্যন্ত বৈদেশিক বেতার কেন্দ্রগুলো শোনা দরকার ছিল। সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খন্দকার এহসানুল হক আনসারী। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ তৈরি করেছিলেন সংবাদ বুলেটিন ।

আমার ভাবনা পরের দিনের জন্যে । কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন অরক্ষিত। ওখানে পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা যায়নি। রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে সে বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। এখানে-ওখানে টেলিফোন করেছিলাম। ব্যক্তিগত বন্ধুদের পরামর্শের জন্যে ।

মূল্যবান তথ্য এবং উপদেশ দিয়েছিলেন চন্দনপুরার তাহের সোবহান। বলেছিলেন : পাহারার জন্যে দরকার রাইফেলধারী জোয়ান। আমার জানামতে পটিয়ায় একদল বাঙালি সৈনিক আছে। একজন মেজরও আছেন সেই দলে। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যারা আছে, তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর সাপোর্টার। তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন পটিয়ায় গিয়ে।

পটিয়ার দূরত্ব ১৫/১৬ মাইল। যেতে হলে গাড়ি দরকার। সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল মাহমুদ হোসেনের কথা। আগ্রাবাদ হোটেলের বোর্ডার। দেড়-দু'মাস আগে এসেছিলেন চট্টগ্রামে । ছ'ফুট দীর্ঘদেহী । মাথায় ঝাঁকড়া চুল । চট্টগ্রাম বেতার ভবনে গিয়ে যেচে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন কিছুদিন আগে। আগেই পরিচিত হয়েছিলেন আমাদের বাদ্যযন্ত্রী ও কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে। কয়েকজনের কণ্ঠে কিছু গান বাণীবদ্ধ করে নিয়েছিলেন টেপে। স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন আগ্রাবাদ হোটেলের কনফারেন্স রুমটি। এসব গান পরে ডিস্ক রেকর্ড করা হবে বলেছিলেন। নিজের পরিচয় বলেছিলেন, ফ্রান্সে তাঁর ‘হরে কৃষ্ণ হরে নাম' কন্সার্ট এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে । তিনি এখন দেশে একটি কারখানা খুলবেন। মালামাল শিপমেন্ট হয়েছে। অচিরেই চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছবে। সে-সব ছাড় করার জন্যেই চট্টগ্রামে আসা। চট্টগ্রামে আসার সময় তাঁর সঙ্গে কিছু ডিস্ক রেকর্ড ছিল। ভাস্কর- প্রভা ব্রান্ড এবং ফ্লাওয়ার্স রেকর্ড সেস ডিভিশন নামাঙ্কিত। একটি গান শিল্পী তৃপ্তি দাশের গাওয়া ‘ঝির ঝির ঝির ঝির বর্ষাতে মন আজ উতলা'। প্রযোজনা মাহমুদ

হোসেন। সঙ্গীত পরিচালনা রোড়নি মেনডোজা । গত কয়েকদিন হোটেলের কক্ষে গানটি তিনি বারবার বাজিয়ে বাজিয়ে শুনছিলেন । গানটিতে ঝাঁঝর, বঙ্গ ও বেহালা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। তাল কাহারবা । ডিস্কের অপর পিঠে দীপঙ্কর সেনের কথা 'মন চায়' গানটিও ছিল তৃপ্তি দাশের গাওয়া ।

মাহমুদ হোসেন আমার সঙ্গে আপন মনে বন্ধুত্ব গড়েছিলেন। বেতার ভবনে আমার কক্ষে বসে আনোয়ারের ক্যান্টিনের ঝোলভাত খেয়েছিলেন দু'-তিন দিন। ১৫ মার্চ লালদীঘির পারে বুদ্ধিজীবীদের আহূত জনসভায় আমার পাশে ঘাসের ওপরে বসেছিলেন সারাক্ষণ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে মাহমুদ হোসেনের উৎসাহ ছিল আকাশচুম্বী । আমাকে দিয়ে 'জয় বাংলা' শীর্ষক গীতিনক্সা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। ওতে ডি এল রায় ও অতুলপ্রসাদের চিরায়ত গীতিকথাসহ আমার একটি গান সংযোজিত ছিল। পরিকল্পনা ছিল লং প্লে করার। সেই মর্মে হোটেলের কনফারেন্স রুমে কণ্ঠশিল্পীদের মহড়া হয়েছিল দু'দিন। ২৩ মার্চ বন্দরে বাবর ও সোয়াত নোঙর করার পর সে কাজে ছেদ পড়েছিল। পরে 'জয় বাংলা' গীতনক্সার পাণ্ডুলিপিটি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

রাত ১২টার পর মাহমুদ হোসেনকে পেয়েছিলাম টেলিফোনে। বলেছিলাম : আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে আগামীকাল ভোরে একটি গাড়ি যোগাড় করা ? আমি একটু পটিয়া যেতে চাই ।

: অবশ্যই তা সম্ভব হবে। তার আগে বলুন, আমার অনুষ্ঠানটি কেমন হয়েছে?
: আপনার অনুষ্ঠান ?

: কেন, শুনতে পাননি? রাত ১০টায় কোথায় ছিলেন?

: পথে ছিলাম— কালুরঘাট থেকে শহরে ফেরার পথে। হাঁটা পথ ।

মাহমুদ হোসেন বলেছিলেন : আমি ইংরেজি একটা ঘোষণা প্রচার করেছি মাত্র।

বলতে পারেন এস-ও-এস। সম্বোধন করেছি, 'হ্যালো ম্যানকাইন্ড' বলে। এই মিনিট দশেক। আমি অবশ্য আপনার অনুসরণে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকেই ঘোষণাটি প্রচার করেছি। হোটেলে বসে আপনাদের অনুষ্ঠান শুনবার পরই বেরিয়ে পড়েছিলাম ।

মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে ছিরেন আগ্রাবাদ হোটেলের সহকারী কর্মাধ্যক্ষ ফারুক চৌধুরী, বেতারের নিজস্ব শিল্পী রঙ্গলাল দেব চৌধুরী ও ঘোষক কবীর। দু'জন প্রকৌশলীকে মাহমুদ হোসেন পিস্তলের মুখে নিয়ে গিয়েছিলেন। নাম বলতে পারেননি আমাকে ।

বলেছিলেন : আপনার সঙ্গে পটিয়ায় আমিও যাবো। আমার একটা মিশন আছে। সে ব্যাপারে সামরিক সহযোগিতা দরকার হবে। কথা দিন, সেই মিশনে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

তখন কথা বাড়াতে চাইনি । প্রয়োজনটা ছিল পটিয়া যাবার গাড়ি । কিছুই না জেনে- শুনে বলেছিলাম : হ্যাঁ, আমি থাকবো আপনার সঙ্গে ।

: কিন্তু আমার মিশনটা কি, শুনবেন না ?

: সকাল বেলা যখন গাড়ি নিয়ে আসবেন, তখন শুনবো। এখন আপনার-আমার লক্ষ্য অভিন্ন। কাজেই আপনার মিশন নিশ্চয় আমারও মনঃপূত হবে।

: ঠিক আছে। সকাল ৭টায় তৈরি থাকবেন ।

২৭ মার্চ সকালবেলা কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ এসেছিলেন মুশতারী লজে। নতুন যোগ দিয়েছিলেন পৈত্রিক ব্যবসায়ে। কয়েক মাস যাবৎ চট্টগ্রামে বসবাসরত । আবদুল্লাহ্-আল ফারুকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে আমাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল আ-ে গই । একা বাসায় গত রাতটা খুব ভয়ে ভয়ে কেটেছিল । তাই এখানে চলে এসেছিলেন। ডাক্তার মোহাম্মদ শফী বলেছিলেন : ভয়ের কি আছে ? এখানেই থাকো ।

যথাসময়েই এসেছিলেন মাহমুদ হোসেন। একটি ট্যাকসি নিয়ে। সঙ্গে আরো লোক ছিলেন। একজন আমার পূর্ব পরিচিত। ফারুক চৌধুরী। আরেকজন ওসমান গণি। আগ্রাবাদ হোটেলের কোষাধ্যক্ষ। গাড়ি রাস্তায় রেখে ওঁরা তিনজন ঘরে এসেছিলেন । মাহমুদ হোসেন ছেলেদের কাছে মানচিত্র বইটি চেয়েছিলেন। টেবিলের ওপর পূর্ববঙ্গের ম্যাপটা খুলে বের করতে চেয়েছিলেন সীমান্তের ফাঁক-ফোকর ।

: : কি ব্যাপার?

: ব্যাপারটা পথে পথেই বলা হবে। এখন চলুন ।

এ বাসা থেকে সেদিন আমরা পাঁচজন— কাজী হাবিব উদ্দীন আহমদ এবং এয়ার মাহমুদ যোগ দিয়েছিলেন। সবাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু গাড়িতে এতোজনের জায়গা হবে না। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আরো দু'জন ছিলেন। সিভিল পোশাকে ওঁরা ছিলেন সৈনিক। হাতে রাইফেল। মাহমুদ হোসেনের মিশনের সদস্য এঁরাও। পেছনের সিটে ঠাসাঠাসি করে চারজনকে বসতে হয়েছিল। মাঝখানে ফারুক চৌধুরী ও ওসমান গণি । দু'পাশে রাইফেলের নল বের করে সৈনিক দু'জন। আর সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে আমি ও মাহমুদ হোসেন। আমরা তো দূরের যাত্রী। গন্তব্যস্থল পটিয়া । কালুরঘাটগামীরা হেঁটে বা অন্য কোনো উপায়ে যেতে পারেন। আজ তাড়া ছিল না। পটিয়া থেকে কালুরঘাটে ফিরে আসতে আমার বেশ সময় লাগবে। তারপরই অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। এঁরা কালুরঘাটে ধীরেসুস্থে গেলেই চলবে।

মাহমুদ হোসেন তৈরি হয়েই যাত্রা করেছিলেন। তাঁর মিশনটা ছিল সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করা। বলেছিলেন : আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ভাস্করপ্রভা আমার স্ত্রী। তিনি মোরারজী দেশাই-এর ভাইঝি। লণ্ডনে আমাদের পরিচয় এবং বিয়ে হয়। আমাদের দুই সন্তান। যা-ই হোক, এখন যদি ভারতে যাওয়া যায়, শ্বশুরকুলের প্রভাব খাটিয়ে সামরিক সাহায্য নিতে পারবো। গোলাবারুদ না পেলে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের ঠেকাবো কি দিয়ে ? এটাই আমার মিশন । আপনি কথা দিয়েছেন, আমার সঙ্গে থাকবেন।

পথে এক স্থানে মানুষের জটলা। মাহমুদ হোসেন গাড়ি থেকে নেমেছিলেন। একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন একটা রাইফেল হাতে । তাঁর পেছনে পেছনে এসেছিল মারমুখো জনতা। কোনো ছলে মাহমুদ হোসেন রাইফেলটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। শেষমেশ ওটা ফেরৎ দিয়েই আমাদের কেটে পড়তে হয়েছিল ।

: কি দরকার ছিল ঝামেলা করার ? সামনে আমাদের অনেক কাজ ।

উত্তরে মাহমুদ হোসেন বলেছিলেন : বুঝলেন না, আমাদের হাতে হাতে অস্ত্র দরকার। কখন কি বিপদ আসে!

: দু'জন রাইফেলধারী আছেন তো সঙ্গে ।

: জানেন না তো, ওদের হাতের রাইফেল দু'টি অকেজো। স্রেফ শো ।

আর এক স্থানে গাড়ি থামিয়ে আমরা 'খিরা' কিনে খেয়েছিলাম ।

পটিয়া থানায় মানুষের ভিড়। সবাই ইউনিফর্মধারী মিলিটারি এবং পুলিশের লোক । একটি চেনামুখ মানিক মিয়া। চট্টগ্রামে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল বেশ আগে। বেগম মুশতারী শফীর সম্পর্কিত মামা ।

: এই যে, মানিক মামা, আপনি এখন এখানে ?

: আমি তো এই থানার ও-সি ।

: ভালোই হলো। আচ্ছা, এখানে যে মিলিটারিরা আছেন, ওঁদের সিনিয়র অফিসার কে আছেন?

: মেজর জিয়াউর রহমান ।

: ওঁরা সাথে একটু দেখা করা যাবে?

মানিক মিয়া বলেছিলেন : একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখছি। কিন্তু কি জন্যে দেখা করতে চান ? তিনি জানতে চাইলে কি বলবো ?

: রেডিও থেকে এসেছি বলবেন ।

অনুমতি পেয়ে আমি ও মাহমুদ হোসেন ভেতরে গিয়েছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। সন্ধে ৭টা ৪০ মিনিটে এবং রাত ১০টায় । আমাদের পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন। বলেছিলাম : আপনার কাছে এসেছি একটা সাহায্য চাইতে। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনটিতে যদি প্রহরার ব্যবস্থা করতে পারেন।

মাহমুদ হোসেন বলেছিলেন : আমার অন্য একটি ব্যাপার আছে।

: বলুন ।

খুব নিম্নস্বরে মাহমুদ হোসেন তাঁর মিশনের কথা বলেছিলেন। কক্ষটি বেশ বড়ো। বিছানাপত্র ছড়ানো ছিটানো। চেয়ার ছিল বিক্ষিপ্তভাবে। এক কোনোয় একটা বড়ো টেবিলে খাবারের স্তূপ। পাউরুটি, নানরুটি, পোলাও, ভাজা মাছ, মুরগির রোস্ট, সবজি, ঘন ডাল। এসব খাবার বিভিন্ন বাড়ি থেকে সরবরাহকৃত। কক্ষে অনবরত সৈনিকদের আনাগোনা ছিল।

মেজর জিয়াউর রহমান বলেছিলেন : 'আর্মস এম্যুনিশন খুবই দরকার

আমাদের। আপনার মিশন সফল হোক কামনা করি। কিন্তু এতে আমি কি সহযোগিতা করতে পারি?'

: বর্ডার ক্রস করতে হবে তো! আপনি শুধু একটা স্লিপ লিখে দেবেন, আমরা আপনার লোক । ওতেই হবে ।

: বেশ তা-ই হবে। কিন্তু অফিসিয়াল কোনো সিলমোহর বা রাইটিং প্যাড নেই সঙ্গে। শুধু স্বাক্ষর ।

: ওতেই হবে ।

দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমান আমাদেরকে কিছু খেয়ে নিতে বলেছিলেন। সেই টেবিল থেকে হাতে হাতে খাবার তুলে সবাই খেয়েছিলাম।

তিনটি লরিতে জোয়ানরা সজ্জিত হয়েছিলেন। একটু আগে-পরে যাত্রা করা হয়েছিল । একটি লরি অদৃশ্য হবার পর অন্যটি স্টার্ট নিয়েছিল । তিনটি লরি ছেড়ে যাবার পর আমরা যাত্রা করেছিলাম। সামনে মেজর জিয়াউর রহমানের জিপ। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গসহ । পেছনে আমাদের ট্যাক্স ।

সারা পথে মাথায় হাতে মালামালসহ লোকজন । সবাই চট্টগ্রাম শহর বা শহরতলির কর্মস্থল ছেড়ে পলায়নরত। আমরা বিপরীতমুখো পটিয়া থেকে কালুরঘাট। অর্থাৎ শহরের দিকে। গাড়ি থামিয়ে খণ্ড জনতাকে মেজর জিয়াউর রহমান বলেছিলেন : আপনারা কেউ শহর ছেড়ে যাবেন না । কার ভয়ে পালিয়ে যাবেন ? দুশমনদেরকে আমরা দু'দিনের মধ্যে ধ্বংস করে দেবো। আর এক পা ওদিকে নয়। চলুন-ফিরে চলুন শহরের দিকে । একটা ব্যাপারে আপনাদের বলে দিচ্ছি। উর্দু ভাষায় যারা কথা বলে, ওদেরকে বিশ্বাস করবেন না। ওরাই পাকিস্তানি সৈন্যদের আশ্রয় দেবে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে দুশমনকে সহযোগিতা করবে। সামনে পেলেই শেষ করে দেবেন ওদেরকে।

এই একই বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি পথে দশ জায়গায় গাড়ি থামিয়ে । ট্রান্সমিটারে পৌছতে বিকেল ৫টা বেজে গিয়েছিল। আমরা পৌছবার আগেই জোয়ানরা এলাকাটির বেষ্টনিতে পরিখা খনন করে পজিশন নিয়েছিলেন।

অফিস-কক্ষে শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম : আচ্ছা, মেজর সাহেব, আমরা তো সব 'মাইনর', আপনি 'মেজর' হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়।

কথাটা ছিল নিতান্ত রসিকতা। তিনি নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন : হ্যাঁ। কিন্তু কি বলা যায়, বলুন তো ।

আমি এক পাতা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের পকেট থেকে কলম হাতে নিয়েছিলেন । প্রথমে তিনি লিখেছিলেন : I, Major Zia do hereby declare independence of Bangladesh.

আমি তখন বলেছিলাম : দেখুন, 'বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে' বলবেন কি?

তিনি বলেছিলেন : হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।— নিজের নামের শেষে তীর-চিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন : on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman....

মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর ঘোষণাপত্রে কিছু অস্ত্রের নাম লিখেছিলেন- পাঞ্জাবি সৈন্যদের হাতে তখন যেসব অস্ত্র ছিল। অস্ত্রের নামগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি উচ্চকণ্ঠে ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকেছিলেন। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ বাইরে থেকে এসে আমার পাশে বসেছিলেন। তিনজনের আলাপ-আলোচনায় খসড়াটি চূড়ান্ত হয়েছিল ।

ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত। আমরা একে অন্যকে 'তুই- তুমি' বলতাম । একান্তে বলেছিলাম : ঘোষণাটির বাংলা তর্জমা হওয়া দরকার ।

: তুমিই স্যারকে বলো ।

বলতেই মেজর জিয়াউর রহমান সম্মতি দিয়েছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণাটির অনুবাদ করতে গিয়ে যথাশব্দ খুঁজে পাচ্ছিলাম না । সময়ও ছিল কম। তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠান শুরু করা দরকার। বাইরে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদকে দেখতে পেয়েছিলাম ।

: মেজর সাহেব, একজন বাংলার অধ্যাপক আছেন বাইরে। তাঁকে দেখিয়ে নিলে অনুবাদটা সুন্দর হবে ।

সেই সান্ধ্য অধিবেশনে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বকণ্ঠ ঘোষণার পর অনুবাদটিও অন্যদের কণ্ঠে বারবার প্রচার হয়েছিল। ঘোষণাটি প্রধানত আমার সঙ্গে আলোচনা করে রচিত এবং ক্যাপ্টেন অলি আহমদের উপস্থিতিতে। আর

বাংলায় অনুবাদের সময় আমাকে সহায়তা করেছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ। ঘোষণার মর্মবাণী ছিল, মেজর জিয়া মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন। বাংলাদেশের সর্বত্র দখলদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে আমাদের একদিন বা দু'দিনের বেশি সময় লাগবে না। এখন দেশ-বিদেশের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য পাওয়া আমাদের প্রয়োজন । ইত্যাদি ।

আজকের অধিবেশনে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সংবাদ বুলেটিন রচনা করে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে স্বকণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। সংবাদ বুলেটিনে মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাকে 'বিবৃতি' বলে কভারেজ দেয়া হয়েছিল। প্রক্ষেপণের দায়িত্বে ছিলেন আমিনুর রহমান ও আবদুশ শুকুর । মোহরা গ্রামের সেকান্দর হায়াত খান ও হারুণ-অর রশীদ খান দুই ভাই আমাদের সহযোগিতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

অধিবেশন-শেষে মাহমুদ হোসেন কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন : মেজর সাহেবের কাছ থেকে পরিচিতি-পত্র নিয়েছি। আপনি তৈরি আছেন আশা করি । আজ এখান থেকেই আমরা যাত্রা করবো। রাতেই যেন বর্ডার ক্রস করতে পারি। শুভস্য শীঘ্রম ।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও এয়ার মাহমুদ আমার পাশেই ছিলেন। মাহমুদ হোসেনের পরিকল্পনাটি তাঁদের মন:পুত ছিল না। বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে আমার যুক্ত হওয়া অবাঞ্ছিত। আমাকে কড়িডোরের এক ধারে নিয়ে গিয়ে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ বলেছিলেন: ইনি বিদেশে থাকেন, বিদেশে চলে যাবেন— কিন্তু আপনি কেন যাবেন ?

এয়ার মাহমুদ বলেছিলেন : তোমাকে সাথে নিতে চাইছেন নিজের স্বার্থে।

: কিসের স্বার্থ ? বর্ডার ক্রস করার ব্যাপারে আমি তো তাঁর কোনো সাহায্যে আসবো না । আমাকে যেতেই হবে। কারণ আমি তাঁকে কথা দিয়েছি।

ইতোমধ্যে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন সেখানে এসে পড়েছিলেন। সব শুনে তিনিও আমার যাওয়া নাকচ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ চলে গিয়েছিলেন মেজর জিয়াউর রহমানের কাছে।

ট্রান্সমিটারের অফিস-কক্ষে মাহমুদ হোসেনও ছিলেন। মেজর জিয়াউর রহমান আমাকে বলেছিলেন : আপনাকে তো এখানে বেতার পরিচালনার জন্যে থাকতে হবে । মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে আপনার যাওয়া চলবে না। ঠিক আছে?

সে মুহূর্তে অদূরে মাহমুদ হোসেনের চোখে আমি দেখেছিলাম অসহায় দৃষ্টি । তিনি যেন আমাকে করুণা করেছিলেন।

মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার ইংরেজি পাণ্ডুলিপিটি আমার পকেটে ছিল। বাসায় ফেরার পর ডাক্তার মোহাম্মদ শফীকে দেখতে দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন : এসব কাগজ রাখতে নেই। প্রচার করা হয়ে গেছে। প্রয়োজন মিটে গেছে ।

বলেই তিনি খণ্ড কাগজটি চুলার আগুনে ফেলে দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের বিজয় দিবসের দু'-একদিন আগের কথা। ক্ষমতাসীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সরাসরি আমার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন । ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ।

: আপনি বেলাল বলছেন ?

: জি।

: চট্টগ্রামের বেলাল তো ?

: জি। আমাকে কি আপনার মনে আছে?

: মনে না থাকলে কথা বলছি কেন ? আপনার কি মনে আছে, আমি কি কলম দিয়ে ২৭ মার্চের ঘোঘণাটি লিখেছিলাম ?

: কলমটা আপনার নিজের পকেট থেকেই নিয়েছিলেন। সেটা কি কলম ছিল, মনে নেই ।

একই দিনে আন্ত:সার্ভিস জনসংযোগের পরিচালক টেলিফোনে আমাকে মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার খসড়াটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। অনুযোগ দিয়েছিলেন, সেটা কেন নষ্ট করা হলো! জবাবে আমি কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম । পরে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে যেন তাঁকে জানাই । স্বয়ং জেনারেল এ বিষয়ে আগ্রহী। এক ঘণ্টার ব্যবধানে

টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলাম । সেই প্রসঙ্গে দাবি করেছিলাম, আমার স্মৃতিচারণায় ভাষা ও শব্দগত বিভ্রম ঘটলেও, বক্তব্য অবিকৃতই রয়েছে।

একই বিষয়ে ১৯৭৮ সালে কর্নেল অলি আহমদ আমার সঙ্গে টেলিফোন আলাপ করেছিলেন। ঢাকা থেকে সিলেটে। কর্নেল অলি আহমদ আমাদের দশজন প্রাথমিক কর্মীর নাম-তালিকা এবং কে কোথায় অবস্থানরত, তা-ও জেনে নিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে ।

২৮ মার্চ সকালবেলা যানবাহন-সমস্যার সমাধান হয়েছিল আকস্মিকভাবে। হাবিবুর রহমান জালাল একটি গাড়ি নিয়ে এনায়েত বাজারে এসেছিলেন। সেই গড়িতেই আমরা কালুরঘাট পৌঁছেছিলাম ।

প্রতিদিন সকাল ৯টার পর প্রথম অধিবেশন। দুপুর ১ টার পর দ্বিতীয় অধিবেশন এবং সন্ধে ৭টার পর তৃতীয় অধিবেশন। এটাই শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমাদের আগাম ঘোষণা । কাঁটায় কাঁটায় অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব ছিল না বলেই এভাবে জানিয়ে রাখা হতো । আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন প্রকৌশল বিভাগের রাশেদুল হেসেন ও শারফুজ্জামান । বলেছিলেন : আর আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। এখানেই থেকে যাবো দিনরাত ।

আমি বলেছিলাম : সবাইকে তা-ই করতে হবে। আমিও ঠিক করেছি, আজ রাতে একটু ফিরবো শহরে । আগামীকাল সকালে এসে আর যাবো না। এখানে তো অসুবিধা নেই। সুন্দর সামরিক পাহারা রয়েছে।

শারফুজ্জামান বলেছিলেন : অসুবিধা কিছুই নেই, বরং পিছুটান থাকলেই অসুবিধা । কাজ পেয়েছি, কাজে নেমেছি। আর কেনোদিকে তাকাবো না। আমি এ-ই বুঝি ।

ট্রান্সমিটার ভবনে খাবারের সমস্যা ছিল না। আশপাশের গ্রাম থেকে হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার আসতো। কেউ কেউ টেলিফোনে অনুরোধ করতেন, বিরিয়ানি রান্না করে রাখা হয়েছে। দয়া করে গাড়ি পাঠালে ভালো হয় । জোয়ানদের জন্যেই এতোটা করা হতো । ও থেকে আমরাও খেয়ে নিতে পারতাম ।

বলেছিলাম : আচ্ছা, বলা তো যায় না কিছুই। খারাপটা চিন্তা করে রাখাই ভালো। ধরো, এই এলাকাটির যদি পতন ঘটে, তাহলে আমরা অনুষ্ঠান কি করে চালু রাখবো? এমন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি?

রাশেদুল হোসেন বলেছিলেন : ব্যবস্থা আছে, আবার নেই-ও।

: মানে ?

ঐ : পেছনের ঘরটায় একটা ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার আছে। এক ট্রাকের বোঝাই হবে। সাহস করে ওটাকে তুলে নিয়ে যদি যাওয়া যায়—

শারফুজ্জামান বলেছিলেন : কাজটা খুব সহজ নয় । তুলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো যাবে কিনা, কিছুই তো বলা যায় না। নিরাপদ জায়গাও তো চাই ।

কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন : না হয় আমরা ওটাকে মোবাইল করে নেবো । ট্রাকের ওপরেই বসানো থাকবে ।

এই আলোচনার সময় হারুন-অর-রশীদ খান উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে ছিল ঔৎসুক্য। এঁরা দুই ভাই স্বত:স্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। পিতা প্রয়াত সালেহ আহমদ খান ছিলেন রাজনীতিক। পাঁচলাইশ থানা আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি । সেকান্দর হায়াত খান আওয়ামী লীগের কর্মী। আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন হারুন-অর- রশীদ খান। তিনি তমদ্দুন মজলিশের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যদের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। স্থানের আনুকূল্য ছিল। এঁদের বসতবাড়ির কাছাকাছি এলাকাতেই সৈন্যদের প্রাথমিক ছাউনিগুলো গড়ে উঠেছিল। বাহাদ্দার হাট থেকে ফুলতলি পর্যন্ত এলাকায়। ছাউনিগুলোর তত্ত্বাবধান, যানবাহনের জন্যে পেট্রোল সংগ্রহ সব কাজেই এঁরা সহযোগিতা দিয়েছিলেন।

হারুন-অর-রশীদ খান জানতে চেয়েছিলেন, ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটির সঙ্গে ১০ কিলোওয়াটের কোনো যোগসূত্র আছে কি না ।

: না, নেই ।

সামরিক প্রহরার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন লে. শমশের মোবিন। বলেছিলেন : কেন্দ্রের নাম থেকে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দিতে হবে। ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'- এ নামটিই থাকবে। মেজর জিয়ার নির্দেশে আপনাকে জানালাম ।

সেদিন দুপুরের অধিবেশন থেকে নির্দেশটি কার্যকর করা হয়েছিল । মূলত ২৬ মার্চ- এ নামটিই আমি প্রথম লিখেছিলাম। আবুল কাসেম সন্দ্বীপের প্রস্তাবে ‘বিপ্লবী' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছিল।

কয়েকজন ক্যাপ্টেনের আনাগোনা ছিল। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ছায়ার মতো মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ছিলেন। একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া। বেতারের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র মেজর জিয়াউর রহমানের নাম প্রচারিত হচ্ছিল। ক্যাপ্টেনরা নিজেদের নাম প্রচারে আগ্রহী হয়েছিলেন।

একটা বিজ্ঞপ্তি রচনা করেছিলেন ক্যাপ্টেন ভূঁইয়া। বক্তব্য ছিল, জনগণ যেন তাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লালদীঘির ময়দানে জমায়েত হন। সেখানে তাঁদেরকে পরবর্তী নির্দেশ দেবেন ক্যাপ্টেন অমুক অমুক.....ইত্যাদি ।

আমি বলেছিলাম : এটা প্রচার করা কি ঠিক হবে? এতে আমরা যে চট্টগ্রামে আছি, শত্রুরা সহজেই তা জেনে যাবে ।

: সেটা আমরা বুঝবো। আপনাকে যা বলা হচ্ছে, তা-ই করুন। এটা প্রচার করে দিন ।

: বেশ তো, আপনাদের কারো কণ্ঠেই এটা প্রচার করতে পারেন। সেটাই সমীচীন হবে।

দ্বিতীয় অর্থাৎ দুপুরের অধিবেশনে ওঁরা সেটি প্রচার করেছিলেন। পর মুহূর্তে তাঁদের মধ্যেই কেউ হয়তোবা আমার মন্তব্যের যৌক্তিকতা বুঝতে পেরেছিলেন। এছাড়া অন্য একটি আশঙ্কার কথাও কারো মনে পড়েছিল। লালদীঘির ময়দানের জমায়েতের ওপর যদি বিমান থেকে হামলা আসে। বিজ্ঞপ্তিটিকে তাঁরা পরে শুধরে নিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল : ‘আপনারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিজ নিজ মহল্লায় তৈরি হয়ে থাকুন । পরবর্তী নির্দেশ দেবেন ক্যাপ্টেন অমুক অমুক.....ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ফলে আমাদের অবস্থান নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এর প্রতিকার করতে গিয়ে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ সংবাদ বুলেটিনে লিখেছিলেন : ‘আমাদের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কয়েকজন বাঙালি ক্যাপ্টেন এই মর্মে জনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন.... ইত্যাদি ।

আগের রাতে ডা. মোহাম্মদ শফীর কিশোর পুত্র মেরাজ হঠাৎ বলেছিল : কাকু, তোমরা জানো, টিক্কা খান মরে গেছে?

: এ্যা ? কে বলেছে? কার কাছে শুনেছ ?

: সত্যি বলছি। পাড়ার ছেলেরা বললো।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ লুফে নিয়েছিলেন তথ্যটি। আজকের সংবাদ বুলেটিনে কভার করেছিলেন। টিক্কা খানের মৃত্যুর (?) খবরটি পরে বিবিসি থেকেও প্রচারিত হয়েছিল ।

আজ অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ টেলিফোনে একটি চাঞ্চল্যকর খবর পাঠিয়েছিলেন। হানাদার বাহিনীর মধ্যে অন্তর্বিরোধ। বালুচ রেজিমেন্টের জোয়ানরা বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে। তাদেরও রয়েছে স্বায়ত্তশাসনের দাবি... ইত্যাদি ।

টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন ফকির আহমদ ও বদরুল হুদা চৌধুরী। আমাদের সাথে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। পরে কিন্তু আসতে পারেননি।

'এগ' ও 'গলফ' সাংকেতিক নামে কেউ দু'টি ইংরেজি ঘোষণাপত্র আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে দু'টির বক্তব্য সময়োপযোগী ছিল। আমরা প্রচার করেছিলাম। পরে জেনেছি, প্রেরক ছিলেন সৈয়দ আশরাফ আলী ও আবদুল মালেক খান। চট্টগ্রাম বেতারের দু'জন উচ্চপদস্থ অফিসার।

একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন । অধ্যাপিকা তমজিদা বেগম। অত্যন্ত আগ্রহ স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করার । কিন্তু নিজে থেকে কিছু লিখতে অপরাগ। অনুরোধ করেছিলেন কিছু একটা লিখে দিতে। ভদ্রমহিলার ব্যাকুলতায় অভিভূত হয়েছিলাম। তাৎক্ষণিক কিছু বক্তব্য লিখে দিয়েছিলাম। তিনি পাঠ করেছিলেন।

আজ মেজর জিয়াউর রহমান নতুন একটি ঘোষণালিপি নিয়ে এসেছিলেন। ওতে নিজেকে তিনি Provisional Head of Bangladesh এবং স্বাধীন বাংলা লিবারেশন আর্মির প্রধান বলে উল্লেখ করেছিলেন। খসড়াটি নিয়ে তাঁর সঙ্গী ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান দ্বিধাগ্রস্ত, এ ঘোষণাটি প্রচার করা সঙ্গত হবে কিনা। একজন বলেছিলেন : এই প্রাধান্য দাবি আপনাকে করতেই হবে, নইলে দেশ-বিদেশের কাছে আপনার আবেদনের গুরুত্ব কি করে হবে?

তিনি বলেছিলেন : কিন্তু অন্য এলাকায় আমার চেয়ে সিনিয়র বাঙালি অফিসার থাকতে পারেন। তিনিও হয়তো আমাদের মতোই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন

এবং প্রতিরোধ শুরু করেছেন ।

: তা হোক ।

মেজর জিয়াউর রহমান আমার সম্মতি চেয়েছিলেন। বলেছিলাম : ক্যান্টনমেন্টের বাইরে আপনার মতো আর কেউ আছেন কি না— মানে, কোনো বাঙালি সিনিয়র অফিসার, তা জানার উপায় নেই। বিদেশের কাছে গুরুত্ব উৎপাদনের জন্যে আপনি নিজেকে বঙ্গবন্ধুর অধীনস্ত সামরিক বাহিনীর প্রধান অবশ্যই বলতে পারেন ।

ঘোষণাটি প্রচারের সময় 'বঙ্গবন্ধুর নাম' উল্লেখ করা হয়নি । পরে শুধরে নিয়ে অর্থাৎ on behalf of Bangabandhu যোগ করে ঘোষণাটি লে. শমশের মোবিনের কণ্ঠে কয়েকবার প্রচারিত হয়েছিল। সচেতন শ্রোতাদের কাছে মেজর জিয়াউর রহমানের দ্বিতীয় ঘোষণাটি ছিল আপত্তিকর । প্রবীণ রাজনীতিক এ কে খান এর প্রতিকারের জন্যে সক্রিয় হয়েছিলেন । তাঁর বিবেচনার স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে পটভূমি চাই, যা ঐ সময়ে শেখ মুজিব ছাড়া আর কারো ছিল না।

১৯৭২ সালে জনাব এ কে খানের সঙ্গে আমি ও বেগম মুশতরী শফী দেখা করতে গিয়েছিলাম । সেদিন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : বেতারে একটি ঘোষণা প্রচার করেই কেউ রাতারাতি বিরাট কিছু হয়ে যেতে পারে না। আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ঘোষণাটি শুনে। তরুণ সৈনিক তিনি। ঘোষণাটি শোধরাবার জন্যে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ।

সেই মর্মে মেজর জিয়ার তৃতীয় ঘোষণায় বারবার মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখিত হয়েছিল । দাবি করা হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু বিপ্লবী পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। ঘোষণাটি কালুরঘাট এলাকার বাসিন্দা ওসমান গণি তাঁর টেপ রেকর্ডারে বাণীবদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর আমাদের সহকর্মী আমিনুর রহমানের মাধ্যমে সেটির ডাবিং সংগৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্র থেকে সেটির নির্বাচিত অংশ প্রচারিত হয়েছিল ।

বিমান হামলার সময় করণীয় সম্পর্কে আমরা একটি নির্দেশমালা পেয়েছিলাম। ২৮ মার্চ থেকে তা প্রচার শুরু করা হয়েছিল। নির্দেশসমূহ আমি স্বকণ্ঠে প্রচার করেছিলাম। ঐ দিনই দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি একটি ক্ষুদে কলেবর কথিকা

প্রচার করেছিলাম । কথিকাটি পরে শহীদুল ইসলাম সম্পাদিত ‘শব্দ সৈনিক' গ্রন্থে ‘স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম কথিকা' শিরোনামে পত্রস্থ হয়েছিল। একইভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্কলিত হয়েছিল ১৯৮২ সালে প্রকাশিত শামসুল হুদা চৌধুরীর ‘একাত্তরের রণাঙ্গন' প্রামাণ্য গ্রন্থেও। ১৯৭২ সালের ২৪ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর সহৃদয় উপস্থিতিতে গণভবনে আয়োজিত ‘স্বাধীন বাংলাবেতার কেন্দ্রের নমুনা অধিবেশনে'ও প্রথম আইটেম হিসেবে আমি পাঠ করেছিলাম। নমুনা অধিবেশনটি বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রচারিত হয়েছিল। কথিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কবির ভাষায় : ‘স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে

কে বাঁচিতে চায়

দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় রে

কে পরিবে পায়।'

দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গেছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি । স্বাধীনতা বঞ্চিত জীবন থেকে তারা স্বাধীন জীবনের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে-এই এগিয়ে চলার পথ দুর্গম দুর্বার। এই যাত্রাপথে কোনো শাসক-শোষকের দমননীতি, কোনো অশুভ শক্তির বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। জীবনজয়ের অভিযাত্রীদের কে বাধা দেবে ? কে এই অভিযাত্রীদের পথ রোধ করে দাঁড়াবে ? সেই সাধ্য কারুর নেই । সেই দু:সাহস দেখাবার সকল ‘পশ্চিম পাকিস্তানি দাপট' আজ ছিন্নভিন্ন, পর্যুদস্ত।

ভাবতে অবাক লাগে, তেইশ-তেইশটি বছর কিভাবে সেই তথাকথিত পাকিস্তান সরকার বাংলার মা-বোন, বাংলার শিশু-বৃদ্ধ, বাংলার কৃষক-শ্রমিক, জেলে-তাঁতি, কামার-কুমার-মেহনতি মানুষের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছে। আমার সন্তানের দুধ ওরা কেড়ে খেয়েছে, আমাদের ক্ষেতের ফসল ওরা লুটে নিয়েছে, ওরা আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করেছে, তথাকথিত সংহতির ধুয়া তুলে ওরা আমাদের নিরীহ জনপদের ওপর শাসনের নামে চালিয়ে গেছে শোষণ ।

বাংলার মানুষকে ওরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর অবহেলা দিয়ে দিয়ে নিজেদের

জাতিগত দুশ্চরিত্রেরই পরিচয় দিয়েছে।

আজকের স্বাধীন বাংলার পথেঘাটে দেখতে পাওয়া যায় বীর জনতার গড়া স্বত:স্ফূর্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানি গুপ্তচর, বর্বর সৈন্যদের প্রত্যেক প্রবেশ- পথ আজ রুদ্ধ । ওদেরকেই যেখানেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনীর রাইফেল গর্জে উঠছে, এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যাচ্ছে বুলেট, আর ধরাশায়ী হচ্ছে এক-একটি হানাদার দুশমন। ওদের ক্ষমা নেই— ক্ষমা নেই ।

স্বাধীন বাংলার প্রতিটি গৃহ এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। আমাদের মা-বোনরাও আর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। প্রত্যেকেই সশস্ত্র । দুশমনকে উচিত সাজা দেবার জন্যে নারী- পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই সদাপ্রস্তুত ।

বাঙালি আজ জেগেছে। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে তারা—

‘এবার বন্দি বুঝেছে,

মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ

মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে

উঠিতেছে এক তান :

জয় নিপীড়িত জনগণ জয়

জয় নব অভিযান

জয় নব উত্থান!! :

জয় স্বাধীন বাংলা ।

(২৮-৩-৭১)

২৯ মার্চ সকালে মুশতারী লজ থেকে পায়ে হেঁটে কালুরঘাট গিয়েছিলাম আমরা। আমি, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ্ আল ফারুক ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ । রাশেদুল হোসেন ও শারফুজ্জামান রাতে ট্রান্সমিটার ভবনেই থেকে গিয়েছিলেন । এ ছাড়া আমিনুর রহমান ও আবদুশ শুকুরের বাড়ি কালুরঘাট এলাকাতেই। সকালবেলার অধিবেশন শেষ করে আমরা পাশে

রিসিভিং সেন্টার ভবনে জটলা করছিলাম। দুপুরের অধিবেশনের অনুষ্ঠান-সম্ভার তৈরির কাজও চলছিল বিক্ষিপ্তভাবে। তখন বেলা সাড়ে ১১টা ।

সহসা ভেসে এসেছিল একটি অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। শারফুজ্জামান রিসিভার অন করেছিলেন । আমাদের কেন্দ্র থেকেই প্রচার করা হচ্ছিল কিছু বক্তব্য । সবাই আমরা ছুটে গিয়েছিলাম । স্টুডিওর মাইক্রোফোন তখন বেতার প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুশ শাকেবের দখলে। তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন অনুষ্ঠান প্রযোজক মুস্তফা আনোয়ার। অপারেশন বুথ-এ রেজাউল করিম চৌধুরী।

এঁদের সমাগম আমাদের জন্যে উৎসাহকর । কিন্তু এমনি সহসা ট্রান্সমিটার চালু করা নিয়মতান্ত্রিক ছিল না। পাঠ শেষ হবার পর আমরা আপত্তি প্রকাশ করেছিলাম ।

: আমরা একটা সময় নির্দিষ্ট করেছি অনুষ্ঠানের জন্যে। আপনারা চালাতে পারেন বলে অমনি এসে ট্রান্সমিটার চালু করে দেবেন, এটা তো ঠিক হয়নি।

অনুযোগটা ওঁরা মেনে নিয়েছিলেন। সৈয়দ আবদুশ শাকের বলেছিলেন : আমরা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে থেকে যাবার জন্যেই এসেছি।

আগ্রাবাদ বেতার ভবন থেকে ২৬ মার্চ সকালবেলা বেরিয়ে গিয়েছিলেন এঁরা। তারপর থেকেই সক্রিয় ছিলেন কিছু একটা করার জন্যে। যোগাযোগ করেছিলেন রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে। নবাগত এই তিনজনকে পেয়ে আমরা হয়েছিলাম পূর্ণাঙ্গ একজন বেতার প্রকৌশলীকে দলীয় সাথী হিসেবে পাওয়া বিরাট ব্যাপার ছিল। সৈয়দ আবদুশ শাকের আবার যতোটা প্রকৌশলী, তার চেয়ে বেশি সাহিত্য রসিক। এ ছাড়া মুস্তফা আনোয়ার একজন সুদক্ষ ব্রডকাস্টার। লেখার শক্ত সুন্দর হাত ।

সেই রাতেই আমরা একটু আরামে থাকা খাওয়ার উদ্যোগ করেছিলাম। অদূরে মোহরা গ্রামে সেকান্দর হায়াত খান ও হারুন-অর-রশীদ খানের বাড়িতে। জান আলী খান চৌধুরীর বাড়ি। আরাম উপভোগ করা যায়নি। গভীর রাতে সেখানেই পৌছে গিয়েছিল একটি মাইক্রোবাস। মেজর জিয়াউর রহমান পাঠিয়েছিলেন। আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে । আমরা অবাক হয়েছিলাম। এই নৈশ তলবের হেতু কি !

গ্রামীণ অন্ধকার সড়কে ধীরে ধীরে চলেছিল গাড়ি। কালুরঘাট ব্রিজের কাছে

এসে ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করেছিলেন।

: আপনারা হাতের সিগারেট ফেলে দিন দয়া করে । কথা বলবেন না কেউ । ব্রিজটা পার হতে হবে গাড়ির হেডলাইট না জ্বালিয়ে ।

জিজ্ঞেস করেছিলাম : কেন, বলুন তো ?

: সাবধানে চলা দরকার। পাকিস্তানি সৈন্যরা যদি লঞ্চে এসে ওঁৎ পেতে থাকে। মনে মনে সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কালুরঘাট ব্রিজটা কি এতো দীর্ঘ ? পার হতে যেন এক যুগ সময় লেগে গিয়েছিল ।

ফুলতলির কাছে হাওলা রোডের ওপরে মেজর জিয়াউর রহমানের জিপটি দাঁড়িয়ে ছিল। সেটার পাশে থামানো হয়েছিল আমাদের মাইক্রোবাস ।

মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন অলি আহমদ রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কাছে এগিয়ে যেতেই ঝাঁজালো কণ্ঠে মেজর জিয়াউর রহমান বলে উঠেছিলেন : ইঞ্জিনিয়াররা নাকি চলে যেতে চায় ? আমি শুট্ করবো।

: বলেন কি! আজও তো আমাদের তিনজন নতুন সহকর্মী এসেছেন । এই যে, ইনি সৈয়দ আবদুশ শাকের। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ।

: কিন্তু রাতে আপনারা কোথায় চলে গিয়েছিলেন ?

এতোক্ষণে বোঝা গিয়েছিল ব্যাপারটা। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ বলেছিলেন : মিসরিপোর্ট হয়েছে, স্যার!

বড়ো দু:খে হাসি পেয়েছিল। চারদিন আগে আমিই তো পটিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলাম মেজর জিয়াউর রহমানকে । প্রস্তাব করেছিলাম বেতারে ঘোষণা প্রচার করার জন্যে। আর এখানে আমরা প্রত্যেকেই স্বত:প্রণোদিত, প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে উদ্বুদ্ধ ।

মেজর জিয়াউর রহমান জিপের সিটে উঠে বসেছিলেন। আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন অলি আহমদ। তাঁরা দু'জনে নিম্নস্বরে কিছু আলাপ করেছিলেন। তারপরই ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন । বলেছিলেন : তুমি হয়তো শুনে কষ্ট পাবে। তবু খবরটা তোমাকে বলতে হয়, তোমার বন্ধু মাহমুদ হোসেন নিহত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গী দু'জনও।

সেই ২৭ মার্চ রাতেই তাঁরা ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে এগিয়েছিল তাঁদের গাড়ি। পথে পুলিশ ফাঁড়িগুলোর সামনে সামনে প্রহরা । একটা লম্বা বাঁশ রাস্তার এপাশ-ওপাশ পাতা। গাড়ি থামাতে হয়, পরিচয় বলতে হয়। তারপর ছাড়া পাওয়া যায়। বাঁশের এক প্রান্ত ওপরে ঠেলে দিয়ে গাড়ি গলিয়ে নেবার পথ করে দেয়া হয়। ফাঁড়িতে ফাঁড়িতে এমনি যাত্রাবিরতিতে সময় নষ্ট হয়। মাহমুদ হোসেনের জন্যে হয়তো এ ছিল অসহ্য। তিনি তাই জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। এপাশ- ওপাশ পাতা বাঁশ ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল গাড়ি। পরের ফাঁড়িতে টেলিফোনে খবর চলে গিয়েছিল। মাহমুদ হোসেনের পুষ্ট শরীর ও দীর্ঘ চূল চকিতে দেখা গিয়েছিল। সন্দেহ হয়েছিল তাঁকে অবাঙালি বলে । পরের ফাঁড়ি হারবাং-এ আটক করা হয়েছিল তাঁদেরকে । তারপর জিজ্ঞাসাবাদ। গাড়ির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল অনেক টাকাকড়ি। বিদেশী মুদ্রাও। মেজর জিয়াউর রহমানের দেয়া পরিচয়পত্র হয়েছিল উপেক্ষিত ।

ওখানে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরাও উপনীত হয়েছিলেন। মাহমুদ হোসেনকে সি- আই-এ-র দালাল ঘোষণা করা হয়েছিল। গুলি করা হয়েছিল তিনজনকে। মাহমুদ হোসেন, ফারুক চৌধুরী ও ওসমান গণি। সিভিল পোশাকধারী রাইফেলধারী দু'জনকে এবং ড্রাইভারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

তিনটি লাশ দু'দিন শঙ্খ নদীতে ভাসমান ছিল। স্থানটির নাম 'বুড়া মৌলবির ট্যাক'। দু'দিন পর বুড়া মৌলবি সাহেব দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন ।

১৯৭৩ সালের প্রথম দিকে মাহমুদ হোসেনের পরিবারের সদস্যরা চট্টগ্রামে এসেছিলেন। ওঁদেরকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম হারবাং এলাকায়। বুড়া মৌলবি সাহেব তখন গত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে কবরের স্থানটি দেখিয়েছিলেন । শঙ্খ নদীর ভাঙনের ফলে স্থানটি জলমগ্ন ।

মাহমুদ হোসেন অরিজিন অব হিপ্পীইজম-এর ওপর একটি ছবি করতে চেয়েছিলেন। আদি উৎসস্থল চিহ্নিত করেছিলেন ভারতবর্ষকে। নিজেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই মেক-আপ-এ তাঁর একটি ছবি বেরিয়েছিল ঢাকার একটি সিনেমা পত্রিকায়। চট্টগ্রামে একদিন মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে একজন চিত্রনায়িকাকে দেখেছিলাম ।

লন্ডনে আইউব খানের সভায় একবার হাতবোমা ছোঁড়া হয়েছিল। সেটি ছিল

বাঙালি দুই সহোদরের কীর্তি। মাহমুদ হোসেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম ।

মাইক্রোবাসে বসেই কেটেছিল রাতটা। অহেতুক বন্দিত্বের রাত। স্থানটি মনসার ট্যাক। ফুলতলি ছাড়িয়ে পটিয়ার কাছাকাছি।

৩০ মার্চ । প্রত্যুষে হাওলা রোডের পাশের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাস্তা খাওয়া । গরম পরাটা আর ভাজি হরিলুট করে খেয়েছিলাম। পয়সাটা দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান ।

ওখানে দাঁড়ানো অবস্থাতেই হঠাৎ একটি ফায়ারিং-এর শব্দ। আমার ডান কানে আগুনের ছেঁকা, লেগে গিয়েছিল। একজন জোয়ান হাতের রাইফেল নাড়াচাড়া করছিলেন। অতর্কিতে একটি গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল। জোয়ানটি ছিলেন নবিশ। একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। তা তো ঘটেনি। সেই মুহূর্তে ব্যাপারটি সামরিক ও বেসামরিক জটলার মধ্যে কৌতুকের সঞ্চার করেছিল। আমরা সবাই প্রাণখোলা হেসেছিলাম। আবাল্যের কুসংস্কারবশত আমি হঠাৎ বলে উঠেছিলাম : আজ আমাদের নিশ্চয় কোনো বিপদ আছে। এই বেফাঁস ফায়ারিংটি তারই পূর্বাভাস ।

হাওলা রোড থেকে সবাই ট্রান্সমিটার ভবনে ফিরে এসেছিলাম। সেই প্রভাতী অধিবেশনের জন্যে মেজর জিয়াউর রহমান আর একটি ঘোষণা লিখে নিয়ে এসেছিলেন। পরে তিনি অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

ঘোষণার পাণ্ডুলিপিটি আমাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। সেই মূল কপির ব্লক পরে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে মুদ্রিত হয়েছিল। সেই খসড়ায় মেজর জিয়াউর রহমান ভুলক্রমে ৩০ তারিখের স্থলে ৩১ মার্চ লিখেছিলেন।

৩০ মার্চ প্রভাতী অধিবেশনেই অনুষ্ঠানের সূচনায় ও সমাপ্তিতে একটি গানের রেকর্ড বাজানো হয়েছিল। ঢাকা রেকর্ডের 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটির এপিঠ ও ওপিঠ প্রস্তাবটি ছিল শারফুজ্জামানের। সূচক সুর হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটির প্রচার চালু ছিল। রেকর্ডের প্রথম পিঠ। সমাপ্তিতে নভেম্বর ১৯৭১-এর কোনো এক সময়ে গানটির দ্বিতীয় পিঠ বাজানোর বদলে জাতীয় সঙ্গীত প্রচার প্রবর্তিত হয়েছিল ।

৩০ মার্চের প্রভাতী অধিবেশন থেকেই সমাপ্তি ঘোষণায় এই কথাটি চালু

করেছিলাম: ‘আল্লা রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আমি তখনই কোনো জাতিকে সাহায্য করি, যখন সে জাতি নিজেকে নিজে সাহায্য করে।' কথাটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সমাপ্তি ঘোষণা হিসেবে শেষ দিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

৩০ মার্চ দুপুরের অধিবেশন শেষ হবার পর। আমরা ট্রান্সমিটার ভবন ও পাশের রিসিভিং সেন্টার ভবনে অবস্থানরত। আমি, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ্-আল- ফারুক, রেজাউল করিম চৌধুরী ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ ট্রান্সমিটার ভবনে । এবং সৈয়দ আবদুশ শাকের, মুস্তফা আনোয়ার, রাশেদুল হোসেন, শারফুজ্জামান ও আবদুশ শুকুর ছিলেন রিসিভিং সেন্টার ভবনে। আমি সান্ধ্য অধিবেশনের অনুষ্ঠানসম্ভার গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। অন্যরাও বিক্ষিপ্ত আলোচনারত। হঠাৎ দূর থেকে বিমানের শব্দ শোনা গিয়েছিল। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ছুটে বাইরে গিয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন সুদূর শূন্যপথে দুটি চকচকে বিমান। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, ও-দুটি বোমারু এবং টার্গেট হতে যাচ্ছি আমরাই। আগের দিন আমরা একটি হেলিকপ্টারকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বারকয়েক চক্কর দিতে দেখেছিলাম ।

: বেলাল ভাই, আমার মন বলছে, এখনই এখানে বোমাবর্ষণ শুরু হবে। সেই মুহূর্তে সেখানে এসেছিলেন সুবেদার সাবেত আলী। দ্রুত হাতে ঠেলেঠুলে তিনি আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন ভেতরের দিকের কক্ষটিতে। আমরা যে-কক্ষে ছিলাম, সেটি বাইরের দেয়ালসংলগ্ন। ট্রান্সমিটার ভবনের অফিসকক্ষ। একটি রুমাল ছিঁড়ে টুকরোগুলো দিয়ে ছোট ছোট ছিপির মতো তৈরি করেছিলেন সুবেদার সাবেত আলী। আমাদের প্রত্যেকের কানে গুঁজে নিতে বলেছিলেন। শিখিয়ে দিয়েছিলেন টেবিলের নিচে মেঝেতে শুয়ে থাকার কায়দা ।

: কোনো ভয় করবেন না, স্যার। আমি এখন ট্রেঞ্চে চলে যাই । খোদা হাফেজ। বিমানের শব্দ স্পষ্টতর হয়েছিল ততোক্ষণে, বাইরে থেকে একজন জোয়ান কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসেছিলেন ভেতরে। তাঁর হাতের রাইফেলটি এক ধারে ছিটকে পড়েছিল । আমাদের পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন তিনি ।

তখন বেলা ২.১০ মি:। প্রথম বোমাবর্ষণের বিকট শব্দটি আমাদের কানে এসেছিল। নিজের মধ্যে আমি আশ্চর্যজনক সাহস অনুভব করেছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম, জোয়ানটি মৃগী রোগীর মতো তড়পাচ্ছিলেন। রেজাউল করিম চৌধুরীর এক কানের রুমালের ছিপিটি খসে পড়েছিল। তিনি সেটা আবার

লাগাবার জন্যে কানের ফুটো-খুঁজে পাচ্ছিলেন না ।

আবদুল্লাহ্-আল-ফারুককে ডেকে কথা বলেছিলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ।

: ফারুক ভাই, আমার পকেটে দেড়শ' টাকা আছে। আমি যদি মরে যাই, টাকাটা আপনারা নিয়ে নেবেন ।

মাথার ওপরে একের পর এক বোমাবর্ষণের শব্দ। ছাদটাই ভেঙে পড়বে । সে অবস্থাতেই আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কথায় আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম : বেশ বেশ, সক্রেটিস সাহেব!

কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ ধমকে উঠেছিলেন : হাসবেন না-হাসবেন না । আপনার জন্যেই তো এতো ।

: আচ্ছা, একটা বিমানে ক'টা বোমা থাকে, কেউ কি বলতো পারো?— আমার এ প্রশ্নের জবাব কেউ দেননি I

মোট দশটি শব্দ শুনেছিলাম। হামলার স্থিতিকাল আনুমানিক দশ মিনিট। তারপর বোমার শব্দ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিমানের শব্দ অস্পষ্ট হয়েছিল।

উঠে দাঁড়াতেই শুনতে পেয়েছিলাম টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ। ছুটে গিয়ে রিসিভার ধরেছিলাম। মি. এ এস মণ্ডল ও মিসেস তরুণ মণ্ডল আমাদের কুশল জানতে চেয়েছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের ঘরের ছাদ থেকে তাঁরা বোমারু বিমান দু'টির গতিবিধি লক্ষ্য করেছিলেন ।

লাইন কাটতেই আমি টেলিফোন করেছিলাম ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর বাসায়। বেগম মুশতারী শফী ধরেছিলেন। দ্রুতলয়ে বলেছিলাম : আমরা ভালো আছি। চিন্তার কারণ নেই।—বলেই লাইন কেটে দিয়েছিলাম, অন্য প্রান্ত থেকে ভাবাবেগ প্রকাশের অবকাশ না দিয়ে । তারপরই কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম ।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সুবেদার সাবেত আলী। চোখে-মুখে কেমন থমথমে ভাব। না আনন্দ, না বিষাদ ।

: দেখবেন, স্যার ? গেটের বাইরে রাস্তায় একটা কুত্তা মারা গেছে । এটা হলো বারো আউলিয়ার জায়গা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এখানে বোমা ফাটে নাই। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করলাম। হাতে সব তো পাখি-মারা বন্দুক । নিশান

লাগাতে পারলাম না ।

ভবনের গাড়ি-বারান্দার ছাদের সামনের দিকে ছিল একটি খুঁটি, পাতাকা ওড়াবার জন্যে। বোমার আঘাতে সেটা ধ্বসে পড়েছিল। অফিসকক্ষের জানালাপথে ভেতরে নিক্ষিপ্ত হয়ে এসেছিল বুলেট-খণ্ড।

সুবেদার সাবেত আলীর ক্ষেদোক্তি শুনতে শুনতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ট্রান্সমিটার ভবন এলাকার বাইরে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিলাম সবাই এদিক-সেদিক। পেছন দিককার তারের ঘেরা ডিঙিয়ে ছিটকে পড়েছিলাম আমরা তিনজন । আমি, আবদুল্লাহ্- আল ফারুক ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ । গ্রাম চান্দগাঁও-এর ধানজমির আলপথ বেয়ে সেই নিরুদ্দিষ্ট ছুটে চলা। সহসা কানে এসেছিল : ঐ রে, একটা বিহারি পালাচ্ছে। ধর ধর!

ভীত-চকিত দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কাছে ছুটে এসেছিলেন তিন-চারজন যুবক। ওদের লক্ষ্য কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ। তিনি আতঙ্কিত— আমার গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। লালচে গোঁফ এবং তেলহীন উস্কোখুসকো চুল। গত কয়েকদিনের অনিয়ম ও অনিদ্রা। ধূসর গাত্রবর্ণ। কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদকে অচেনা যুবকরা ভেবেছিলেন বিহারি বলে। মারমুখো যুবকদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম আকস্মিকভাবে । আমার নাম-পরিচয় শুনে ওঁরা শান্ত হয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাক- ভারত যুদ্ধের সময় আমি বেতারে প্রতিদিন পুঁথির ছন্দে যুদ্ধের খবর পাঠ করতাম। অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। সেই সূত্রে এ অঞ্চলের শ্রোতাদের কাছে নামে দারুণ পরিচিত ছিলাম।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল। বেতার কেন্দ্রে তখন কর্মচাঞ্চল্য। সজীব স্টুডিওতে শিল্পীদের আনাগোনাই শুধু নয়, অফিস সময়ের পরেও অফিসকক্ষগুলো জমজমাট । সংবাদ বুলেটিন শুনেই শ্রোতারা তৃপ্ত ছিলেন না । টেলিফোনে নতুন খবর জানবার উৎসাহ সকলের। আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ- উজ-জামানকে টেলিফোনে কেউ বলেছিলেন : এখন আমরা যুদ্ধের খবরের জন্যে সারাদিন রেডিও চালিয়ে রাখি। আপনারা লারে লাপ্পা গান না বাজিয়ে উদ্দীপনামূলক গান প্রচার করুন।

আশরাফ-উজ-জামান বৈঠক করেছিলেন স্থানীয় লেখক-কথক-গীতিকারদের সঙ্গে। বলেছিলেন : এখন কোনো ফিক্সড পয়েন্ট নেই। আপনারা নতুন নতুন প্রোগ্রাম করুন । চট্টগ্রাম অঞ্চলের শ্রোতারা যেমন পছন্দ করেন, সে রকম

প্রোগ্রাম ।

তিনি লিখেছিলেন একটি কীর্তন-প্যারোডি। আমি লিখেছিলাম একটি জারিগান। সাদেক নবি এবং আবুল কাসেমের কণ্ঠে সুন্দর পরিবেশিত হয়েছিল।

হাটবাজারে এক সিকি দামে বিক্রি হতো 'কবিতা' ফোল্ডার । গ্রামীণ কোনো ঘটনা নিয়ে চারণকবির লেখা। কবি স্বয়ং গেয়ে গেয়ে ফেরি করতেন অঙ্গভঙ্গি সহকারে । ছেলেবেলায় সেই কবিতাপাঠ অনুকরণের চেষ্টা করতাম আমরা। সেইটুকু ছিল বিদ্যা। নতুন নতুন প্রোগ্রাম করার তাগিদে একদিন যুদ্ধের কিছু খবর সেই কবিতার ছন্দে লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম আশরাফ-উজ-জামানের কাছে।

: স্যার, প্রতিদিন যুদ্ধের খবর এই ছন্দে আমি লিখে দিতে পারি। তেতালা সুরেলা পাঠ প্রচার করা হলে শ্রোতারা পছন্দ করবেন। সুরটা এ অঞ্চলে খুবই পপুলার ।

: দেখি, কিভাবে পড়া হয়, একটু শোনাও তো!

সসঙ্কোচে সুর করেই পড়ে শুনিয়েছিলাম । আশরাফ-উজ-জামান আদেশ করেছিলেন : তুমিই রোজ রোজ লিখবে এবং প্রচার করবে।

: কিন্তু আমার যে অডিশন হয়নি, স্যার!

: এই তো অডিশন হয়ে গেলো। আজ থেকেই রোজ রোজ এই অনুষ্ঠান প্রচার করবে তুমি ।

রাত ৮টায় ছিল সংবাদ বুলেটিন। পনেরো মিনিট স্থিতিকালের। রেডিও সেট-এর কাছে বসে তাৎক্ষণিক রচনা শুরু করতে হতো। অনুষ্ঠান সংগঠক নূরন্নবী খান লিখে নিতেন সংবাদ সার-সংক্ষেপ। সেটার সঙ্গে মিলিয়ে পাণ্ডুলিপি পূর্ণাঙ্গ করা হতো । নূরন্নবী খান দ্রুত-পাঠ ভেটিং-এর দায়িত্ব পালন করতেন। আগেই রিডার্স রিপোর্ট লিখে রাখতেন অনুষ্ঠান প্রযোজক হাফিজ আহমদ। আমাকে ছুটে যেতে হতো স্টুডিওতে। ৮.৪০ মি:-এ ছন্দোবদ্ধ সংবাদ ইথারে প্রক্ষিপ্ত হতো ।

আহা আল্লানবি মনে ভাবি করহ মদদ

এখন খবর বলি, বেলাল মোহাম্মদ ॥

শ্রোতাদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, জাতীয় সংবাদ বুলেটিন শুনে কাজ নেই, 'বেলাল মোহাম্মদের পুঁথিপাঠ' শুনলেই সব খবর জানা যাবে। অগণিত চিঠি এসেছিল অনুষ্ঠানটিকে সাধুবাদ দিয়ে। লোকমান হোসেন খান শেরওয়ানী লিখেছিলেন : 'এই পুঁথিপাঠককে প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হোক'। করাচি থেকে প্রকাশিত 'এলান'-এ আমার ছবি ছাপা হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ জিল্লুর রহমান প্রবন্ধ লিখেছিলেন, War with Radio। সেই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার ছবি পত্র স্থ হয়েছিল Pakistan Observer-এ।

তাসখন্দ ঘোষণার পরও ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বিচিত্র খবরাখবর। পাকভারত যুদ্ধ সম্পর্কিত দেশবিদেশের অভিমত। এসবকে উপজীব্য করে পুঁথিপাঠ অনুষ্ঠানটির প্রচার চলেছিল বেশ অনেকদিন। শেষের দিকে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হিসেবে । তখন আমার কাছে অনুষ্ঠানটি একঘেয়ে মনে হয়েছিল। তবু জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল ।

আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ-উজ-জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বইঘর- এর সৈয়দ মোহাম্মদ শফী । তিনি যুদ্ধকালীন পুঁথিপাঠের পাণ্ডুলিপিগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আমি অসম্মতি জানিয়েছিলাম । কারণ ওতে কোনো কাহিনী ছিল না, ছিল দৈনন্দিন খবর। তাৎক্ষণিক প্রচারের সময়েই যার গুরুত্ব, পরে ওতে নিউজ ভ্যাল্যু অনুপস্থিত । আশরাফ-উজ-জামানের উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে কিছু টাকা পাইয়ে দেয়া। চুক্তিবদ্ধ লেখক-শিল্পী ছিলাম বলে বেতার থেকে মাসিক পারিতোষিকের বাইরে বাড়তি টাকাকড়ি দেয়ার উপায় ছিল না ।

সৈয়দ মোহাম্মদ শফী মাসাধিককাল দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলেন। 'পাক-ভারত যুদ্ধ-কাহিনী' নামে প্রকাশ করেছিলেন গ্রন্থটি। 'হট কেক'-এর মতো বিক্রি হয়েছিল । আমাকে দেড়শ' টাকা 'সেলামি' দিয়েছিলেন প্রকাশক ।

১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর আমি আদিষ্ট হয়েছিলাম পুঁথিপাঠ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টের মাস পহেলা বেতার ভাষণের কভারেজ দেয়ার জন্যে। আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম । তা- ই নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়েছিল সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক ইব্রাহীম আখন্দের সঙ্গে । তিনি সরল মনে প্রস্তাব দিয়েছিলেন :

পুঁথিপাঠ খুব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান । প্রেসিডেন্টের মাস পহেলা ভাষণের বক্তব্যগুলো ওতে প্রচার করলে খুব ভালো হবে। বুঝতে পেরেছেন ?

বলেছিলাম : তিনি তো অগণতান্ত্রিক সামরিক প্রেসিডেন্ট। তাঁর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। নিজের কণ্ঠে তাঁর বক্তব্য প্রচার করার মানসিক প্রস্তুতি আমার নেই ।

: বলেন কি! আপনি প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের ওপর অহরহ লিখছেন না ? জীবন্তিকা লিখছেন, ঘোষণালিপি লিখছেন। রোজই তো লিখছেন ।

: ওতে আমার নাম থাকে না। ওসব পেশাদারি লেখা ।

ইব্রাহীম আখন্দ বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন : কিন্তু যুদ্ধের সময় তো আপনি প্রেসিডেন্টর নাম ও বাণী স্বকণ্ঠে প্রচার করেছেন উৎসাহের সঙ্গে ।

: সেটা ছিল জাতীয় জরুরি অবস্থা। তখন আমরা প্রেসিডেন্টকে ব্যক্তি-পরিচয়ে গ্রাহ্য করিনি। কিছু মনে করবেন না, স্যার, ব্যক্তি-পরিচয়ে আমি বরং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকেই মহত্তর বিবেচনা করি। অথচ ঐ সময়ের যুদ্ধের সংবাদ পড়তে গিয়ে তাঁকেই কতো ব্যঙ্গ করেছিলাম ।

বলেছিলাম : পুঁথিপাঠ অনুষ্ঠানটির প্রচার বন্ধ করার প্রস্তাব আগেই দিয়েছিলাম আমি। আজ জানিয়ে যাচ্ছি, আর আমি অনুষ্ঠানটি করবো না। কোনোদিনও না। এর জন্যে আমার সঙ্গে আপনাদের চুক্তিপত্র বাতিলও যদি হয়, তবুও।

চুক্তিপত্র বাতিল হয়নি। পুঁথিপাঠ অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হয়েছিল । তবে চট্টগ্রাম বেতারের শ্রোতাদের কাছে পুঁথিপাঠকের নামটি ব্যাপক পরিচিত পেয়েছিল : 'এখন খবর বলি বেলাল মোহাম্মদ ।'

মোহরা গ্রামের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা তিনজন। মৌলবি নূর আহমদ কাদেরীর বাড়ি। আমাদের দেখেই বাড়ির মালিক হাতের কাছে-রাখা ট্রানজিস্টারের সুইচ অফ করেছিলেন। অর্থাৎ, বুঝতে পেরেছিলেন ব্রডকাস্ট বন্ধ। সেটি ছিল অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের আত্মীয়-বাড়ি। তিনিও ছিলেন সেখানে। দৈনিক আজাদীর স্বত্বাধিকারী এম এ মালেকও ছিলেন। বাড়িটি সদর রাস্তা সংলগ্ন।

রাতটি ছিল নিকষ অন্ধকার। একটু রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ কানে

এসেছিল বন্দুকের গুলির শব্দ। একটি আর্তকণ্ঠ শোনা গিয়েছিল : পাঞ্জাবি এসেছে, পাঞ্জাবি এসেছে!— এমন ভয় পেয়েছিল, ছুটে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো একটি গাড়ির দরজা খুলে সিটের ওপর বুক পেতে শুয়ে পড়েছিলাম। বুকের কম্পন দেখা দিয়েছিল বেসামাল। দুপুরবেলা যে জোয়ানটিকে বোমাবর্ষণের সময় তড়পাতে দেখেছিলাম, তার চেয়ে শোচনীয় হয়েছিল নিজের অবস্থা ।

৩১ মার্চ সকালে আমরা সম্মিলিত হয়েছিলাম ট্রান্সমিটার ভবনে। বৈদ্যুতিক চ্যানেলগুলো সব ছিন্নভিন্ন। বিশেষ করে 'মাস্ট'-এর চারধারে ওয়্যারিং সম্পূর্ণ বিকল। হারুন-অর-রশীদ খানসহ আমি নিকটবর্তী ওয়াপদা সাব-স্টেশনে গিয়েছিলাম। চেষ্টা চালানো হয়েছিল আপ্রাণ । কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়নি । মেরামতের কাজ বেশ কালক্ষয়ী। এদিকে হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম শহরে এসে গিয়েছিল। কালুরঘাট এলাকার পতনও প্রত্যাসন্ন ।

১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার ডিসমেন্টাল করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হারুন-অর-রশীদ খান । ঘরটি তালা দেয়া ছিল । ট্রান্সমিটার বের করার জন্যে দরজার চৌকাঠ এবং সংলগ্ন দেয়াল ভাঙতে হয়েছিল । কাজটি ছিল দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ। পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান ছাড়া এ ছিল এক দু:সাহসিক কাজ। বেতারের লোক ছিলেন মাত্র দু'জন। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমিনুর রহমান ও মিক্যানিক আবদুশ শুকুর। আর ছিলেন মোহরা গ্রামের আবু তাহের চৌধুরী। তাঁরা দ্রুতহাতে তার কেটে নিয়ে ট্রান্সমিটারটি ডিসমেন্টাল করেছিলেন। হাতের কাছে পাওয়া সুতো জড়িয়ে দিয়েছিলেন কর্তিত তারের অগ্রভাগে । পরে ইনস্টল করার সময় যেন সংযোগ স্থানটি চিনে নেয়া যায় ।

ব্যাঙ্কার সৈয়দুর রহমান ট্রাক নিয়ে কাপ্তাই থেকে এসেছিলেন। সেই ট্রাকভর্তি ছিল ভাত-তরকারি— সৈনিক ও বেতারকর্মীদের জন্যে। ট্রাকে তুলে দেয়া হয়েছিল ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি। মোহরা সংগ্রাম পরিষদ অফিসে সেকান্দার হায়াত খানের সঙ্গে অবস্থানরত ছিলাম আমরা ।

১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ট্রাকের ওপর ইনস্টল করে চালু করতে হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ দরকার । মোবাইল অবস্থায় তা কি করে সম্ভব ? তাহলে আরেকটা ট্রাকের ওপর একটা জেনারেটর বয়ে বেড়ানো সম্ভব কি না। হ্যাঁ, কক্সবাজার ওয়াপদা অফিস থেকে একটা জেনারেটর নিয়ে আসা যেতে পারে। ট্রাকসহ। অনুরূপভাবে ট্রান্সমিটার চালু করার প্রাথমিক স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল পটিয়া। সেই মর্মে ট্রান্সমিটারবাহী ট্রাকটি যাত্রা করেছিল পটিয়ার

উদ্দেশ্যে। আমরাও যাত্রা করেছিলাম একটি মাইক্রোবাসে। আমরা ৯ জন— সৈয়দ আবদুশ শাকের, মুস্তফা আনোয়ার, শারফুজ্জামান, আমিনুর রহমান, রাশেদুল হোসেন, আবদুশ শুকুর, আবদুল্লাহ্-আল-ফারুক, কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ ও আমি। আমাদের দুজন সহকর্মী আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও রেজাউল করিম চৌধুরী বোমাবর্ষণের পর বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ।

মাইক্রোবাসটি লিভার ব্রাদার্সের। ড্রাইভার এনামুল হক। পটিয়ায় আমাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন সেকান্দার হায়াত খান ।

পটিয়া মাদ্রাসার একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল ট্রান্সমিটারটি। আর আমরা মাইক্রোবাস নিয়েই শরণাপন্ন হয়েছিলাম অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীর। তখন রাত । সে রাতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল থানা ভবনে । এখানেই ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের ছাউনি ছিল। আজ পুলিশরাও কেউ ছিলেন না। তাঁদের পরিত্যক্ত বিছানাগুলো আমরা ব্যবহার করেছিলাম। আমরা সবাই ছিলাম এক কাপড়ে।

১ এপ্রিল জল্পনা-কল্পনার দিন। বেতারের প্রবীণ প্রকৌশলী মোসলেম খানকে আনিয়ে নেয়া হয়েছিল। বোয়ালখালির ওঁসখাইনের বাসিন্দা তিনি। এলাকাটি পটিয়া- সংলগ্ন। পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল, ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি পটিয়ায় ইনস্টল করার জন্যে । প্রস্তাবটি নাকচ করেছিলেন তিনি। কোনো৷, কি লাভ হবে এখানে এটা চালু করে ? ক'জনে শুনবে ? পটিয়া থানাটাই তো কভার করবে না। বরং বিপদের ঝুঁকিটি ঠিকই থাকবে। একবার 'ওরা' কালুরঘাটে বোমা ফেলেছে। পরে পটিয়া হবে ওদের বোমারু বিমানের টার্গেট। তা ছাড়া সামরিক বাহিনী উর্দুভাষী বাসিন্দাদের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম শহরে নিজেদের সংগঠিত করছে, জানা গিয়েছিল । পটিয়া পর্যন্ত পৌছে যেতে কতোদিন আর লাগবে। এ অবস্থায়, মোসলেম খান উপদেশ দিয়েছিলেন, আমরা যেন ভারতের কোনো সীমান্ত এলাকায় চলে যাই। ভারতীয় বেতার শুনে অনুমিত হচ্ছিল, ওরা আমাদের সংগ্রামের সমর্থক । কাজেই একজনও যদি ভারতীয় শ্রোতা পাওয়া যায়, ওতেই কাজ হবে। ওদের বেতার থেকে তা ভালোভাবে ফ্ল্যাশ করা হবে। ক্ষীণশক্তির ট্রান্সমিটারটি ভারতীয় সীমান্তে ইনস্টল করা হলে নিরুপদ্রবে অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে। কেননা-মোসলেম খানের মুখের ভাষায় : ওখানেও ওদের যন্ত্রে ধরা পড়বে,

ঠিক কোনো জায়গা থেকে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু ওরা বিমান হামলা করতে

পারবে না । কারণ বর্ডার এলাকায় বোমা ফেলার জন্যে ডাইভ দিতে গেলে বিমানের 'ল্যাজ' ইন্ডিয়ার ওপর দিয়ে ঘুরে যাবে। তখন তো রক্ষা নেই ।

পটিয়ায় পরবর্তী রাতটি কেটেছিল ছাত্রনেতা শামসুল আলমের বাসায়। ২ এপ্রিল এদিক-সেদিক ঘুরে আমি ও আমিনুর রহমান রামগড়ে যাবার সহজ পথের সন্ধান নিয়েছিলাম । অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীও খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

পটিয়া মাদ্রাসায় রাখা ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তাড়াহুড়োর মধ্যে কিছু খুচরো অংশ আনা হয়নি। কালুরঘাটে পাঠানো হয়েছিল রাশেদুল হোসেন ও শারফুজ্জামানকে। তাঁরা খুচরো অংশ এবং এটিনা, ক্রিস্টাল নিয়ে ফিরেছিলেন দিনে দিনে। ঐ সময়ে দেখেছিলেন, কালুরঘাটে পাওয়ার সাপ্লাই এসে গিয়েছিল।

আবদুশ শুকুরকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলেছিলাম। তিনি আগ্রহী ছিলেন সঙ্গে থাকতে। চান্দগাঁও গ্রামের বাড়িতে তাঁর পরিবার-পরিজন ছিলেন। তিনি বিদায় নিয়েছিলেন— বলেছিলাম : আপনাকে আমরা আমাদেরই একজন মনে করবো সব সময়। ২৬ মার্চ থেকে আপনার যে সহযোগিতা পাওয়া গেছে, তার তো তুলনা নেই ।

দলের কেবলমাত্র আমি ও মুস্তফা আনোয়ার বিবাহিত। মুস্তফা আনোয়ারের স্ত্রী চট্টগ্রামে ছিলেন না । চট্টগ্রামের বাসায় মুস্তফা আনোয়ার একা থাকতেন।

আমার আগ্রাবাদের বাসার চাবিগুচ্ছ শামসুল আলমের হাতে গছিয়ে দিয়েছিলাম।

৩ এপ্রিল সকালবেলা। সেই ছিল আমাদের নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। যদিও আমাদের ছিল একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনা । সেই মাইক্রোবাস এবং ড্রাইভার এনামুল হক। আর সার্বক্ষণিক সহায়তাদানকারী সেকান্দার হায়াত খান এবং আমরা আটজন। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী যাত্রালগ্নে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন দেড়শ' টাকা । তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন দু'একদিনের মধ্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করে ট্রান্সমিটারটি রামগড়ে পাঠাবার ।

একটু ফুলতলি হয়ে গেলে ভালো হয়। ওখানে বাঙালি সৈনিকদের ছাউনি। কালুরঘাটে মুখচেনা হয়েছিলেন অনেকেই। শেষ দেখা করে যাওয়া দরকার। পথে কাপ্তাই রোডের মাথায় পেট্রোলের পাম্প। কেউ নেই, পাহারাহীন পড়ে

ছিল দুর্মূল্যের তৈলসম্পদ। হরিলুটের মতোই মাইক্রোবাসের ট্যাঙ্ক ভরে নেয়া হয়েছিল । ব্রেক অয়েলের অনেকগুলো বোতলও লুটে নিয়েছিলাম আমরা। পরে রামগড়ে গিয়ে সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলাম ।

পাম্পের ওখানেই দেখা হয়েছিল এম এ হান্নানের সঙ্গে। তিনি রামগড় থানার ও- সি আবদুল মান্নানের কাছে একটা চিরকুট লিখে দিয়েছিলেন। বক্তব্য ছিল, এঁরা আমাদের লোক । যেন সবরকমের সহযোগিতা দেয়া হয়। এম এ হান্নান পকেট হাতড়ে কুড়ি টাকা বের করে দিয়েছিলেন।

ফুলতলিতে বাঙালি জোয়ানরা আমাদের চা খেতে দিয়েছিলেন। তখনই এসেছিল একটি জিপ। একজন ক্যাপ্টেন, মুখচেনা। জিপ থেকে নেমে এসেছিলেন আমাদের আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও রেজাউল করিম চৌধুরী। মাথায় হেলমেট, হাতে রাইফেল এবং চোখে-মুখে উল্লাস। ৩০ মার্চের পর থেকে ছিলেন বিচ্ছিন্ন। এখন এই শেষ মুহূর্তে এভাবে দেখা না হলে দশজনের দল থেকে ওঁরা বিচ্ছিন্নই থাকতেন ।

মাইক্রোবাসে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিলাম আমি ও সেকান্দর হায়াত খান । কাপ্তাই রোড হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছিল গাড়ি। রাউজান থানার কদলপুর গ্রাম হয়ে মদনমহাল (মদনহাট?)। কালাচানের পুল। এখানে একটি শুকনো খাল- ঠিক শুকনো নয়, পারাপারের জন্যে ছিল একটি বাঁধ। আমাদের গাড়ি তার ওপর দিয়ে পার হয়ে যাওয়ামাত্রই 'গোদা' ভেঙ্গে গিয়েছিল। পানিতে ভরে গিয়েছিল শুকনো অংশটুকু । এখন আর গাড়ি পারাপারের উপায় ছিল না।

নাজিরহাট থানায় একটি বাজারে আমাদের দুপুরের খাওয়া হয়েছিল । মোটা চালের ভাত আর গরুর গোশত। খুব উল্লাস করে আমরা খেয়েছিলাম ।

সারা পথে এখানে-ওখানে মানুষের দঙ্গল। রাস্তায় ধারে ধারে ছোট ছেলেরা খিরা বিক্রি করছিল। আর ছিল খাবারের পানি এবং হাট-বাজারের প্রবেশমুখে বাঁশের ব্যারিকেড। জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যারিকেড তুলে যেতে দেয়া হয়। ফটিকছড়িতে এমনি এক ব্যারিকেডের সামনে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ হঠাৎ হেঁকে উঠেছিলেন : এই ছাত্র!

ছাত্রটির নাম তাঁর জানা ছিল না। ছাত্রটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিকেড তুলে নিয়ে আমাদের যেতে দিয়েছিল। আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম। স্লোগান দিয়েছিলাম

: জয় বাংলা ।

ফটিকছড়ির বিবির হাট। হেঁয়াখো বাজার। এখানে আমার একজন খালু ডাক্তারি করতেন । আগে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম । এখন দেখা করে যাবার আগ্রহ হয়েছিল । না, চেম্বারে যাইনি। চা খাবার আতিথ্য নিয়ে সময় ক্ষয় করিনি। হাতের ওপরে রেখে দু'কলম চিঠি লিখেছিলাম আমানটোলার মেজ মিয়া সুফী মোহাম্মদ নূরকে। আমার স্ত্রীপুত্র তখন আমানটোলা খানকা শরীফে। মিরেরশরাই-এর মিঠাছাড়া গ্রামে। চিঠিতে ওঁরা জানতে পারবেন আমি ভারত-সীমান্তে অবস্থানরত।

রামগড় থানার দূরত্ব আর বেশি নয় । অনিশ্চয়তার পথে অগ্রগামী আমরা দশজন । আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দশজন প্রতিষ্ঠাতা-কর্মী ।

দশজন ? শুধু দশজন কেন ? আর কি কেউ ছিলেন না প্রতিষ্ঠাকালে ? প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের কোনো এক সময়ে। এ বি এম গোলাম মোস্তফা তখন তথ্য সচিব। তিনি চট্টগ্রাম বেতার ভবনের ৪ নং স্টুডিওতে বেতারের কর্মচারীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন । বক্তৃতার শুরুতে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন সংগ্রামী বেতার-কর্মীদের উদ্দেশ্যে— যাঁরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মীর্জা নাসিরউদ্দীন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন : স্যার, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের অনেকেরই বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এখন মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়। আমাদের অন্যান্য সকলের নাম বলা হয় না ।

এ বি এম গোলাম মোস্তফা আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন : এর উত্তরে আপনি কিছু বলুন ।

বিনয়ের সাথে বলেছিলাম, ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময়। এ সময়ের মধ্যে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে অনেকেই কাজ করেছিলেন। সবাই কিন্তু স্বেচ্ছায় আসেননি। অবস্থার চাপে বা রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাবে বাধ্য হয়েই কেউ কেউ এসেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিলেন। পরে তাঁরা ন'মাসব্যাপী দখলদার সামরিক বাহিনীর অধিকৃত বেতারে কাজ করেছিলেন। কেবলমাত্র যাঁরা নিজের ইচ্ছায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কর্মরত হয়েছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের নামই প্রতিষ্ঠাতা-

কর্মী হিসেবে গ্রাহ্য ।

এ বি এম গোলাম মোস্তফা তখন মীর্জা নাসিরউদ্দীনকে বলেছিলেন : আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন তো!

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যা চট্টগ্রামের ‘দৈনিক স্বাধীনতা'য় আমার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কিত। সাক্ষাৎকারটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

(১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় বেতার তরঙ্গে সর্বপ্রথম যে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা প্রচারিত হয়, তার উদ্যোক্তা-পরিচালক জনাব বেলাল মোহাম্মদ । তাঁরই আহ্বানে ২৭ মার্চ পটিয়ার ছাউনিতে অবস্থানরত মেজর জিয়াউর রহমান (বর্তমানে কর্নেল) কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে প্রতিষ্ঠিত উক্ত বেতার কেন্দ্রে আগমন করেন এবং ভাষণ প্রচার করেন। ২০ মার্চ বেতার কেন্দ্রের ওপর বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়, সেটাই বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক দস্যুদের প্রথম বিমান হামলা। এর পর জনাব বেলাল মোহাম্মদ তাঁর অপর ন’জন সহযোগী বেতার কর্মী সর্বজনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ্-আল ফারুক, রাশেদুল হোসেন, শারফুজ্জামান, আমিনুর রহমান, কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আবদুশ শাকের, মুস্তফা আনোয়ার ও রেজাউল করিম চৌধুরী প্রমুখকে নিয়ে ট্রান্সমিটার ভবনে রক্ষিত একটি এক-কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটারসহ মুক্ত অঞ্চলে চলে যান এবং ৩ এপ্রিল থেকে নব উদ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেন। পরবর্তীকালে ২৫ মে '৭১ এই দশজন বিপ্লবী কর্মী মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত পঞ্চাশ-কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটারে নবনিয়োজিত অন্যান্য বেতার-কর্মীদের সঙ্গে একযোগে দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত 'আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক' চালিয়ে যান ।

বর্তমানে জনাব বেলাল মোহাম্মদ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক পদে নিযুক্ত আছেন। আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হই।)

প্রশ্ন : আচ্ছা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইতোমধ্যে পত্র-পত্রিকায় নানারকমের নেপথ্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, দেখতে পাই । এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : দেখুন, যে সময়ে এ কেন্দ্রটির উদ্বোধন করা হয়, তখন আমরা কেউই এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না । যার ফলে আমার অন্যতম সহকর্মী আবুল কাসেম সন্দ্বীপ প্রথম দিনের অধিবেশন-শেষে বলেছিলেন : বেলাল ভাই, আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা সারা জীবন রাজনীতি করে যে অপরাধ করেছেন, আমরা আজ একটিমাত্র ব্রডকাস্ট করে সেই একই অপরাধ করে বসলাম। মাফ করবেন, 'অপরাধ' মানে পাকিস্তানি দৃষ্টিতে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা" ।

প্রশ্ন : তা বুঝতে পেরেছি। আপনি বলুন।

উত্তর : সে যা-ই হোক, আজ যখন দেখা যাচ্ছে, দেশের মুক্তিযুদ্ধে বেতারের ভূমিকা অসম্ভবরকম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে, তখন এ ব্যাপারে কিছুটা কৃতিত্ব নেবার প্রবণতা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে আমার যা বক্তব্য সেটা হচ্ছে, 'স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী) বেতার কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব কারুরই নেই। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। আমার অন্যান্য সহকর্মীদের কথাই বলি, তাঁরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্বেই এক দু'দিনই আগে-পরে কালুরঘাটে এসে যোগদান করেছেন। কাজেই ত্যাগ ও প্রস্তুতির প্রশ্নে কেউ করো চেয়ে হেয় নন। সবাই এক-একজন কর্তব্যসচেতন নাগরিক ।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ২৬ মার্চ দ্বিপ্রহরে জনাব এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে যে ভাষণ প্রচার করেন, সেটাই কি 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র প্রথম অধিবেশন নয়?

উত্তর : না। তা কেমন করে হবে ? কেন্দ্রের নামকরণই তো হলো সন্ধ্যায় আমাদের উদ্যোগে। বস্তুত জনাব হান্নানের মূল্যবান ভাষণটি আমি শুনিনি। কারণ সে সময়ে আমি বেতার কেন্দ্র চালু করার প্রস্তুতি হিসেবে স্টেশন রোডের রেস্ট হাউসে আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় (সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ) এবং আমার ক্ষুদে বেতারকর্মী টিম গড়ে তোলার কাজে জনাব মাহবুব হাসানের সহযোগিতায় ব্যস্ত ছিলাম। পরে জেনেছিলাম, হান্নান সাহেব আমাদের কয়েকজন প্রকৌশলীকে অনুরোধ করে ট্রান্সমিটারে নিয়ে গিয়ে তাঁর ভাষণ প্রচার করেছেন। তবে তখন নিয়মিত কেন্দ্র পরিচালনার বা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা রক্ষার কোনো পরিকল্পনা নেয়া হয়নি। যদি হতো, সে সময়কার প্রকৌশল বা অন্যান্য কর্মীদের সন্ধ্যায়

আমি আমাদের দলের সাথে যোগ দিতে দেখতাম। তবে হ্যাঁ, জনাব হান্নান আমাদের অধিবেশন চলাকালেও স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মূল্যবান ভাষণ প্রচার করেছিলেন। তবে এবারে আমার অনুরোধে নিজের নাম প্রচার ছাড়া ।

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় আপনি যাঁদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন ।

উত্তর : ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। প্রথমত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি শহীদ মাহমুদ হোসেনকে। তিনি ২৭ মার্চ সকালে আমার সঙ্গে মিলিত হন এবং আমরা একসঙ্গে গিয়ে পটিয়ায় মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, ট্রান্সমিটার ভবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করি এবং আমি তাঁকে বেতারে কিছু বলতে আহ্বান করি। উল্লেখ্য, ২৭ মার্চ সকালবেলা স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ ছিল। সেদিনই সন্ধ্যায় মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা প্রচার করা হয়। আমার বন্ধু মাহমুদ হোসেন ও ফারুক চৌধুরী সে রাতেই অন্য এক মিশনে যাত্রাকালে হারভাঙ্গা নামক স্থানে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আলোচ্য পাঁচ দিন আমাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় ছিলেন মিকানিক জনাব আবদুশ শুকুর। আমাদের ক্ষুদ্র দলটির ট্রান্সমিটার ভবনে পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থানকালীন দৈনন্দিন যাবতীয় ব্যবহার্য সরবরাহ এবং আনুষঙ্গিক যত্ন প্রদর্শন করেছিলেন দুই ভাই জনাব সেকান্দার খান ও জনাব হারুন খান। জনাব সেকান্দার খান ৩ এপ্রিল মুক্ত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে আমাদের দুর্গম পথের সঙ্গী হয়েছিলেন । মাইক্রোবাস ড্রাইভার জনাব এনামের সেদিনের দু:সাহসিক গাড়ি চালানোর কথা আমরা কোনোদিন ভুলবো না ।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এক-কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটারটি আপনারা কিভাবে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : সে এক দু:সাহসিক অভিযান। আমাদের দু'জন সহকর্মী জনাব রাশেদুল হোসেন ও জনাব আমিনুর রহমান সে দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী, মুক্তিবাহিনী এবং জনগণের সহায়তায় অনেক কষ্টে তাঁরা মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলেন ট্রান্সমিটারটি। তারপর অন্যতম সহকর্মী সৈয়দ আবদুশ শাকেরের তত্ত্বাবধানে গাইড বুক ছাড়াই তা ইনস্টল করা হয়েছিল।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শ্রোতারা কিন্তু এই কেন্দ্রের তিনটি পর্যায় অনুমান করতে পেরেছিলাম ।

উত্তর : ঠিকই অনুমান করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এ কেন্দ্রের অনুষ্ঠান আপনারা শুনতে পেয়েছিলেন। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এখান থেকেই। তারপর মুক্ত অঞ্চলে খুব কম শক্তির ট্রান্সমিটার থেকে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান শুনেছেন ২৫ মে '৭১ সকালবেলা পর্যন্ত। এরপর আমাদের সরকার এই কেন্দ্রের উচ্চশক্তির ট্রান্সমিটার চালু করতে সমর্থ হন। তখন থেকেই আমাদের দশজনের ক্ষুদ্র টিম নবাগত সহকর্মীদের নিয়োগে একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কর্মী টিমে উন্নীত হয় । এ প্রসঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত বক্তব্য প্রকাশ করতে চাই। সেটা হচ্ছে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা পর্যায়ের যেখানে সমাপ্তি, তখনই প্রকৃতপক্ষে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণের পরিবেশ। ৩০ মার্চের বিমান হামলার পর আমরা যে সংগঠিত সঙ্ঘবদ্ধ থেকে ট্রান্সমিটার ডিমেন্টাল করে মুক্ত অঞ্চলে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে পেরেছিলাম, সেটাই হচ্ছে স্বাধীন বাংলা বেতারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং ইতিহাস ।

প্রশ্ন : ঠিকই বলেছিলেন। আচ্ছা, আপনি ও আপনার অপর ন'জন সহকর্মীরা কি সবাই এখন বাংলাদেশ বেতারে নিযুক্ত আছেন?

উত্তর : হ্যাঁ। শুধু একজন (আবুল কাসেম সন্দ্বীপ) ছাড়া আর সবাই বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিযুক্ত আছি।

৩ এপ্রিল সন্ধ্যা হয়-হয় সময়ে আমরা রামগড় পৌছেছিলাম। সীমান্ত নদীর তীরে রামগড় থানা। অনেক আগে একবার এসেছিলাম দাপ্তরিক কাজে। ‘ক্ষেত খামারে' অনুষ্ঠানের প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করতে। থানার সামনে মাইক্রোবাস থেকে নেমেই এইচ টি ইমামের সম্মুখীন হয়েছিলাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক। রাঙ্গামাটি থেকে সরে এসেছিলেন আগেই। আমার সঙ্গে আগে কোনো সময় পরিচয় হয়েছিল। দেখেই নাম ধরে বলেছিলেন : এই যে, বেলাল, তোমরা এসে পড়েছ, ভালোই হলো ।

কাছে টেনে নিয়ে কানের কাছে মুখ রেখে বলেছিলেন : ইন্ডিয়ান অথরিটি একটা ট্রান্সমিটার দিয়েছেন গতকাল। চালাবার লোক নেই। এখনই দু'জন ব্রডকাস্টারকে নিয়ে নৌকায় ওঠো। একজন বাংলার, একজন ইংরেজির ।

: ইঞ্জিনিয়ার?

: না, লাগবে না। একজন শিখ অপারেটর আছেন ওখানে। এখন শুধু দু'জন ব্রডকাস্টার দরকার । দেরি করলে হবে না। নৌকা রেডি, উঠে এসো। আমিও যাচ্ছি।

স্রোতহীন প্রায় মজে-যাওয়া নদী। একটি নৌকোর দুই প্রান্তে দীর্ঘ রশি লাগানো। এপারে লোকরা উঠে বসলে ওপার থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওপার থেকে আবার টেনে এপারে আনা হয়। নদীর এপার-ওপার একটি তার টাঙানো। টেলিফোন লাইন । রামগড় ও সাবরুম থানার মধ্যে সদ্য সদ্য নির্মিত হয়েছিল।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ্-আল ফারুককে আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম । পকেটে যা টাকাকড়ি ছিল, সব সৈয়দ আবদুশ শাকেরকে দিয়ে বলেছিলাম : আমরা আবার ফিরে আসছি। পরে সব পরিকল্পনা করা হবে ।

এই আকস্মিক বিচ্ছিন্নতার জন্যে কেউ আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, যদিও এ ছিল সাময়িক ।

৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় হয়েছিল প্রথম পারাপার । রামগড় থেকে সাবরুম । সাথে ছিলেন এইচ টি ইমাম ছাড়াও অপর তিনজন । আতাউর রহমান কায়সার, মোশাররফ হোসেন ও মীর্জা আবুল মনসুর। তিনজনই পূর্ব পরিচিত। আওয়ামী লীগের তরুণ পার্লামেন্ট সদস্য। রামগড় থেকে তাকালে দেখা যেতো ওপারে ঘন বাঁশঝাড়। ওপার থেকে রামগড়ে নদীর তীরেই রামগড় থানা ভবন এবং অন্যান্য অট্টালিকা ।

বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে একটুখানি হেঁটেই সাবরুম থানা। এই পথটুকুতে দেখা গিয়েছিল বেশ কয়েকটি ট্রেন্স। বাইরে উঁচিয়ে বন্দুকের নল, মাটি ফুঁড়ে দৃশ্যমান হেলমেট ।

সাবরুম থানার চত্বরে আধো অন্ধকারে বসতে দেয়া হয়েছিল আমাদের তিনজনকে। আবদুল্লাহ্-আল ফারুক, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও আমি। পথ-প্রদর্শকরা থানার ভেতরে গিয়েছিলেন। সময় যেন ফুরাচ্ছিলো না। ১০ মিনিট, ২০ মিনিট, ৩০ মিনিট, এক ঘণ্টা। থানায় আমাদের নাম-ধাম লেখা হয়েছিল। আর অপেক্ষা করতে হয়েছিল ট্রান্সপোর্টের জন্যে। একটি জিপের সংস্থান

হয়েছিল। পেছনের সিটে আমরা তিনজন এবং সামনে ড্রাইভারের পাশে আতাউর রহমান কায়সার ও মীর্জা আবুল মনসুর ।

এই পথটিও কি অশেষ? এলাকাটা পাহাড়ি। অবিকল পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো। রাস্তা বেয়ে অনেক ওপরে উঠে যাওয়া। আবার ঢালুতে নেমে যাওয়া। আশপাশে গাছপালা ঝোপঝাড়। ছোট ছোট বস্তি। হালকা-পাতলা বাড়িঘর। একটা বাজারে গাড়ি থামিয়ে সিগারেট কিনেছিলেন আতাউর রহমান কায়সার। ঐ সময়টুকুতে কানে এসেছিল আঞ্চলিক ভাষার কথাবার্তা ।

: ঐ সব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে মোচলমান মিয়ারা ।

: পালিয়ে তো আসতেই হবে। বাঙালি হয়েও পাকিস্তানে গেলো তখন । জুলুম করে আমাদের তাড়ালো । আমাদের মা-বোনের দুধ কেটে নিলো। বেইজ্জতি করলো। এখন তার প্রতিফল ভোগো ।

: এখন পালিয়ে সেই আমাদের ইন্ডিয়াতেই আসতে হলো।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পৌছেছিলাম বাগাফায়। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৯২ হেড কোয়ার্টার্স। সাবরুম থানা থেকে দেয়া পরিচয়পত্র দেখিয়ে অবাধে প্রবেশপথ অতিক্রম করেছিল আমাদের জিপ। একটি বাঁশের ঘরের সামনে থেমেছিল। আশেপাশে আরো অনেকগুলো ঘর । একই রকম। অদূরেই একটি কোঠাবাড়ি। রাতের বেলায় প্রথম দৃষ্টিতে এইটুকু চোখে পড়েছিল । বাঁশের ঘরটি থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটি চেনামুখ । জনাব এ কে খানের ছোট ছেলে শামসুদ্দীন খান জাম্বু । আর একজন ভারতীয় শিখ-অমর সিং। ট্রান্সমিটার অপারেটর। ২০০ ওয়াট শক্তির শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার। আলমারির মতো ঘরের ভেতরে দাঁড় করানো। আর ছিল টেপ রেকর্ডার ও মাইক্রোফোন। রেকর্ড প্লেয়ার এবং গ্রামোফোন রেকর্ড ।

আমার ঢোলা জামার ঝুল পকেট থেকে বের করেছিলাম একতাড়া ছিন্নপত্র। ওতে লেখা ছিল ধারাবাহিক টুকরো টুকরো সংবাদ-তথ্য । কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে বিমান হামলা থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত । টিক্কা খানের বানোয়াট মৃত্যু-সংবাদ । বাংলাদেশে হানাদার বেলুচ বাহিনী ও পাঞ্জাবি বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ। চট্টগ্রামে দখলদারদের ছত্রীবাহিনী নামানো। উর্দুভাষীদের যোগসাজশে পাকিস্তানি সৈন্যদের শহরে প্রবেশ। নিরীহ বাঙালিদের ওপর আক্রমণ, হত্যা— নারী নির্যাতন। মুক্তিবাহিনীর সংগঠন । সাহসিক অগ্রগতি । জীবন-জয়ের

শপথ... ইত্যাদি ।

এ সবই ছিল জনশ্রুতি ও বৈদেশিক বেতার শুনে গত ৪ দিন ধরে টুকে টুকে রাখা । এসবের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলাম একটি সংবাদ বুলেটিন। আমি ও আবুল কাসেম সন্দ্বীপ লিখেছিলাম বাংলায় । সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন আবদুল্লাহ- আল ফারুক।

৩ এপ্রিল রাত ১০টা। সেটা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম অধিবেশন । সূচক-সুর হিসেবে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' রেকর্ডের গানটির ১ম পিঠ এবং সমাপ্তিতে ২য় পিঠ। বাংলা সংবাদ বুলেটিনটি পাঠ করেছিলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। ইংরেজি বুলেটিন শামসুদ্দীন খান জাম্বু। ঢাকা রেকর্ডের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' এবং আরো কয়েকটি গান বাজানো হয়েছিল। অধিবেশনটির স্থিতিকাল ছিল প্রায় ১ ঘণ্টা।

“জয় বাংলা বাংলার জয়' সুরধ্বনি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ভারি পদশব্দ। দীর্ঘদেহী সুদর্শন আগন্তুক প্রবেশ করেছিলেন। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম । সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক এবং নাম-পরিচয় পর্ব। কর্নেল (?) ঘোষ। বাগাফা হেড কোয়ার্টার্সের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। বলেছিলেন : ইয়ংম্যান, তোমরা ছ'জন পারমানেন্টলি চলে আসবে। রোজ আনা-নেয়ার জন্যে ট্রান্সপোর্ট দেয়া যাবে না ।

কিন্তু আমরা যে দশজন! আমি সাহস করে বলেছিলাম: আমরা মোট দশজন, স্যার! : নো! দশজনের জন্যে এখানে জায়গা হবে না। বলেই তিনি প্রস্থানোদ্যত হয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে সামরিক স্যালুটয়ের ভারি পদশব্দ। এ কি, আমাদের মেজর জিয়াউর রহমান! কর্নেল ঘোষকে স্যালুট দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু বাক্য-বিনিময় হয়েছিল দু'জনের মধ্যে ।

মেজর জিয়াউর রহমান ভিন্ন গাড়িতে ছিলেন। সাবরুম থানায় ফিরে এসেছিলাম একই সঙ্গে । ফিরতি নৌকায় আমাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান এবং এইচ টি ইমাম । তখন মেজর জিয়াউর রহমানের হাতে ছিল বিরাট কাগজের প্যাকেট 1 এইচ টি ইমাম জিজ্ঞেস করেছিলেন: এতে কি?

: রেডিমেড জামা । আগরতলা বাজার থেকে কিনলাম । খুব সস্তা । এক ডজন কিনে নিয়েছি ।

এতোক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম। রামগড়ে ফিরে এসেই টের পেয়েছিলাম, দারুণ ক্ষিদে । সেই কখন দুপুরে নাজিরহাটে ভাত খেয়েছিলাম। তারপর এতোটা সময়ের মধ্যে এক ফোঁটা পানিও খাওয়া হয়নি। তখন রাত ১২টা। রামগড় বাজারের দোকানপাট সব বন্ধ । একটা মিষ্টির দোকানে ডাকাডাকি নিষ্ফল হচ্ছিল । মেজর জিয়াউর রহমান দরজায় পদাঘাত করেছিলেন। ওতেই দোকানির ঘুম ভেঙেছিল ।

ছিল না কিছুই । শুধু একটা রেকাবিতে ১০/১২টি নিমকি এবং একটা পাত্রে ৬/৭টি রসগোল্লা । মেজর জিয়াউর রহমান, আতাউর রহমান কায়সার, মীর্জা আবুল মনসুর ও আমরা তিনজন। এই ছ'জনে ভাগ করে খেয়েছিলাম ঐটুকু খাবার হাতে হাতে তুলে নিয়ে । দোকানিকে বলা হয়েছিল, সকালবেলা থানা থেকে দামটা নেবার জন্যে ।

রাতে আমাদের জন্যে শোবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বাঁশের মাচাবিশেষ বিছানায় । বাজারের একটি হোটেলের খুপরিতে। ওখানেই আমাদের সহকর্মীরাও ছিলেন।

৪ এপ্রিল সকালবেলা । রামগড়ের এস-ডি-ও-র বাংলোটি পরিত্যক্ত ছিল । দিনেকের জন্যে আমাদের ওখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল । সবাই ছিলাম এক কাপড়ে। গামছা পরে পরনের কাপড় ধুয়ে নেয়া হয়েছিল।

সারাদিন চিন্তার বিষয় ছিল দশজনের দলটিকে কি করে ছ'জনের মধ্যে সীমিত করা হবে। কর্নেল ঘোষ দশজনের থাকার সংস্থান করবেন না। কাকে বাদ দেয়া হবে দল থেকে?

কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদকে বলেছিলাম : তুমি বরং থেকে যাও দেশে। বাড়িতে ফিরে যাও ।

কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ চুপ করে ছিলেন। অন্যরা কেউই সমর্থন করেননি এ প্রস্তাব ।

শরণাপন্ন হয়েছিলাম মেজর জিয়াউর রহমানের ।

: আপনি একটু কর্নেল ঘোষকে বলে আমাদের দশজনের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিন ।

: না । তা সম্ভব নয় । তিনি ছ'জনের কথা বলে দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কাকে বাদ দেয়া হবে? আপনি তো কালুরঘাট থেকে সবাইকে দেখে আসছেন। আমরা কি করে এখন বিচ্ছিন্ন হবো?

: আমি ওসব বুঝিটুঝি না । এখানে সেন্টিমেন্টের স্থান নেই । যে কোনো চারজনকে খসিয়ে দিন। ঠিক আছে?

: কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

: কেন সম্ভব নয়? ঐ ট্রান্সমিটারে তো শিখ অপারেটর আছেন একজন। তাহলে আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কি কাজ?

মেজর জিয়াউর রহমানের এই কথাটিতেই আমাদের বোধোদয় হয়েছিল। তাই তো! আমাদের ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি তো এখনো এসে পৌছেনি । সেটা পৌঁছলেই আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গীদের কাজ শুরু হবে।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেদিন আমরা সবাই বাগাফায় যাবো। পরে অনুষ্ঠান বিভাগের পাঁচজন ওখানে থেকে যাবো। আর প্রকৌশল বিভাগের পাঁচজন রামগড়ে ফিরে আসবেন। ট্রান্সমিটারটি এসে যাবে অচিরেই। তখন সেটা ইনস্টল করার কাজ নিয়ে ওরাও বাগফায় যাবেন। আবার সবাই সম্মিলিত হবো ।

৪ এপ্রিল বিকেলে বাগাফায় যাওয়া হয়েছিল সকলের। সঙ্গে সেকান্দর হায়াত খানও গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে রামগড়ে প্রত্যাগত হয়েছিলেন সৈয়দ আবদুশ শাকের, রাশেদুল হোসেন, রেজাউল করিম চৌধুরী, আমিনুর রহমান ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ ।

আর বাগাফায় থেকে গিয়েছিলাম বাদবাকি পাঁচজন। মুস্তফা আনোয়ার, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ্-আল-ফারুক, শারফুজ্জামান ও আমি। শারফুজ্জামান প্রকৌশলিক কর্মী। ভারতীয় নাগরিক অমর সিং ছিলেন একমাত্র অপারেটর। তাঁর দায়- দায়িত্ব কিছুটা যেন লাঘব হয়। এ ছাড়া তাঁর ওপর আমরা নির্ভর করবো বটে, কিন্তু তাঁকে তো কথায়-কথায় খাটাতে পারবো না। সেজন্যেই নিজেদের মধ্যে একজন প্রকৌশলিক সহকর্মীর প্রয়োজন বোধ করেছিলাম ।

শারফুজ্জামানের ছিল ভালো কণ্ঠস্বর। অনুষ্ঠান ঘোষণা করতেন। একটি কথিকাও লিখেছিলেন ।

এভাবেই আমরা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলাম ।

৪ এপ্রিল রামগড়ে গিয়েছিলেন একদল ভারতীয় প্রতিনিধি । সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ের লোক । জনা পাঁচ-ছয়। ওঁরা দুপুরে রামগড় থানায় খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। সে উপলক্ষে ভালো খাবার তৈরি হয়েছিল। প্রধান আইটেম ছিল মুরগির রোস্ট। পাতে পাতে পরিবেশিত হয়েছিল আস্ত এক-একটি। ওঁরা গোগ্রাসে খেয়েছিলেন। সীমান্ত নদী আমরা প্রায় একই সময় পার হয়েছিলাম। প্রতিনিধিদের এগিয়ে নেবার জন্যে সাবরুম থানায় অপেক্ষমান ছিলেন ভারতীয় অফিসাররা । তাঁদের প্রথম প্রশ্ন ছিল : কেমন খাওয়া- দাওয়া হলো?

: অচিন্ত্যনীয় ভালো । সুস্বাদু খাবার।-বলেছিলেন প্রতিনিধি দলের একজন ।

: আসলে ওদের প্রাচুর্য আছে। এপার থেকে দেখতেই তো পাওয়া যায়, কিভাবে দালানকোঠা গড়ে উঠেছে। ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তবু কেন যে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেলো!

৪ এপ্রিল সারাদিনই দেখেছিলাম লোক-সমাগম। রামগড় থানা আর নদীর পারে মানুষের ভিড়। সকল বয়সের মানুষজন। সবাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এক একটি দল নৌকোয় ভারতে পাড়ি জমাচ্ছিল। সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংয়ের জন্যে । ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই ট্রেনিংয়ের ব্যাপারেই আলাপ-আলাচনা হয়েছিল ।

রামগড় নদীর পারে একজনকে পেয়েছিলাম! মুখভর্তি কাঁচা দাড়ি । দেখে চেনা মনে হয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাকেও চিনেছিলেন তিনি। চট্টগ্রামের মিরেরশরাইয়ের লোক। কতিপয় যুবককে নিয়ে এসেছিলেন ভারতে পাঠাবার জন্যে। ট্রেনিংয়ের জন্যে। তাঁর হাতে একটি চিরকুট দিয়েছিলাম। আমানটোলার মেজ মিয়াকে লেখা। উল্লেখ ছিল, **৬১.৬৩** নম্বর মিটার ব্যান্ডে যেন রেডিও শোনা হয় । শর্ট ওয়েভ।

৪ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল **১৯৭১**। এই ৫দিন আমাদের কেটেছিল বাগাফায় । নন- গেজেটেড অফিসার্স হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাঁশের ঘর। ছোট ছোট কক্ষ। চারপায়ার বদলে বাঁশের মাচা। তার ওপরে শক্ত তিরপল পাতা। সিথানের দিকটা একটু উঁচু। তিরপলের নিচে কিছু-একটা গুঁজে দেয়া। এ ছাড়া বালিশ ছিল না। প্রত্যেক বিছানায় একটি করে কম্বল আর মশারি ।

পাশাপাশি ৫টি কক্ষ আমরা দখল করেছিলাম ।

এক মিনিট হেঁটে গেলেই ট্রান্সমিটার-রাখা বাঁশের ঘরটি। ওখানে বসেই লেখাজোখার কাজ এবং অমর সিংয়ের সহায়তায় অনুষ্ঠান প্রচার। প্রতিদিন দু'টি অধিবেশন। সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা এবং সন্ধে ৭টা থেকে ১০টা। অনুষ্ঠান-সম্ভার যুদ্ধের খবরাখবর। গ্রামোফোন রেকর্ডের গান। সবই বাংলাদেশে উৎপন্ন গান। আগেই সংগৃহীত হয়েছিল। আর ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে চয়িত স্লোগান। বিমান হামলার সময় করণীয় সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি। এবং মুস্তফা আনোয়ার ও আমার লেখা তাৎক্ষণিক কবিতা ও কথিকা ।

কর্নেল ঘোষ একটি পেপার কাটিং দিয়েছিলেন। একটি নিবন্ধ। ওতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া বিধৃত। উপযোগী হলে প্রচার করতে বলেছিলেন। আমি ওতে কিছু শব্দান্তর করেছিলাম। যেমন, ‘রাষ্ট্রসঙ্ঘের' স্থলে ‘জাতিসঙ্ঘ'। ‘বক্তব্য রাখেন'-এর স্থলে 'বলেন' বা ‘বক্তব্য উপস্থাপন করেন'। এ ছাড়া ‘বাঙালিদের' স্থলে ‘আমাদের’। সম্পাদনার পর কর্নেল ঘোষকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম । কিছু না দেখেই বলেছিলেন : আমি আবার কি দেখবো? এ তো আপনাদের ব্যাপার। আপনাদের পলিসি অনুযায়ী যা করার, আপনারাই করবেন।

অদূরেই কোথাও প্যারেড হতো। ‘লেফ্ট রাইট' ‘কুইক মার্চ’ ইত্যাদি শব্দ। বিক্ষিপ্ত শোনা যেতো। পরিচয় হয়েছিল ক্যাপ্টেন (?) মুখার্জির সঙ্গে। বলেছিলেন : আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিই আমরা ।

: ওখানে কি দেখতে যাওয়া যাবে?

: না। খুব কাছে যদিও। গাছপালার জন্যে দেখা যাচ্ছে না। ঐ ওদিকটায়। ওটা কিন্তু প্রটেকটেড এরিয়া ।

: ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আপনারা কতজনকে ট্রেনিং দিচ্ছেন?

: সঠিক বলতে পারবো না । তবে সংখ্যা কম হবে না । প্রতিদিনই তো আসছে নতুন নতুন ছেলেরা। খুব সংক্ষিপ্ত কোর্স। একটু শরীরচর্চা আর রাইফেল ট্রেনিং। অবাক হই, এদের উৎসাহ দেখে । বিভিন্ন বয়সের ছেলে। স্বাস্থ্য ও চেহারা বিচিত্র। কিন্তু কোনো কিছু একবার বললেই ধরে নিতে পারে।

৮ এপ্রিল সকালের অধিবেশন শেষ হবার পর। ক্যাপ্টেন মুখার্জি ডেকে

নিয়েছিলেন পাশের একটি বাঁশের ঘরে। আমাদের সবাইকে । নিম্নস্বরে বলেছিলেন : এখানেই একটু বসুন। এখান থেকে বাইরে ঐ দিকে লক্ষ্য রাখুন।

: কি ব্যাপার?

: ও, জানেন না বুঝি! গতকাল একজন পাঞ্জাবি মেজর ধরা পড়েছেন । এখনই ঐ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এখান থেকে দেখা যাবে। কী তাগড়া জোয়ান! দুধে- আলতা গায়ের রং ।

: কোথায় ধরা পড়লেন? আপনি বন্দির সাথে কথা বলেছেন?

: ইস্? তা কি করে সম্ভব? তিনি তো মেজর। আমাদের মেজর স্ট্যাটাসের অফিসাররাই তাঁকে অ্যাটেন্ড করছেন।

পথটি পার হবার সময় আমরা বন্দিটিকে দেখেছিলাম ।

বাবর্চি ছেলেটির নাম গৌরাঙ্গ। পাঞ্জাবি মেজরটির মতোই স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ। বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। আপন মনেই সঙ্কোচ বোধ করতেন খাবার পরিবেশনের সময়। আগে থেকেই টেবিলে রাখা থাকতো গামলা ভর্তি ভাত এবং একটা থালায় কিছু হাতরুটি। আর থাকতো বড়ো বাটিতে ডাল। একটি পিরিচে কিছু খোসা ছাড়ানো আস্ত পেঁয়াজ । আমরা খেতে বসলে এনে দেয়া হতো নিমকদানের সমান বাটিতে কিছু সব্জি । প্রত্যেকের জন্যে এক-এক বাটি I

অমর সিং ছাড়াও আরো দু'একজন শিখ ছিলেন। ওঁরা প্রথমে দু'একটি ‘রোটি’ স্রেফ পেঁয়াজ দিয়ে খেতেন। পরে খানিকটা ‘চাওয়াল’ ডাল সহযোগে ।

চালের সঙ্গে থাকতো কাঁকর। চালের রঙে রং। রান্নার আগে বেছে নেবার উপায় ছিল না। বাবুর্চি গৌরাঙ্গ অসহায় বোধ করতেন। বলেছিলেন : বাবু, আপনারা তো ভালো ভালো খেয়েছেন। আপনাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পারি। আগামীকাল বড়ো খানা— মাংস হবে।

বড়ো খানার ডালটা ঘন রান্না। তরকারির বাটিটা একটু বড়ো আকারের । একগাদা ঝোলের মধ্যে বরফি-কাটা আলু। আলুর ভেতর থেকে বেরিয়েছিল দু'তিন টুকরো কবুতরের মাংস ।

অধিবেশন চলাকালে ট্রানজিস্টারে শুনবার চেষ্টা করেছিলাম। হতাশ হয়েছিলাম।

অত্যন্ত অস্পষ্ট। অমর সিং বলেছিলেন : লোকালি ভালো রিসেপশন হয় না শর্টওয়েভে । এনটিনা ঢাকার দিকে ফিট করা আছে। ঢাকা থেকে ভালোই শোনা যায়।

শারফুজ্জামান সায় দিয়েছিলেন। তবু মনটা খুঁতখুঁত করেছিল । অনেক পরে আগস্ট- সেপ্টেম্বরের দিকের কথা। কলকাতায় দেখা হয়েছিল সাংবাদিক এ বি এম মূসার সঙ্গে । বলেছিলেন : আপনাদের শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের প্রোগ্রাম আমরা শুনতাম। পাকিস্তান অবজারভার অফিসে আমরা টেপ রেকর্ডারে আপনাদের অনেক প্রোগ্রাম রেকর্ড করেছি ।

এ বি এম মূসা আমাদের কোনো কোনো অনুষ্ঠানের নামও বলেছিলেন। অর্থাৎ একজন স্বনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন ।

হঠাৎ করেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কর্তৃপক্ষ নিয়েছিলেন সিদ্ধান্তটি । আমাদেরকে আর বাগাফায় রাখা হবে না। স্থানান্তরিত করা হবে শালবাগানে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৯১ হেড কোয়ার্টার্সে। ওখানে ৪০০ ওয়াট শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। শালবাগান আগরতলা শহরের সন্নিকটে। সংবাদ-তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হবে। আগরতলা শহরে বাংলাদেশের নেতাদের অফিস আছে ।

রামগড় থেকে দূরে সরে যাওয়া হচ্ছিল আমাদের। আমাদের পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের উপায় কি? কর্নেল ঘোষকে অনুনয় করে বলেছিলাম : আমরা চট্টগ্রাম থেকে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার তুলে এনেছি। সেটা হয়তো ইতোমধ্যে পৌছে গেছে রামগড়ে। আমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানেই ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি বসাবার সুযোগ দেবেন। আমরা দশজন যেন একসাথে থাকতে পারি ।

৮ এপ্রিল সকালবেলা। একটা লরিতে আমরা উঠে বসেছিলাম। লরিতে ওঠানো হয়েছিল বিপুল যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জাম। অমর সিংও আমাদের সহযাত্রী। সকালবেলা অধিবেশন শেষ করে আমাদের যাত্রা। সান্ধ্য অধিবেশন প্রচার করা হবে শালবাগান থেকে ।

শালবাগানে আমাদের রিসিভ করেছিলেন কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী। সিভিল পোশাকধারী সুদর্শন প্রৌঢ় । সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর তথ্য ও জন-সংযোগ বিভাগের লোক । চোখে-মুখে কথা-বলা বাক্যরসিক। বলেছিলেন : এক দু'দিন

বিশ্রাম। এখানে সিগনাল থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। সব ঠিকঠাক করা লাগবে। এই সুযোগে আপনারা ভালো প্রোগ্রাম তৈরি করুন। কথিকা লিখুন ।

শালবাগান এলাকাটি ট্রানজিট ক্যাম্প। রক্ষীবাহিনীর জোয়ানদের আনাগোনায় মুখরিত। এখানেও বাঁশের ঘর। তক্তপোষের বদলে বাঁশের মাচা। আস্ত মুলিবাঁশ দিয়ে তৈরি মাচা। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিরাট বিরাট। একই মাচায় তিন-চারজনের শোবার মতো পরিসর । বালিশ নেই । চাদর বা তোষক নেই । শুধু এক-একটি কম্বল পেলে রাখা । আস্ত বাঁশের উপর কম্বলটা বিছানো হলে মাথায় কি দেয়া হবে? গায়ে কি দেয়া হবে? মশারি ও ছিল না। মশার উপদ্রব ছিল বিষম। ঐ কম্বলসর্বস্ব বিছানায় আস্ত মুলিবাঁশের উপর শোবার উপায় ছিল না ।

প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলো লরি । তারই একটিতে উঠে পড়েছিলাম আমরা পাঁচজন। ড্রাইভার আপত্তি করেননি। বরং গায়ের ওপর চাপাবার জন্যে কম্বলটি দিয়েছিলেন । আলাপ-পরিচয়ে জানা গিয়েছিল, তিনি পাঞ্জাবি। পূর্ব পাঞ্জাবের বাসিন্দা। আমাদের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়েছিল, এক পাঞ্জাবি আমাদের শত্রু, আরেক পাঞ্জাবি আশ্রয়দাতা। সেই অবস্থাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সহসা হাঁকডাক শুরু হয়েছিল ।

: তোমলোগ উতার যাও। ইয়ে লরি ছোড় যায়ে গা ।

বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। আমরা নেমে অন্য লরিতে গিয়ে উঠেছিলাম ।

এই ট্রানজিট ক্যাম্প-এর অদূরেই শালবাগান হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রধান এলাকা । কোঠাবাড়ি এবং ডাকবাংলো ওখানেই । বাগাফা থেকে আসার পথে ডাকবাংলোর সামনে থেমেছিলাম দশ মিনিট। দেখা হয়েছিল তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে। পূর্ব-পরচিত ছিলেন। আর দেখা হয়েছিল কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীর সঙ্গে। তিনি করমর্দন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না। আপনমনেই পকেট হাতড়ে দু'টি দশ টাকার নোট বের করেছিলেন। ভারতীয় টাকা। আমার হাতে দিয়েছিলেন । দলের দু'জন ধূমপায়ীর জন্যে টাকাটা লাভজনক হয়েছিল । ২০ কাঠির এক প্যাকেট পানামা সিগারেট। একবারে এক কাঠিকে দু'ভাগ করে দু'জনের হয়ে যেতো।

দ্বিতীয় দিন দুপুরে আমরা প্রাঙ্গণে বসেছিলাম । হাতে কাগজ-কলম । তখনই একটি জিপ এসেছিল। নেমেছিলেন একজন বাঙালি । ইউনিফর্ম না থাকলেও

চুলের ছাঁট থেকে বোঝা যাচ্ছিল সৈনিক। মেজর-ক্যাপ্টেন হবেন নিশ্চয়। আমাদের কাজ দেখেছিলেন । উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম। বলেছিলেন : আমিও আপনাদের মতোই একজন মুক্তিযোদ্ধা। অন্য কোনো নাম-পরিচয় আপাতত নেই।

চমৎকৃত হয়েছিলাম। পরে, ১৯৭৮ সালের কথা। সিলেট থেকে ঢাকায় এসেছিলাম। রেডিও বাংলাদেশের কর্মচারীদের দাবিদাওয়া বিষয়ক বৈঠকে। একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলামের সঙ্গে। আঞ্চলিক পরিচালক ইব্রাহীম আখন্দসহ আমরা সর্বস্তরের দশ বরোজন। ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলামের সঙ্গে সেটাই প্রথম দেখা। তবু মনে হয়েছিল, আগেও যেন দেখা হয়েছিল ।

বিদায়ী করমর্দনের সময় ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম আমার হাত ধরে রেখেছিলেন। বলেছিলেন : আপনার সাথে এর আগে কোথায় দেখা হয়েছিল, মনে করে দেখুন তো!

মনে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম :জি, ভারতের শালবাগানে। বি-এস-এফ-এর ট্রানজিট ক্যাম্পে।

: হ্যাঁ, একাত্তরের এপ্রিলের প্রথম ভাগে। আপনারা ঘাসের ওপর বসে নিউজ লিখছিলেন ।

: জি, আপনি সেদিন নিজের নাম বলেননি ।

প্রাঙ্গণে ঘাসের ওপরে বসেই খেতে হতো। পোড়া-লাগা সেঁকা রুটি । পাতলা ডাল । ডালের মধ্যে ভাসমান পোকা । প্লেট-এর অভাব ছিল । লাইনে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে নিতে হতো ৪/৫টি করে রুটি। একটিমাত্র বাটি পাওয়া গিয়েছিল। ওতে পাঁচজনের জন্যে ডাল। পোষা শূকরছানা চরে বেড়াতো প্রাঙ্গণে। একদিন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ হঠাৎ হেঁকে উঠেছিলেন : এই শুয়রের বাচ্চা!

সবাই চমকে উঠেছিলাম। আবুল কাসেম সন্দ্বীপ আঙুল তুলে বলেছিলেন : ঐ যে মাটি শুঁকছে। ওটাকেই বললাম ।

একবাটিতে রুটি ডালে চুবিয়ে খাওয়া। কেউ যেন কামড়ানো রুটিটা না ডোবায়। আগেই এক গ্রাসের পরিমাণ ছিঁড়ে নেয়া উচিত ।

শালবাগান ট্রানজিট ক্যাম্প-এ ল্যাট্রিন ছিল অনেকগুলো। টিনের আড়াল দেয়া। কাঠের পাটাতন। একটা টিনের পাত বসানো। ময়লা ওতে নিক্ষিপ্ত হয়েই গড়িয়ে গর্তে পড়ে। ২২ আউন্সের বোতল ভরে পানি নিতে হতো। শৌচকর্মের জন্যে বদনা বা ঘটির ব্যবহার ছিল না । একদিনও নোংরা দেখতে পাইনি ল্যাট্রিনে । আমরা দুই বোতল পানি নিয়ে যেতাম ।

স্নানের জন্যে একটু এগিয়ে গিয়ে পাতকুয়া। দ্বিতীয় দিনে গিয়েছিলাম । পরনের কাপড় খুব ময়লা হয়ে গিয়েছিল। একজন জোয়ান আমাকে কুয়া থেকে পানি তুলে দিয়েছিলেন। নিজের হাতে সাবান মাখিয়ে আমার গেঞ্জি-লুঙ্গি-জামা ধুয়ে দিয়েছিলেন । গায়ের ময়লা তুলে দিয়েছিলেন হাতে ঘষে। কাপড় শুকাবার অপেক্ষায় গামছা পরে কাটিয়েছিলাম ।

তৃতীয় দিন সকালবেলা এসেছিলেন কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জী। উল্লাসিত কণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন আমাদেরকে ।

: এই যে, কোথায় তোমরা সব! আজ থেকে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হবে । তোমাদের অফিসঘর ঠিক হয়েছে।

আরো কিছু বলতেন তিনি। কিন্তু থমকে গিয়েছিলেন আমাদের দেখে ।

: এ কি চেহারা বানিয়েছ তোমরা! রাতে ঘুমাওনি? আমার সব পরিকল্পনা বাতিল । এখনই ওঠো জিপে। যে অবস্থাতে আছ। উঠে এসো। তোমাদের নেতাদের কাছে নিয়ে যাবো তোমাদের। দেখাবো, কাজের ছেলেগুলো কিভাবে আছে। আর তাঁরা কিভাবে আছেন ।

না, একটুও আবেগপীড়িত হইনি আমরা। যন্ত্রচালিতের মতো উঠে বসেছিলাম জিপে ।

আগরতলা শহরের প্রান্তিক এলাকা কুঞ্জবন । একটি একতলা বাড়ি । কৃষি বিভাগের রেস্ট হাউস। প্রধান সড়কসংলগ্ন। সামনেই জিপটা থেমেছিল। কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জী বলেছিলেন : নেমে পড়ো তোমরা। ভেতরে চলে যাও। তোমাদের চেহারা দেখুক নেতারা। যাও তোমরা । আমি যাচ্ছি না। রাগের মাথায় কি বলে বসি!

আমাদের পেছনে পেছনে কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জী ঠিকই ভেতরে গিয়েছিলেন। ফাইলের সামনে উপবিষ্ট ছিলেন এক আর সিদ্দিকী। একমাত্র আমিই ছিলাম

তাঁর পূর্ব- পরিচিত। স্বভাবসিদ্ধ নিম্নস্বরে কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

অমনি ফেটে পড়েছিলেন কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জী। বলেছিলেন : ওরা কেমন আছে, দেখতেই তো পাচ্ছেন! আমি তো সেদিন ওদের সাথে পরিচিত হয়েই চলে গিয়েছিলাম আগরতলার বাইরে। আপনাদেরই কাজে। ট্রান্সমিটার চালু করার কাজ। আপনাদের জানিয়ে গিয়েছিলাম ওদের কথা । আর আজ গেলাম, ওদেরকে একটি ব্যাম্বো শেড-এ বসবার জায়গা করে দেবো বলে। গিয়ে দেখি এই অবস্থা। খাওয়া-শোওয়া কিছুরই ব্যবস্থা তো ছিল না ওদের এই তিনদিন! এভাবে থাকতে হলে কি করে কাজ করবে?

এম আর সিদ্দিকী বলেছিলেন : ওঁদের ব্যাপারে আমাকে মিস-রিপোর্ট করা হয়েছে । আমাকে বলা হয়েছে, ওঁদেরকে ভালোভাবেই রাখা হয়েছে।

যা-ই হোক, স্থির হয়েছিল, আর সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে নয়, আগরতলা শহরেই আমাদের রাখা হবে। আমাদেরকে ট্রান্সমিটারের কাছে নেয়া হবে না। অর্থাৎ সজীব অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে না। সবই হবে পূর্বাহ্নে রেকর্ডকৃত। এই রেকর্ডিং-এর কাজটি করা হবে সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে এবং বেতারের লোক হিসেবে আমাদের পরিচয়ও থাকবে অত্যন্ত গোপন ।

সেই জিপ-এ করেই উপনীত হয়েছিলাম ৯১২, কর্নেল চৌমুহনিতে। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র । বেশ বড়োসড়ো বাড়িটি। অনেকগুলো কক্ষ এবং একখণ্ড প্রাঙ্গণ ।

অনেক পরিচিত মুখের সমাবেশ এখানে। পৌছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জী। সেদিনটি ছিল ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

: এখন কোনো কথা নয় । আপনারা গোসল করে নিন । খাওয়া-দাওয়া করুন। পরে আলাপ হবে।-বলেছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ।

আমার পরিধেয় ছিল লংক্লথের ঢোলা জামা ও লুঙ্গি। পুরাতন ছিল। অনবরত ব্যবহারের ফলে জীর্ণ। পাল্টে অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের শার্ট-লুঙ্গি পরেছিলাম । মাহবুব আলম চাষী, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং আরো অনেকেই ছিলেন । সবাই নিজেদের কাপড় পরতে দিয়েছিলেন আমাদের পাঁচজনকে। অদূরেই রাজবাড়ির দীঘি । শাণবাঁধানো ঘাটে স্নান । সাবান ঘষে, অনেক সময় নিয়ে ।

তারপর খাওয়া। মাছভাত। ভারতের মাটিতে পদার্পণের পর এই প্রথম মাছভাত খাওয়া হয়েছিল ।

সন্ধ্যার আগেই এসেছিলেন কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জী। অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হবে । স্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল সার্কিট হাউসের একটি কক্ষ। পাণ্ডুলিপি তৈরিই ছিল। শুধু সংবাদ বুলেটিনটি আপ-টু-ডেট করে নিতে হয়েছিল কিছু কিছু পুনর্লিখনের মাধ্যমে। ৮ এপ্রিল প্রভাতী অধিবেশনের পর তিনদিন বিরতি। আবার শুরু হয়েছিল ১২ এপ্রিল প্রভাতী অধিবেশন দিয়ে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান। ৪০০ ওয়াট ক্ষুদ্র তরঙ্গ ট্রান্সমিটার। মিটার ব্যান্ড ৮৩.৫৬ ।

আগরতলা সার্কিট হাউসের চত্বরে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দু'জন বিদেশী সাংবাদিক। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আমাদের দেখিয়ে ইংরেজিতে বলেছিলেন : এই যে, এঁরাই হলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মী ।

বলে কি। বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে ভারতীয় এলাকায় আমাদের পরিচয় জানাজানি হওয়া কি ঠিক? ভাববেন, ভারত থেকে বেতারের প্রচারণা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মুস্তফা আনোয়ার বলেছিলেন : হ্যাঁ, আমরা চট্টগ্রাম থেকে প্রচার করতাম। ওখানে বোম্বার্ডমেন্টের পর বর্ডার ক্রস করে এসেছি।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। পরে সবিনয়ে স্বীকার করেছিলেন আমাদের কাছে। দু'তিনদিন পর তিনি একটি ইংরেজি কথিকা রেকর্ড করেছিলেন। সেই অবকাশে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাদের একটি গ্রুপ ফটো তোলার। বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। নীতিগতভাবেই আমরা সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম ।

আরো কণ্ঠস্বর সংযোজিত হচ্ছিল ক্রমান্বয়ে! প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী রেকর্ড করেছিলেন টেলিভিশনের মোস্তফা মনোয়ার। নিয়মিত কথিকা পাঠে অংশ নিয়েছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ও আমিনুল হক বাদশা। অপর একজন ডক্টর হাবিবুর রহমান ।

ডক্টর হাবিবুর রহমান ও অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী । এই দু'জন ছিলেন ইয়থ ক্যাম্প ডাইরেক্টরেটের পরিচালক। সহযোগী পরিচালক ছিলেন কসবার সহীদুল ইসলাম। আকাশবাণীর আগরতলা কেন্দ্র থেকে সহীদুল ইসলামের

ইন্টারভিউ প্রচারিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে যবসমাজের ভূমিকা সম্পর্কিত। ইয়থ ক্যাম্পের অভ্যর্থনা কেন্দ্র ছিল আগরতলা কংগ্রেস ভবনে। সেখানে ইয়থ ক্যাম্প চিফের দায়িত্বে ছিলেন শাফীউদ্দিন আহমদ। আশুগঞ্জের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগার 'শাফী মিয়া'। কর্নেল চৌমুহনিতে এবং আগরতলার অন্যান্য অফিসে ঘুরেফিরে দেখা হতো এঁদের সঙ্গে । প্রাণচঞ্চল তরুণ কর্মী সহীদুল ইসলাম এবং মধ্য বয়সী অথচ তারুণ্যদীপ্ত শাফীউদ্দীন আহমদ ।

১৯৮০ সালে সিলেট থেকে ঢাকায় ভ্রাতুষ্পুত্রী জেসমীনের বিয়েতে এসেছিলাম। বরের পিতা হিসেবে শাফীউদ্দীন আহমদকে দেখে চমকিত হয়েছিলাম। মজলিশে তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং জিল্লুর রহমানও এসেছিলেন। আমাদের মেয়ে-জামাই কামাল আহমদ দুলাল একজন মুক্তিযোদ্ধা। সামাজিক অনুষ্ঠানটি যেন দশক-পূর্ব কর্নেল চৌমুহনি ।

আমিনুল হক বাদশার সঙ্গে আমার ক্ষীণ মতভেদ দেখা দিয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পলিসিগত ব্যাপারে। তিনি চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের নামে কিছু প্রচার করতে। আমি প্রতিবাদী হয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ্য, দেশ থেকে হানাদারদের উৎখাত করা। এজন্যে দেশ-বিদেশে জনমত গড়ে তোলা। আমাদের কার্যক্রম কোনো দলীয়ভিত্তিক নয়, বরং বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক । আমাদের প্রেরণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি। বঙ্গবন্ধুকে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে নয়, জাতির নেতা হিসাবে আমরা গ্রাহ্য করেছিলাম।

উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ২৫ মে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে ঐ নীতিবোধ (Ethics) ছিল অক্ষুণ্ন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল মুক্তিযুদ্ধের মুখপাত্র, কোনো রাজনৈতিক দলের নয় । যাবতীয় কথিকা ও সংবাদ বুলেটিন আমি দেখে দিতাম । তারপর রেকর্ড করা হতো। আমার নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে নিতাম মুস্তফা আনোয়ারকে ।

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এবং এম আর সিদ্দিকী ঐ নীতিবোধের প্রতি সায় দিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যে কোনো পলিসিগত জটিলতার জন্যে তাঁদের উপদেশ-প্রার্থী হতাম— নিজ দায়িত্বেই ।

১১ এপ্রিল রাতে সার্কিট হাউস থেকে ফিরতে রাত ১০টা বেজে গিয়েছিল । আমাদের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কর্নেল চৌমুহনির বাড়ির গ্যারেজে।

মেঝেতে বিছানা পাতা হয়েছিল। চাটাই-এর ওপর চাদর। এ ছাড়া সদ্য কোনো মশারি খাটিয়ে দেয়া হয়েছিল ।

১২ এপ্রিল সকালবেলা। মাহবুব আলম চাষী আমাকে পাঠিয়েছিলেন আগরতলার আই-জি-র কাছে। পরিচিতিপত্র দিয়েছিলেন। আই-জি মি. কালাইয়া এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন ভারতীয় নোট। বলেছিলেন : চাষী সাহেবকে বলবেন, এ টাকা দেবার পর আর মাত্র দু'শ টাকা থাকলো । পাকিস্তানি টাকা জমা দিয়েছিলেন চাষী সাহেব ।

আগরতলার এসিস্ট্যান্ট ইনফরমেশন অফিসার জি পি শাও আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন বাজারে। যার যার পছন্দমতো কাপড় কেনা হয়েছিল। আমি খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে রেডিমেড ঢোলা জামা ও সাদা লুঙ্গি কিনেছিলাম দুই সেট।

এই পোশাকেই আমি অভ্যস্ত। ১৯৬৪ সালের ১ এপ্রিল চট্টগ্রাম বেতারে যোগ দেবার পর থেকে। পাকিস্তানের কোনো জাতীয় পোশাক সুনির্দিষ্ট নেই, তারই প্রতিবাদে। মনে আছে, সেই সময়ে তথ্যমন্ত্রী জনাব খাজা শাহাবুদ্দীন এসেছিলেন আমাদের অফিসে । আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ-উজ-জামান আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন মন্ত্রীর সঙ্গে । মন্ত্রী আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আশরাফ-উজ-জামানের কানে কানে পোশাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আশরাফ-উজ-জামান সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন : ও সব সময়েই এই কাপড় পরে ।

মন্ত্রী জানতে চেয়েছিলেন : মিলাদ মাহফিলমে?

: এই একই কাপড় পরে ।

: শাদি কা মজলিশমে?

: এই কাপড়ই পরে ।

মন্ত্রী তখন বলেছিলেন : তো উনকি লিয়ে ঠিক হ্যায় ।

১৯৮২ সালের আগস্ট মাসটি আমি স্টাডি ট্যুর উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ায় ছিলাম। আমরা চারজন ছিলাম। দুজন বেতারের এবং দুজন টেলিভিশনের। যথাক্রমে হাফিজ আহমদ ও আমি এবং বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ ও বরকতউল্লাহ। একদিন একজন ইন্দোনেশীয় টেলিভিশনের অফিসার জানতে চেয়েছিলেন,

এটা আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কিনা। উত্তরে বলেছিলাম : এটা আমাদের শতকরা ৯৮ জনের পোশাক। এ ছাড়া বিশ্রামের সময় শতকরা ১০০ জনই লুঙ্গি পরে থাকেন ।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে যাওয়া হয়েছিল আমাদের। বিমান বন্দরে যারা রিসিভ করতে এসেছিলেন, প্রথমেই আমাকে চিনতে পেরেছিলেন অতিথি হিসেবে । নিশ্চয় তা ব্যতিক্রমধর্মী পোশাকের জন্যে। এছাড়া বদরুন্নেসা আবদুল্লাহকেও-শাড়ির জন্যে ।

খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে আমি আরো কিনেছিলাম খদ্দরের জহর কোট। তখন আমাদের মধ্যে পরিবর্তিত নাম চালু হয়েছিল 'মুজিব কোট'।

১২ এপ্রিল বিকেলে সেদিনের সান্ধ্য অধিবেশন রেকর্ড করা হয়েছিল সার্কিট হাউসে। রাতে পরের দিনের প্রভাতী অধিবেশন পরীক্ষামূলকভাবে গ্যারেজকক্ষে রেকর্ড করা হয়েছিল।

পরবর্তী দিনগুলোতে গ্যারেজকক্ষেই রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেটে অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হতো। সেই রেকর্ডিং কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জী নিয়ে যেতেন এবং ট্রান্সমিটিং-এর ব্যবস্থা করতেন।

একদিন ক্যাসেট ছিঁড়ে গিয়েছিল। রিগ্রেট এনাউন্সমেন্ট কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী স্বকণ্ঠে ব্রডকাস্ট করেছিলেন। পরে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে আমরা সম্ভাব্য ঘোষণার কয়েকটি 'কাট' তৈরি করে দিয়েছিলাম।

আমাদের প্রতি অনুরোধ ছিল বাইরে একা একা বের না হবার। স্থানীয় লোকদের সাথে আলাপ-পরিচয় না করার। এ ছিল আমাদেরই স্বার্থে গোপনীয়তা রক্ষা। কিন্তু কর্নেল চৌমুহনিতে লোকজনের বিপুল আনাগোনা। এই পরিবেশ গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিকূল ছিল ।

এ ব্যাপারে আমাদের নেতারা আলাপ করেছিলেন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ২০ এপ্রিল আমরা পুনর্বাসিত হয়েছিলাম জেল রোড-এর ভাড়াটে বাড়িতে। সে প্রসঙ্গ পরে। ১৩ এপ্রিল ছিল আমার পুত্র আনন্দ-র ষষ্ঠ জন্মদিন। সেদিনের সান্ধ্য অধিবেশনে সংযোজিত করেছিলাম একটি কবিতা ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কবিতাসমূহের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদঘুরে রক্ষিত। তা থেকে ৯টি কবিতা "কণ্ঠস্বর-শব্দ

সৈনিকের শিরোনামে এই গ্রন্থের অনুষংগ ২-এ সংযোজিত ।

শত্রু-কবলিত ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতাম আমরা। চেষ্টা করতাম কাউন্টার প্রোগ্রাম প্রচারের। সে রকম একটি তাৎক্ষণিক কথিকা লিখেছিলেন মুস্তফা আনোয়ার শিরোনাম 'সাম্প্রদায়িকতা : সামন্তবাদ প্রসঙ্গ'। কথিকাটির শেষ বাক্য ছিল : 'ওরা মানুষ হত্যা করছে— আসুন, আমরা পশু হত্যা করি।" এ বাক্যটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরবর্তী সময়ে স্লোগান হিসেবে প্রচারিত হতো। শ্রেষ্ঠতম স্লোগান ।

১৭ এপ্রিল আগরতলায় পৌছেছিলেন বাংলা একাডেমীর সুব্রত বড় য়া । আমার পূর্ব- পরিচিত। আবুল কাসেম সন্দ্বীপের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁকে আমাদের মধ্যে পেলে ভালোই হয়। আমাদের নাম-তালিকা ছিল সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কাছে। নতুন নাম সংযোজন তাঁদের এখতিয়ারভুক্ত।

কর্নেল চৌমুহনিতে জি পি শাও নিয়মিত আসতেন। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা নিয়ে। আবুল কাসেম সন্দ্বীপকে সাহায্য করতেন বাংলা সংবাদ বুলেটিন তৈরিতে। তাঁর কাছেই প্রস্তাবটি দেয়া হয়েছিল-সুব্রত বড় য়াকে আমাদের দলভুক্ত করার। তিনি একদিন সময় চেয়েছিলেন ।

পরের দিন হ্যাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত জানা গিয়েছিল। কেবল সুব্রত বড় য়ার প্রতি জি পি শাওর একটি বাড়তি অনুরোধ ছিল । মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতে হবে। তাঁর ছেলে- মেয়েদের অঙ্ক দেখিয়ে দিতে হবে। অল্প কিছুদিন এই বাড়তি দায়িত্বটি পালন করতে হয়েছিল সুব্রত বড় য়াকে ।

সীমান্ত অতিক্রমকালে দু'-তিন বেলা উপোস করেছিলেন সুব্রত বড় য়া । এখন তাঁর কর্মসংস্থান হয়ে গিয়েছিল। আমাদেরও শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল ।

এম আর সিদ্দিকী জিজ্ঞেস করেছিলেন : ডাক্তার শফী কি আপনার আত্মীয়?

: তিনি তো পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন। আমাকে ভাই হিসেবে দেখতেন । দীর্ঘদিনের পরিচয় । মিসেস শফীসহ আমি 'বান্ধবী' পত্রিকা চালাতাম । ঐ বাড়িতে বসেই স্বাধীন বাংলা বেতারের পরিকল্পনা করেছিলাম ।

: একটা দু:সংবাদ আছে। গতকাল কোহিনূর এসেছে-আমার স্ত্রী । শুনে এসেছে, ডাক্তার শফীর বাড়িতে ৭ এপ্রিল আর্মি গিয়েছিল। ওখানে কিছু গোলাবারুদ পেয়েছে। ওদের সবাইকে গুলি করে মেরেছে।-এম আর সিদ্দিকী

আমার কাঁধের ওপর হাত রেখেছিলেন ।

গোলাবারুদ? ২৯ মার্চ সকালে শেষ বিদায় নিয়েছিলাম মুশতারী লজ থেকে। সেদিনই বেগম মুশতারী শফী আমাকে টেলিফোনে গোলাবারুদের কথা জানিয়েছিলেন । ন্যাপ-নেতা চৌধুরী হারুন-অর রশীদ ২৭ মার্চ সন্ধ্যার পর গিয়েছিলেন। সঙ্গে লোকজন এবং এক ট্রাক গোলাবারুদ। ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। দোতলার 'টু-লেট' লাগানো ঘরটিতে সেগুলো রাখতে চেয়েছিলেন। ভয়ের কারণ নেই । ঘরটি তালাবদ্ধ থাকবে। ব্যাক ডেটে একটি ভাড়াটের দলিল স্বাক্ষর করা হবে। বাড়িওয়ালা যেন কিছুই জানেন না। ভাড়াটে মাস দু'য়েক আগে তালা দিয়ে কোথাও চলে গেছেন ।

ডাক্তার মোহাম্মদ শফী ছিলেন একজন সহজ-সরল বাঙালি । বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কে মস্কোপন্থী বা চীনপন্থী, তার ধার ধারতেন না। যিনিই জেল খেটেছেন, তিনিই তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র। যাঁরই নামে হুলিয়া আছে, তাঁকেই তিনি আশ্রয় দেবেন। চট্টগ্রাম জেলখানার ডাক্তার ছিলেন কিছুকাল। সেই সুবাদে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের প্রতি তাঁর দুর্বলতা। ডিমের খোসায় আঁকা গোর্কি আর রবীন্দ্রনাথের স্কেচ দেখেছিলাম তাঁর ঘরে। জেলখানায় পূর্ণেন্দু দস্তিদার এঁকেছিলেন। ডাক্তার মোহাম্মদ শফীকে উপহার দিয়েছিলেন।

মকবুল ছদ্মনামে দেবেন শিকদার যাতায়াত করতেন তাঁর ঘরে।

১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের কথা। উর্দুভাষীদের ওপর হামলা হয়েছিল কোথাও কোথাও । ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর প্রতিবেশী ছিলেন কয়েক ঘর উর্দুভাষী । এঁরা দাউদিয়া, ইসমাইলিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের। ভাড়াটে হিসেবে থাকতেন । মুশতারী লজের দোতলায়ও ছিলেন একদল কাবুলিওয়ালা। কিছুদিন আগে ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশপাশে কয়েকটি বিহারি পরিবারও ছিল। তাঁদের ওপরে হামলা এসেছিল । হামলা করেছিল একদল মারমুখো জনতা ।

বুক টান করে দাঁড়িয়েছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফী। এরা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। এদেশেরই নাগরিক। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু এঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি । ডাক্তার মোহাম্মদ শফী উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন : আগে আমাকে মারো। তারপর আমার প্রতিবেশীদের মারবে ।

হামলাকারীরা ফিরে গিয়েছিলেন। চৌধুরী হারুন-অর রশীদ প্রায়ই যেতেন

মুশতারী লজে । মোটা চাঁদা নিতেন । টাকাকড়ির ব্যাপারে বেশ হিসেবিই ছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফী। কপর্দকহীন এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। স্রেফ দাঁতের ডাক্তারি করে বছর দশেকের মধ্যে বাড়ির মালিক হয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন। ৭টি সন্তানের জনক হয়েছিলেন। কট্টর হিসেবি-মনটি কেমন উদার হয়ে যেতো। বামপন্থী রাজনীতিক কর্মীদেরকে টাকাকড়ি দিতেন অকৃপণ হাতে। চৌধুরী হারুন-অর রশীদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। ট্রাকভর্তি গোলাবারুদ রাখতে দিয়েছিলেন নিজের ঘরে। তথাকথিত ভাড়াটের দলিলও স্বাক্ষর করেছিলেন তাৎক্ষণিকভাবে ।

টেলিফোনে আমি অনুযোগ দিয়েছিলাম বেগম মুশতারী শফীকে। এতো বড়ো বিষয়টি আমাকে কেন বলা হয়নি। আমি তো ২৭ মার্চ গভীর রাতে বাসায় ফিরেছিলাম । পরের দু'রাতও ।

বলতে নাকি নিষেধ করেছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফী। বলেছিলেন : পরে এক সময় বলা যাবে। বেলাল এখন একটা বড়ো কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ওকে এসব বলে বিরক্ত করা ঠিক হবে না ।

টেলিফোনে বলেছিলাম : তাহলে আজ কেন বলা হচ্ছে?

:: আমি খুব ভয় পাচ্ছি। ওর সম্মতি নিয়েই এখন তোমাকে বললাম ।

বলেছিলাম : আমার পরামর্শ হচ্ছে, মেজর জিয়াকে গোলাবারুদগুলো দিয়ে দেয়া। কি কি আছে?

: তা তো জানি না । অনেকগুলো কাঠের বাক্স ।

: বেশ তো, আমি মেজর সাহেবকে বলি । তিনিই কালেক্ট করে নেবেন ।

: কিন্তু হারুন ভাই কিছু বললে? তিনি রোজই খোঁজখবর নিচ্ছেন। তাঁকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখি আগে ।

তাই হোক ।

৩০ মার্চ দুপুরে আমাদের ওপরে বিমান হামলা হয়েছিল। গোলাবারুদের বিষয়টি হয়ে পড়েছিল গৌণ ।

সেই গোলাবারুদ রাখার কারণেই ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর ওপর এসেছিল

বিপদ। কিন্তু চৌধুরী হারুন-অর রশীদ তো এখন আগরতলায় । ক্রাফটস ইনটিটিউটে তাঁদের ক্যাম্প।

আর একটা খবর পেয়েছিলাম। মিরেরশরাই রেল স্টেশন সোজা ট্রাঙ্ক রোডে দু'জন পাঞ্জাবি সৈন্য নিহত হয়েছিল । তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে হানাদার বাহিনী আশপাশের কয়েকটি গ্রামে প্রবেশ করেছিল। প্রবাহিত করেছিল রক্তগঙ্গা। ওখানেই তো মিঠাছড়া গ্রাম । আমানটোলা খানকা শরীফ । ওখানেই ছিলেন আমার স্ত্রী-পুত্র । তাহলে দেশে আর কোনো পিছু টান থাকবে না ।

এই দু'টি খবর পাবার পর কর্নেল চৌমুহনিতে বন্ধুদের বলেছিলাম : এসো, আমরা সত্যিকার ত্যাগী দেশকর্মী হয়ে যাই ।

একদিন চৌধুরী হারুন-অর রশীদ এসেছিলেন। এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করতে চান। পূর্ব পরিচয় নেই। আমি যেন পরিচয় করিয়ে দিই ।

কুঞ্জবনের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম । দুই নেতার আলোচনা হয়তো-বা গোপনীয় । আমি কক্ষান্তরে যেতে চেয়েছিলাম। চৌধুরী হারুন-অর রশীদ বাধা দিয়েছিলেন। তিনি একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন। তাঁদের দলীয় প্রায় পাঁচশ' যুবক আগরতলায় অবস্থানরত । একযোগে ওদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না ।

এম আর সিদ্দিকী সেই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। মন্তব্য করেছিলেন : ভালোই তো হয় । এখন তো আপনাদের-আমাদের বলে কিছু নেই। সবাই বাঙালি । সবাই মুক্তিযোদ্ধা। যাই হোক, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা কলকাতায় আছেন। আমি যোগাযোগ করে পরে আপনাকে জানাবো।

পরে কিন্তু একযোগে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়নি। আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপ-এর দলীয় উদ্যোগে আলাদা আলাদা মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং হয়েছিল। এ ছাড়া দেবেন শিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন দলের উদ্যোগেও পৃথকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং হয়েছিল । আগরতলার শ্রীনগরে ।

পরবর্তী সময়ে নভেম্বর মাসের দিকে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার একটি বিবৃতি বেরিয়েছিল সংবাদপত্রে। বলেছিলেন : 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘসূত্রী হলে নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হাত থেকে ন্যাপ-এর হাতে চলে যেতে পারে।' অর্থাৎ বামপন্থীদের হাতে । এই অবজার্ভেশনের মূলেই ছিল

মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পিং ।

সেদিন চৌধুরী হারুন-অর রশীদকে বিদায় দিয়ে কিছুক্ষণ কুঞ্জবনের বাড়িতে ছিলাম। এম এ হান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল ওহাব, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, ডাক্তার মান্নান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

আম আর সিদ্দিকীর সামনে আমি ও এম এ হান্নান উপবিষ্ট। তখনই ওখানে এসেছিলেন সেকান্দর হায়াত খান। এম এ হান্নানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : এই যে হান্নান ভাই, আপনাকে বারবার বলছি, আমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিন। আমি তো অলস বসে থাকতে পারি না। শুরুতে বেলাল ভাইদের সঙ্গে ছিলাম। এখন-

এম এ হান্নান বলেছিলেন : কাজ কি দেবো? কাজ তো তৈরি করা যায় না। কতো কাজ আছে— নিজেই একটা খুঁজে-পেতে নিতে পারো। এই যে, এঁরা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। আমরা ধরে নিয়ে গেলাম কালুরঘাটে। এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত রয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এম আর সিদ্দিকীর সামনেই উচ্চস্বরে বলেছিলাম : কি বললেন? ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন? আমাকে? আমাদের দশজনের একজনকেও আপনারা ধরে নিয়ে যাননি। যাদেরকে নিয়েছিলেন, তারা এখনো পাকিস্তানি বেতারেই কাজ করছেন। আমরা স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম। স্বেচ্ছায় কর্মরত আছি। আপনার মনে নেই, ২৬ মার্চ রাতে আমাদের তিনজনকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে ফেলে রেখে জিপ-এ উঠে চলে গিয়েছিলেন? কি সহযোগিতা দিয়েছিলেন সেদিন? কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করেছিলেন? আমাকেই ব্যক্তিগত চেষ্টায় তা করতে হয়েছিল। মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল।

এম আর সিদ্দিকী আমাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ঠিক নয় । চুপ করুন ।

২০ এপ্রিল ১৯৭১। জেল রোডের বাড়িতে উঠে এসেছিলাম আমরা ছ'জন। একতলা কোঠাবাড়ি। চারশ' টাকা মাসিক ভাড়া। বাড়ির মালিক অঘোর দেববর্মণ । বনমালীপুরের সি-পি-আই দলের এম-এল-এ। আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছিলেন জি পি শাও। বাড়ির চাবি হস্তান্তর করেছিলেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর একজন। নাম দেশমুখ । কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ বানার্জীও উপস্থিত

ছিলেন ।

এ বাড়িতে পদার্পণের পূর্বাহ্নেই আমাদের নাম পালটানো হয়েছিল । আমি নামগ্রহণ করেছিলাম লালমোহন। আমার বাল্যস্মৃতিসমৃদ্ধ প্রিয় নাম। সন্দ্বীপের মুসাপুর গ্রামের লালমোহন সেন ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কনিষ্ঠতম (?) সদস্য। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন লালমোহন সেন। ১৬ বছর কারাভোগের পর ১৯৪৬-এ মুক্ত হয়েছিলেন। বাইরে তখন ভারত-বিভাগপূর্ব সাম্প্রদায়িক চেতনার হিড়িক। সন্দ্বীপেও তার রেশ গিয়ে পৌঁছেছিল। লালমোহন সেনের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল 'হিন্দু-মুসলমান শান্তি কমিটি'। সন্দ্বীপ টাউন হলে কমিটির প্রথম সভায় লালমোহন সেন সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন । আমার আব্বা ইয়াকুব পেশকার সে বক্তৃতা শুনেছিলেন। আম্মার কাছে এসে প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন : আমাদের দেশ গ্রামের গৌরব লালমোহন ।

আমার তখন দশ বছর বয়স। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র । একদিন আব্বা বাড়িতে ছিলেন। আমরা বাড়ির সামনে বড়ো পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আধমাইল দূরে উত্তর দিকে বারইটোলা । মাঝে বিশাল চাষাবাদের জমি। বারইটোলার পানের বরজ দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখা গিয়েছিল অগ্নিশিখা। দাঙ্গাবাজরা বারইটোলায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল বাল্যের উল্লাস। আব্বা এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিলেন ।

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিলেন একজন পথচারী । আব্বাকে দেখে একটু থেমেছিলেন। বলেছিলেন : পেশকার সাহেব, লালমোহন ধরা পড়েছে ধোপার হাটের কাছে ।

: বলেন কি!

: সাথে আরো কয়েকজন ছিল। ভেগে যেতে চেয়েছিল। গুপ্তছড়া ঘাট দিয়ে। আব্বা বলেছিলেন : কিন্তু ও-পথে ওরা গেলো কেন? সেনের হাট থেকে সোজা পথে না গিয়ে?

: পালিয়ে যেতে হলে বেপথু যেতে হয় তো! জানেন, ওদের হাতে পিস্তল ছিল। সহসা আব্বার কণ্ঠস্বর চড়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন : পিস্তল? হারামজাদার স্বভাব পাল্টায়নি। এতোদিন জেল খেটেও জেলের সাধ মেটেনি। আপনি তো ওদিকেই যাচ্ছেন। থানায় দিয়ে দিতে বলবেন হারামজাদাকে ।

ঐ বয়সেই আমি চমকে গিয়েছিলাম। আগে যার এতো প্রশংসা করেছিলেন, তাঁকে কেন এতো গালিগালাজ! আব্বার পিছু পিছু আমরা বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিলাম । আব্বাকে চোখ মুছতে দেখেছিলাম। আম্মাকে ডেকে বলেছিলেন খবরটা। বলেছিলেন : থানায় দেবার পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু কে কার কথা শুনবে! যদি থানায় দেয়, তবে ছেলেটা প্রাণে বাঁচবে ।

দাঙ্গাবাজদের হাতে লালমোহন সেন নিহত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বিপ্লবী লালমোহন' গ্রন্থে কমরেড মুজফফর আহমদের একটা লেখা পড়েছিলাম । শিরোনাম 'পাছে না ভুলে যাই'। ওতে এই কথাগুলো ছিল : 'লালমোহন সেনের মৃত্যু ব্যক্তিগতভাবেও আমার প্রাণে বেজেছে। এজন্যে যে, তার দেশ সন্দ্বীপ আমারও দেশ । শুধু কি তাই? তার গ্রাম মুসাপুর আমারও গ্রাম ।'

সেই লালমোহন নাম ধারণ করেছিলাম আমি। 'বেলাল মোহাম্মদ'-এর অপভ্রংশ করেও ঐ প্রিয় নামটি পাওয়া যায় ।

সহকর্মীদের কাছে আমার ডাকনাম হয়েছিল 'মোহনদা'। শশধর দত্তের 'দস্যু মোহন' ছিলেন আমার ছেলেবেলার প্রিয় নায়ক ।

মুস্তফা আনোয়ার নাম নিয়েছিলেন 'শক্তি'। প্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নামে । আবুল কাসেম সন্দ্বীপ 'সুভাষ'। সুব্রত বড় য়া 'সুনীল'। পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা কবি- সাহিত্যিকদের নামে ।

একজন মাসী-মা নিযুক্ত হয়েছিলেন রান্নাবান্নার কাজের জন্যে। তাঁর ছেলে দুলাল বাজার করার দায়িত্বে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। পরিচ্ছন্ন মহিলা। খাবার পরিবেশনও করতেন মাতৃবৎ ।

খরচপত্রের জন্যে দেশমুখ আমার হাতে এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন। জনপ্রতি প্রতিবেলা ৩ টাকা হারে খরচ বরাদ্দ হয়েছিল। মাসীমা এবং দুলালও এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। এই টাকা শেষ হলে আবার টাকা দেয়া হবে। দৈনিক আটজনের জন্যে প্রায় পঞ্চাশ টাকা । যা বাঁচবে, তাতে আমাদের অন্যান্য খরচ মেটানো হবে ।

এই বাড়িতে প্রত্যেক শোবার ঘরে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর প্রতিমা। অফিসকক্ষে সদ্যনির্মিত আসবাবপত্র। চেয়ার-টেবিল সবই কেরোসিন কাঠের তৈরি ।

বাড়িটাতে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। সবাই জানতো এটি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর বাড়ি। বি-এস্-এফ-এর পাবলিসিটি বিভাগের অফিস ।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ খেতে বসে মাসীমাকে ডেকেছিলেন পানির জন্যে-

: মাসীমা, পানি ।

যেন চমকে উঠেছিলেন মাসীমা। বলেছিলাম : আমাদের সুভাষ তো বহুদিন ইউ- পিতে ছিল। ওখানে জলকে পানি বলা হয়- মুসলমানদের মতো। বুঝলেন, মাসীমা?

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে প্রতিমার উদ্দেশ্যে জোড়হাত করা এবং প্রণামের ভঙ্গিটি আমরা রপ্ত করেছিলাম পারস্পরিক সহযোগিতায় ।

২০ এপ্রিল রাতেই চকমপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছিল। 'আকাশবাণী'র খবর শুনছিলাম সবাই বসে। সংবাদ বুলেটিনের মধ্যেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল : 'এই খবরের পরপরই এখানে শ্রুত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ভাষণ পুন:প্রচার করা হবে।'

চকিতে কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছিলেন শারফুজ্জামান। সম্পূর্ণ ভাষণটি রেকর্ড করে নিয়েছিলেন ক্যাসেটে । সমগ্র সময়টুকু আমরা ছিলাম নিশ্চুপ । অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণটি আমাদের পরবর্তী দু'-তিনটি অধিবেশনে প্রচার করা হয়েছিল। পুন:প্রচারের ঘোষণা সহকারে। এ ছিল মুজিবনগরে ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠনের পর দেয়া ভাষণ। 'আকাশবাণী' থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বরাত দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল । নীতিশুদ্ধভাবে ।

অল ইন্ডিয়া রেডিও-র শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে ভাষণ প্রচার করেছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। সেটা আরো আগে। এপ্রিলের প্রথম দিকে (১২)। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের একটি অতিরিক্ত (স্পেয়ার) ট্রান্সমিটার এজন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণ প্রচারের তাগিদে ট্রান্সমিটারটির নাম ঘোষণা করা হয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' । তখন থেকে ট্রান্সমিটারটি নিবেদিত হয়েছিল নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারের জন্যে । মিডিয়াম ওয়েভে ট্রানজিস্টার সেটে আমরা একদিন পেয়ে গিয়েছিলাম। ঘোষণা শুনেই চমকে উঠেছিলাম । 'সোয়াধীন বাংলা বেয়তার কেনদর' পরিষ্কার একটি অবাঙালি কণ্ঠ নাম-ঘোষণার পর শুরু হয়েছিল ভারতীয় শিল্পীদের গাওয়া গান

। সুনির্বাচিত সব জনপ্রিয় রেকর্ডের গান। মাঝে মাঝে কেন্দ্রের নাম-ঘোষণা। এ ছাড়া মুক্তিবাহিনীর জোয়ানদের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসাহকর আহ্বান । পাকিস্তানি হানাদারদের নিন্দা । ছোট ছোট ঘোষণা কণ্ঠস্বরটি কোনো অবাঙালির। দারুণ বিভ্রান্তিকর ব্যাপার।

নিশ্চয় কোনো শক্তিশালী ট্রান্সমিটার । আমাদের তা-ই ধারণা হয়েছিল। দু'দিন ধরে সেই তথাকথিত 'সোয়াধীন বাংলা বেয়তার কেনদর'-এর অনুষ্ঠান টিউন করে আমরা আতঙ্কিত হয়েছিলাম। শ্রোতাদের কাছে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবধারিত। বিশেষ করে শত্রুপক্ষের জন্যে অপপ্রচারের সুবর্ণ সুযোগ। ভারতীয় এলাকা থেকে বেতার কেন্দ্র চালাবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ট্রান্সমিটারটি অচিরেই বন্ধ করে দেয়া দরকার ।

বিষয়টি আমি এম আর সিদ্দিকীকে জানিয়েছিলাম । তিনি প্রথমে মন্তব্য করেছিলেন: আমাদের সংগ্রামের কথা যতো বেশি প্রচার হয়, ততোই তো ভালো ।

: তা ঠিক। কিন্তু আমরা ভারতীয় এলাকা থেকে রেডিও চালাচ্ছি, নীতিগতভাবে এটা শ্রোতাদের বুঝতে দিতে চাই না। তাই কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকি। আমাদের সব গান বাংলাদেশে উৎপন্ন। আমাদের ভাষা ও একসেন্ট পূর্ববঙ্গীয় । আমরা এখানে যে ক'জন আছি, আমরা তো সবাই ব্রডকাস্টার ছিলাম না। আমাদের কারো কারো কণ্ঠ নর্মাল বেতারের জন্যে আদৌ স্যুটেবল নয় । অডিশনে নির্ঘাত ফেল করতাম। তবু আমরা ভয়েস থ্রো (Voice Throw) করে যাচ্ছি। এটাই অথেনটিসিটি যে, বাংলাদেশের নাগরিকরাই স্বাধীন বাংলা বেতার চালাচ্ছে।

এম আর সিদ্দিকী বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। একদিন সময় নিয়েছিলেন খোঁজখবর নেবার জন্যে । পরের দিন আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। সঙ্গে আমাদের প্রোগ্রাম ম্যাটারিয়েলস ফাইলটি নিয়ে ।

আগরতলা শহরেরই একটি অফিস ভবন। কামান চৌমুহনিতে। কোনো সাইনবোর্ড ছিল না ভবনটিতে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বিপরীত দিকে এম আর সিদ্দিকী অফিসারটির মুখোমুখি বসেছিলেন। আমি পেছনের সারির একটি চেয়ারে। হাতে ফাইল । অফিসারটি বলেছিলেন : আপনার জন্যেই আমি আজ এসেছি। আজ আমাদের ছুটির দিন।

: দুঃখ প্রকাশ করবো না। আপনারা তো সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছেন আমাদের বিপদের দিনে। আমরা আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না। কথা হচ্ছে, আমরা কিছুদিন থেকে শুনতে পাচ্ছি, খুব পাওয়ারফুল একটা ট্রান্সমিটার থেকে আপনারা আমাদের ফেবারে কিছু ঘোষণা আর গান প্রচার করছেন।

: খুব পাওয়ারফুল ট্রান্সমিটার নয় কিন্তু ওটা। ওটা মিডিয়াম ওয়েভ। লোকালি ভালো রিসেপশন হয়। স্পষ্ট শোনা যায়।-অফিসারটি বলেছিলেন।

এম আর সিদ্দিকী বলেছিলেন : আপনারা তো আমাদেরকে একটা শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার দিয়েছেন। সেটা থেকে নিয়মিত আমাদের ছেলেরা প্রোগ্রাম করে থাকে ।

: কি প্রচার করেন আপনারা?

এম আর সিদ্দিকী আমার হাত থেকে ফাইলটি নিয়েছিলেন। খুলে পাতা উল্টে উল্টে এক-একটা কথিকার নাম পড়ে যাচ্ছিলেন। ফাইলটি এই প্রথম দেখেই তিনি বিজ্ঞের মতো বলে চলেছিলেন : এই যেমন দৈনন্দিন সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ, স্লোগান। এই যে কথিকার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। 'বাংলার কথা', 'জনগণের জয়', 'মুক্তিযোদ্ধাদের শপথ', 'সংগ্রামী বাংলা' 'সংগ্রামের অনির্বাণ শিখা', 'কেন এ মুক্তিযুদ্ধ' ইত্যাদি। আরো আছে পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে 'জনমত' অনুষ্ঠান । এই সবই প্রচার হয়ে গেছে। এঁরা নতুন নতুন লিখছেন প্রতিদিন। আর সংগ্রামী গান ।

: বেশ তো! মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারটির ব্যাপারে কি বলতে চান?-অফিসারটি প্রশ্ন করেছিলেন।

: অনুরোধ করতে চাই, মিডিয়াম ওয়েভ থেকেও আমাদের এসব স্পোকেন ওয়ার্ড আইটেম প্রচারের ব্যবস্থা করা যায় কি না !

: আপনারা এসব কিভাবে সরবরাহ করবেন?

এম আর সিদ্দিকী আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম : আমরা সব অনুষ্ঠান ক্যাসেটে রেকর্ড করি । সে রেকর্ড প্লে করা হয় শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে । তারই কপি নিয়মিত সরবরাহ করতে পারি ।

অফিসারটি বলেছিলেন : কিন্তু ক্যাসেট প্লে করার ব্যবস্থা তো আমাদের স্টুডিওতে নেই । আসলে জানেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রচারের জন্যেই মিডিয়াম ওয়েভটি চালু করা হয়েছিল। তারপর থেকে একজন অপারটেরকে দিয়েই এভাবে চালু রাখা হয়েছে। ওতে নতুন আইটেম সংযোজন করার কোনো প্ল্যান আমাদের নেই । সম্ভবও নয়। তা ছাড়া কভারেজ তো খুবই কম। বর্ডার ক্রস করে বাংলাদেশে ও-শব্দ পৌঁছায় বলে মনে হয় না। আমরা না হয় ট্রান্সমিটারটি এখন থেকে বন্ধ করেই দেবো। কি বলেন?

পরদিন থেকে সেই বিভ্রান্তিকর ঘোষণা এবং আমাদের কেন্দ্রের নাম ঘোষণার মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীত আর শোনা যায়নি ।

দেশমুখ জানিয়েছিলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ। বৈকালিক চা খাওয়ার। ওখানে আসবেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্টেটমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথী! তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত।

জিজ্ঞেস করেছিলাম : আমরা কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবো?

: নিশ্চয় পারবেন।

সেটা ছিল ২৮ বা ২৯ এপ্রিল। কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জীর সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। শচীন সিংহ। স্থূলদেহী প্রবীণ নেতা। হেডমাস্টারসুলভ বাকভঙ্গি । প্রত্যেকের নাম-গ্রাম-থানা আর বাপের নামের ফিরিস্তি জেনে নিয়েছিলেন । আমাদের মধ্যে সিলেটের কেউ নেই দেখে হতাশ হয়েছিলেন ।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়-পর্ব শেষ হবার পর পরই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এসে পৌছেছিলেন। বসবার ঘরটি লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। শচীন সিংহের এক পাশে বসেছিলেন নন্দিনী সৎপথী, অন্য পাশে একজন মুণ্ডিতমস্তক সুদর্শন প্রবীণ । তিনি ছিলেন ড. ত্রিগুণা সেন। পরে দেখেছিলাম, মাথা মুণ্ডিত নয়, আসলে এক গাছিও চুল নেই । সম্পূর্ণ টাক ।

দাঁড়িয়ে একটা কথাই আমি বলেছিলাম : ম্যাডাম,আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অনুষ্ঠান প্রচার করছি। কিন্তু টার্গেট এরিয়া কভার করছে না। বাংলাদেশের সর্বত্র আমাদের কণ্ঠ পৌঁছচ্ছে না। কারণ ট্রান্সমিটার খুব কম পাওয়ারের। আরো হচ্ছে শর্টওয়েভ। আপনার কাছে আমরা একটি পাওয়ারফুল ট্রান্সমিটার

চাই। সম্ভবপক্ষে মিডিয়াম ওয়েভ।

নন্দিনী সৎপথী কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : তোমাদের একজাইল গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, একটা মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার দেয়া হবে ।

ত্রিশ কাপ চা পরিবেশিত হয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকটি কাপের হাতল ভাঙা। তখন ভর সন্ধ্যা । হঠাৎ করে চলে গিয়েছিল বিদ্যুৎ।ড. ত্রিগুণা সেন মুখ্যমন্ত্রীর পিঠে চাপড় বসিয়ে বলেছিলেন : কি মন্ত্রিত্ব করছ? মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে কারেন্ট চলে যায়!

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির লন-এ ড. ত্রিগুণা সেন আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন। লোকজনের জটলা থেকে সরে এসেছিলেন এক প্রান্তে। বলেছিলেন : ইয়ংম্যান, কাজ করে যাও। পয়লা নভেম্বরে ঢাকায় বিজয় উৎসব হবে। জানো, ১৯৪৯ সালে আমরা 'বাংলাদেশে সেল' প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। তখন থেকে আমি ঐ সেল-এর দায়িত্বে। এতোদিন পরে দুই নদীর স্রোত মিশেছে এক মোহনায়।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম মুখোমুখি । বলেছিলাম : স্যার, আমি পাকিস্তান বেতারে স্ক্রিপ্ট রাইটারের কাজ করতাম । "সিগনিফিক্যান্ট' নামে একটি কনফিডেন্সিয়াল তথ্য-পত্রিকা আমাকে দেয়া হতো কাউন্টার প্রোগ্রামের ডাটা হিসাবে ব্যবহারের জন্যে । বলা হতো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারত চাইছে, কি করে পাকিস্তানকে ভেঙে দেয়া যায় । আপনারা ১৯৪৯ সালে 'বাংলাদেশে সেল' গঠন করেছেন। তাহলে তো ঐ ডাটাটি মিথ্যা নয় ।

ড: ত্রিগুণা সেন অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : ছি, এসব বলতে নেই, খোকা!

পরবর্তী সময়ে অক্টোবরের মধ্যভাগে ড. ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা বাংলাদেশ মিশনের সামনে রাস্তায়। তিনি গেট দিয়ে বের হচ্ছিলেন, আমি ভেতরে যাচ্ছিলাম । প্রণাম জানিয়ে সামনাসামনি দাঁড়িয়েছিলাম ।

: এই যে, খোকা, তোমরা তো এখন কলকাতাতেই আছ। কেমন আছ?

: ভালো আছি,স্যার। কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, পয়লা নভেম্বর ঢাকায় বিজয়- উৎসব হবে। আর তো দশ-পনেরো দিন বাকি পয়লা নভেম্বরের। লক্ষণ কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন ড. ত্রিগুণা সেন । বলেছিলেন : তা কথাটা আমি কখন বলেছিলাম, হে ?

: এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে, স্যার! আগরতলায় ।

: হ্যাঁ। আমি তো আর জ্যোতিষীর মতো ভবিষ্যদ্বক্তা নই। সেটা ছিল পলিটিক্যাল এজাশন । যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন হয়েই থাকে অহরহ। তবে এখন আবার বলছি, পয়লা নভেম্বরের আর বিলম্ব নেই। কিন্তু মিডল অব ডিসেম্বর? আশা করি এর মধ্যে পর্যাপ্ত সময়ের মার্জিন আছে। ওয়েট এন্ড সি।

ড. ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল ঢাকায় স্বাধীনতার কিছুকাল পর। কাজী হাবিউদ্দীন আহমদের পিতা জনাব কে জি আহমদ তাঁর সম্মানে 'ডিনার' দিয়েছিলেন । গোপীবাগের চিওড়া হাউসে। তাঁর ফরমায়েশ অনুযায়ী চাঁদপুর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল বিশাল চিতল মাছ এবং গলদাচিংড়ি। আমাদের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিয়ে খেতে চেয়েছিলেন। হার মেনে আনন্দ পেয়েছিলেন ।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আগরতলায় এসেছিলেন এয়ার মাহমুদ। কুঞ্জবনের বাড়িতে উঠেছিলেন। জহুর আহমদ চৌধুরীর স্নেহভাজন ছিলেন। এযার মাহমুদ ভারত বিভাগের আগে রেড-কার্ড হোল্ডার ছিলেন। পিতৃনিবাস ছিল চট্টগ্রাম শহরের পাঠানটুলির কাপড়িয়া পাড়া। তিনি পিতার ত্যাজ্যপুত্র ছিলেন। স্বাভাবতই প্রলেতারিয়েত। ১৯৫২-৫৩ সালে আমার সঙ্গে পরিচয়। আমি তখন চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম বর্ষ ক্লাসের ছাত্র। দৈনিক আজান পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে টাকা ৬০/- বেতন পেতাম । থাকার জায়গা খুঁজছিলাম। এককালের খাকসার এবং তখনকার চট্টগ্রাম তমদ্দুন মজলিশের প্রাণ আজিজুর রহমান ছিলেন আমাদের 'আজিজ ভাই'। দলমতনির্বিশেষে সকলের। আজিজ ভাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আমার থাকার । মোমিন রোডে তমদ্দুন মজলিশের অফিসঘরে। ঘরের পেছন দিককার কক্ষে । একটি জরাজীর্ণ তক্তপোষ। সাধারণভাবে বিছানা পাতা। বলেছিলেন, অন্য একজন ওখানে রাতে ঘুমান । আমি ডবলিং করতে পারি । আমি রাত ১০টায় এ বিছানায় ঘুমিয়ে যেতাম । মধ্যরাতে টের পেতাম কেউ একজন পাশে এসে শুয়েছেন। ভোরে ঘুমন্ত শয্যাসঙ্গীকে দেখতাম। তারপর আমি বেরিয়ে পড়তাম। কথা হতো না তাঁর সঙ্গে। তিনিই ছিলেন এয়ার মাহমুদ। 'বেনামি চৌধুরী' ছদ্মনামে নাট্যমঞ্চে কমিক দেখাতেন। দশ-বিশ টাকা পেতেন। ওতেই এক-পেটের সংস্থান হতো ।

সন্দ্বীপ থেকে ছুটি কাটিয়ে ফিরেছিলাম একদিন বিকেলে। তমদ্দুন মজলিশের অফিসের সামনে এয়ার মাহমুদ বসে ছিলেন। মুখচোখ শুকনো। আম্মার দেয়া চিড়া ও পাকাকলা সঙ্গে ছিল। খাবেন কি না, জিজ্ঞেস করতেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গোগ্রাসে শুকনো চিড়া গিলেছিলেন। তিন বেলা খাওয়া হয়নি। নাট্যমঞ্চের কমিক প্রদর্শনের কাজ পাননি ।

পকেট উজাড় করেও এয়ার মাহমুদ ঢোলা পায়জামা আর চুড়িহাতা কোর্তা ধোপদুরস্ত রাখতেন। কমদামি সিগারেট খেতেন ।

আজিজ ভাইয়ের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল 'পাক-লোকশিল্পী পরিষদ'। ওতে আমি দপ্তর সম্পাদক ছিলাম । এয়ার মাহমুদ ও সাদেক নবি নাট্য পরিচালক। চিরঞ্জীব দাশশর্মা ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক। আজিজ ভাই তমদ্দুন মজলিশের প্রধান উপদেশক হয়েও লোকশিল্পী পরিষদে সমাগম ঘটিয়েছিলেন দলমতের ঊর্ধ্বে শিল্পী-কুশলীদের। আমি নিজেই ছিলাম ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য। চট্টগ্রামে সেবছরেই লাভ লেনে মাসিক সীমান্ত অফিসে এক রাতে প্রথম কমিটি গঠিত হয়েছিল। অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম ছিলেন নৈশ বৈঠকের সংগঠক।

পাক লোকশিল্পী পরিষদ ছায়ানাট্য মঞ্চস্থ করে চট্টগ্রামে বিশেষ অবদান রেখেছিল । ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনদিনব্যাপী কার্জন হলে। সে উপলক্ষে চট্টগ্রামে আবুল ফজলের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম সাবকমিটি গঠিত হয়েছিল। আমি সেই কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলাম। সাহিত্য সম্মেলনে পাক লোকশিল্পী পরিষদের ছায়ানাট্য পরিবেশিত হয়েছিল— 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা'। সংলাপ প্রধানত আজিজুর রহমানের লেখা। গানগুলো ছিল আমার রচিত। কোরাসে আমার কণ্ঠও ছিল। সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন এয়ার মাহমুদ। ছায়ানাট্যের প্রধান বিষয় আলোক-নিয়ন্ত্রণ। সেই দায়িত্ব ছিল এয়ার মাহমুদের। তিনি আই-পি-টি- এ-র অনুষ্ঠান দেখেছিলেন দলীয় কর্মী হিসেবে কলকাতায় । ভারত বিভাগের আগে । সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। এছাড়া নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন স্যুইচ-ফিট-করা লাইট বক্স-এর। মোটের গাড়ির হেড লাইটের বাল্ব ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন আজিজুর রহমান ।

'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা' ছায়ানাট্যের শেষ দৃশ্য ছিল একটি গানের চিত্রায়ণ । গানের বাণীতে আমি চাষী-শ্রমিক-কেরানির ঐক্য ঘোষণা করেছিলাম। ছায়া-অভিনয়ে আমি ছিলাম খাতা-বগলে করণিক। ওবেইদ জাগীরদার ও শাহাদাত

ফকির হাতুড়ি ও কাস্তে হাতে শ্রমিক ও চাষী। তাঁরা পর্দায় হাতুড়ি কাস্তে একসাথে জুড়ে দিয়েছিলেন।

পরের দিন 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার প্রথম পাতায় ঐ দৃশ্যকে ব্যঙ্গ করে খবর মুদ্রিত হয়েছিল। খবরটি ছিল রেখাবন্দি, বক্স-এ। অর্থাৎ গুরুত্ব পেয়েছিল আমাদের ছায়ানাট্য প্রদর্শনী ।

গুরুত্ব পেয়েছিল বিদগ্ধ দর্শকদের কাছেও। মঞ্চে উঠে এসেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান । আলোক-নিয়ন্ত্রণ বা প্রক্ষেপণের কৌশলটি জেনে নিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি হারিকেনের সাহায্যে পর্দায় ছায়া ফোটাবার প্রয়াস করেছিলেন । নিজের মতে, সেটা ছিল অসফল ।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় আমি ছিলাম ছাত্রকর্মী। তখন এয়ার মাহমুদের সঙ্গ পেয়েছিলাম অহরহ। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে চট্টগ্রামের লোকাল ট্রেনে একই কম্পার্টমেন্টে ভ্রমণ করেছিলাম। গন্তব্য ছিল অধ্যক্ষ আবুল কাসেমের নির্বাচনী এলাকা । আমি ও এয়ার মাহমুদ ট্রেনের কামরা থেকে মাইকে শেরে বাংলার নৌকা মার্কা বাক্সের ঘোষণা প্রচার করেছিলাম।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর। এয়ার মাহমুদের মাথায় এসেছিল পরিকল্পনাটি। যদি একটি ডুপ্লিকেটিং মেশিন পাওয়া যেতো, রাতারাতি লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করা যেতো। তখন তো কোনো ছাপাখানাতেই সরকারবিরোধী প্রচারপত্র মুদ্রণ অসম্ভব ।

জনাব মোহাম্মদুন নবি চৌধুরী সাড়ে পাঁচশ' টাকা দিয়েছিলেন এবং একটি জিপ । সদরঘাট রোডে বিক্রয় কেন্দ্র। আমি ও এয়ার মাহমুদ নিচের তলায় স্টোর-রুমে গিয়েছিলাম গেটোর মেশিন দেখে নিতে। আর অপর সঙ্গী ওবেইদ জাগীরদার কাউন্টারে ক্যাশ-মেমোতে করেছিলেন স্বাক্ষর। আমার চট্টগ্রাম কলেজের সহপাঠী ওবেইদ জাগীরদার। কোতয়ালী থানার ও-সি-র ছোট ভাই। কাগজ পেলেই স্বাক্ষর করার প্রবণতা ছিল তাঁর।

জিপকে পর্দাঢাকা করে চট্টগ্রামের শহরতলিতে আমাদের চলাচল। কখনো এ-পাড়ায়, কখনো ও-পাড়ায়। রাতে কোথাও থেমে স্টেনসিলে প্রচারপত্র লিখে ডুপ্লিকেটিং মেশিনে ছাপানো হতো। তারপর পৌঁছিয়ে দেয়া হতো আজিজুর রহমান কিংবা রফিকউল্লাহ্ চৌধুরীর কাছে। তাঁরা বিতরণের ব্যবস্থা করতেন।

চাঞ্চল্যকর বক্তব্য ছিল সে-সব লিফলেট-এ। তখন চট্টগ্রামের ডি-আই-বির ও-সি ছিলেন সানোয়ার আলী । আমাকে খুব ভালোবাসতেন। বলতেন : সরকারবিরোধী হও, ক্ষতি নেই— কিন্তু রাষ্ট্রবিরোধী হয়ো না। তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন, লিফলেট-এর হস্তান্তর ধরা পড়ে যেতে পারে। হস্তাক্ষর যেন পাল্টানো হয় । আমার ও এয়ার মাহমুদের হস্তাক্ষরে লিফলেট লেখা হতো। এবারে একটি লিফলেট লিখেছিলেন তফাজ্জল আলী ।

কিন্তু হস্তাক্ষর সনাক্ত হয়ে গিয়েছিল ওবেইদ জাগীরদারের । গোয়েন্দা বিভাগ প্রথমে শহরের সব ক'টি গেটেটনার মেশিনের হদিস নিয়েছিলেন অফিসে অফিসে গিয়ে । ডুপ্লিকেটিং পেপার বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আমরা শেষের দিকে কর্ণফুলী পেপার ব্যবহার করতাম। মেশিনে একসঙ্গে দু-তিনটি বেরিয়ে আসতো। সবশেষে সদরঘাট রোডের বিক্রয় কেন্দ্রে ক্যাশমেমো-তে স্বাক্ষরের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল ওবেইদ জাগীরদারের ।

চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার কোতোয়ালি থানার ও-সি এল আর জাগীরদারকে তলব করেছিলেন। তাঁরই তো ভাই ওবেইদ জাগীরদার। আমাকে এবং এয়ার মাহমুদকে না জড়িয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছিল। ওবেইদ জাগীরদার কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে মেশিনটি কিনতে মধ্যস্থতা করেছিলেন। দু'পয়সা কামাই করেছিলেন। এই বলে গোঁজামিল দিয়েছিলেন পুলিশ সুপারের কাছে ।

গেটেটনার মেশিনটি তমদ্দুন মজলিশের তফাজ্জল আলীর তত্ত্বাবধানে চলে গিয়েছিল। সেটা ছিল ১৯৫৪ সালের কথা ।

১৯৬৪ সালে আমার বেতারের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। তখন এয়ার মাহমুদ বেকার। বেশ কিছুদিন আমার বাসায় ছিলেন। মাঝখানে তাঁর পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল । তিনি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন। মাসুদা নবির ছোট বোনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন । মাসুদা নবি বান্ধবী সঙ্ঘের সদস্য। সেই সূত্রে ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর বাড়িতে আনাগোনা ছিল এয়ার মামুদের। ২৭ মার্চ '৭১-এ তিনি কালুরঘাট ট্রান্সমিটারেও গিয়েছিলেন।

কুঞ্জবনের বাড়িতে গিয়ে এয়ার মাহমুদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ৭ এপ্রিল '৭১ তিনি মুশতারী লজে ছিলেন। অনেকেই ছিলেন। সৈয়দ জিল্লুর রহমানের ছোট ভাই সস্ত্রীক এবং বৃদ্ধা আম্মাও ছিলেন। মাসুদা নবি ছিলেন। তাঁর দেওর শাফাউন্নবী ছিলেন। সকালবেলা এসেছিল সামরিক বাহিনীর লোক।

বসবার ঘরের দেয়ালে বেগম মুশতারী শফীর পিতার ছবি ছিল। আর ছিল লেনিনের ছবি। পিতা খোন্দকার নাজমুল হক আনসারী ডি-এস-পি ছিলেন। দাড়িবিহীন ছবি দেখে হানাদারদের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। লেনিনের পরিচয় দেয়া হয়েছিল 'বড়ো ভাই' বলে। মুখে দাড়ি থাকায় ওদের কাছে ‘ইমানদার' সাব্যস্ত হয়েছিলেন। উভয়কে তলব করা হয়েছিল । বেগম মুশতারী শফী জানিয়েছিলেন যে ওঁরা উভয়েই প্রয়াত। বাপ-বেটা দুজনই মৃত? হানাদারদের কাছে এ ছিল বিস্ময়কর। একে একে সবাইকে পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর হাতে দেয়া হয়েছিল একটি অভিযোগ-পত্র! স্থানীয় অবাঙালিদের স্বাক্ষর ছিল ওতে। অভিযোগগুলো ছিল, এ-বাড়িতে আওয়ামী লীগের সভা হতো, হিন্দু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জলসা হতো, জয় বাংলা রেডিও'র কর্মীরা এখানে ছিল, ডাক্তার শফী ভারতের গুপ্তচর, মিসেস শফী আওয়ামী লীগের লিডার এবং রাজবিরোধী মিছিল করেছেন ইত্যাদি ।

উত্তরে কথা বলেছিলেন বেগম মুশতারী শফী। উর্দুতে। প্রতিবাদ করেছিলেন যাবতীয় অভিযোগের। হানাদারদের হাতে ছিল একটি পেপার কাটিং। ওতে চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনে মেয়েদের মিছিলের দৃশ্য। পুরোভাগে বেগম মুশতারী শফী হানাদার দলপতির মতে, বেগম মুশতারী শফী নিশ্চয় আওয়ামী লীগের লিডার । নইলে কোনো বাঙালি আওরাত তাদের সামনে এতো সাহস করে কথা বলতে পারে না ।

হানাদাররা ডাক্তার মোহাম্মদ শফীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল । চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে । ওখানে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার বেগ। দাঁতের রোগী ছিলেন তিনি। তাঁর চিকিৎসককে ধরে আনা ঠিক হয়নি। সসম্মানে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল ।

ঘরে ফেরামাত্রই মুশতারী শফী বলেছিলেন : ডাক্তার, আর এক মুহূর্ত নয়। চলো, আমরা ঘর ছেড়ে পালাই ।

: কোথায় যাবো? এখন তো আর ভয় নেই ।

ঘণ্টা দু'য়েক পরেই আবার এসেছিল হানাদারের আর একটি দল । লক্ষ্য, দোতলার ঘর তল্লাশি করা।

বলা হয়েছিল : ওপরের ঘরে কেউ নেই। ভাড়াটে মাস দু'য়েক আগে তালা দিয়ে কোথায় চলে গেছেন! এই যে ঘর ভাড়ার দলিল ।

তালা ভাঙা হয়েছিল দোতলার ঘরের। কিছুই ছিল না আসবাবপত্র। শুধু কয়েকটি কাঠের বাক্স। গোলাবারুদের বাক্স। বাক্সের গায়ে লালকালিতে জ্বলজ্বল করছিল- লেখা '২৭ মার্চ ১৯৭১'। লেখাটি ইংরেজি হরফে।

এর পরে হানাদার দলপতির কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দেবার উপায় ছিল না। সব বাক্স ধরাধরি করে নিচে নামানো হয়েছিল বাড়ির লোকদের দিয়েই। তাঁদের একজন বেগম মুশতারী শফীর একমাত্র ছোট ভাই । খোন্দকার এহসানুল হক আনসারী । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স শেষ বর্ষ ক্লাসের ছাত্র। খোন্দকার এহসানুল হক আনসারী এবং ডাক্তার মোহাম্মদ শফী। এই দুজনই মুশতারী লজের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্য। এই দুজনকেই এবারে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । আর ফিরে আসেননি তাঁরা।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্র থেকে একটি সিরিজ প্রচারিত হতো— 'যাদের হারায়ে খুঁজি'। পাঠক ছিলেন মাহবুব হাসান। ঐ সিরিজে আমার লেখা এই কথিকাটি প্রচারিত হয়েছিল :

: মানুষটি হারিয়ে গেলো। আর পেলাম না! — স্বামীর ছবিটি দেখতে দেখতে কথা ক'টি উচ্চারণ করলেন সাত সন্তানের মা বেগম মুশতারী শফী।

গত বছরের ৭ এপ্রিল চট্টগ্রামের বিশিষ্ট দন্ত্য চিকিৎসক ডা. এম শফীকে তাঁর এনায়েত বাজারের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পাকিস্তানি দখলদার সৈন্যরা। একই সঙ্গে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তাঁর একমাত্র শ্যালক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খোন্দকার এহসানুল হক আনসারীকে। ওরা আর ফিরে আসেননি I ওদের খবর কেউ বলতে পারে না।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন ডা. এম শফী। আপন পেশায় আত্মনিয়োগের জন্য চট্টগ্রামকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন এবং সেখানেই স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলেছিলেন। আধুনিক দন্ত্য চিকিৎসায় পারদর্শী তিনি— খুব সহজেই তাঁর পসার জমে উঠেছিল। শহরের প্রাণকেন্দ্র এনায়েত বাজারে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেছিলেন । স্ত্রীর নামে বাড়ির নাম : 'মুশতারী লজ'। মুশতারী লজের একটি কামরা তাঁর চেম্বার- উন্নত দন্ত্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত।

সাতটি ছেলেমেয়ে— বড়োটির বয়স মাত্র ১৬ বছর। সুখী-সমৃদ্ধ পারিবারিক পরিবেশ । গতানুগতিক পারিবারিক জীবন নিয়েই ড. শফীর পরিতৃপ্তি ছিল না

। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন শিল্পামোদী। যৌবনে বেহালা বাজানো শিখেছিলেন। এখন আর সেই সুযোগ নেই। কিন্তু নিজের সুপ্ত প্রতিভার প্রতিফলন দেখতে চাইলেন তিনি আপন গৃহ পরিবেশে। আর তারই সূচনা হিসেবে ড. শফীর তত্ত্বাবধানে প্রথমত একটি সঙ্ঘ- চট্টগ্রামের 'বান্ধবী সঙ্ঘ' গড়ে উঠলো- নেত্রী তাঁরই সহধর্মিণী বেগম মুশতারী শফী। ক্রমে স্থানীয় উৎসাহী মহিলাদের সমাবেশ ঘটতে লাগলো এই সঙ্ঘকে ঘিরে। 'বান্ধবী সঙ্ঘে'র পরিচালনায় 'বান্ধবী সঙ্গীত ও গিটার শিক্ষার আসর', 'বান্ধবী কুটির শিল্প কেন্দ্র' ইত্যাদি ক্ষুদ্র অথচ সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। বেগম মুশতারী শফীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো চট্টগ্রামের প্রথম মহিলা মাসিক 'বান্ধবী'। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'বান্ধবী সাহিত্য বাসর'। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনার পাঁচ বছরের সময় ১৯৬৮ সালে ড. শফী নিজের বাসভবনের দুটি কামরাকে রূপান্তরিত করলেন একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানায় । অভিনব প্রয়াস— ছাপাখানার নাম 'মেয়েদের প্রেস'- এতে কম্পোজিটার সব মেয়ে ।

নিজের চেম্বার আর ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর ছাড়া সম্পূর্ণ বাড়িটাই পরিণত হলো একটি বিভিন্নমুখী শিল্প-সংস্কৃতির উদার কেন্দ্রে। কোনো অর্থকরী প্রয়াস নয়— স্ব-নির্ভর এক-একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক দুস্থ মহিলার যৎসামান্য অর্থসংস্থান হয়।

চট্টগ্রামে পাকিস্তানি দখলদারদের দৌরাত্ম্য শুরু হবার পরও ড. শফী তাঁর পরিবার- পরিজন নিয়ে বাড়িতে থেকে যান । রাজনীতি তিনি করতেন না, কাজেই তার তো ভয়ের কোনো কারণ নেই । কিন্তু রাজনীতি না করেও তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি । তাঁর গৃহ পরিবেশ ছিল বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির এক উদার কেন্দ্র। এখানে সাহিত্য-সভ্য বসতো, সঙ্গীতের আসর বসতো। সবার ওপরে তাঁর পাড়াপড়শীদের মধ্যে ছিল অনেক অবাঙালি ।

৭ এপ্রিল ড. শফীর বাড়িতে হানা দেয় দখলদার বর্বররা। ওরা অভিযোগ আনলো, ড. শফী ও তাঁর স্ত্রী নাকি আওয়ামী লীগের লিডার, তাঁরা নাকি স্থানীয় অবাঙালিদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছেন, ড. শফী নাকি ভারতীয় গুপ্তচর ইত্যাদি। এসবের সাক্ষী পড়শী অবাঙালিরা।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে যার চোখে পানি আসে, সেই কোমল-হৃদয় ড. শফী সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন— তাঁর হয়ে স্ত্রী বেগম মুশতারী শফী হানাদার মেজরের কথার জবাব দিচ্ছিলেন। মেজরটি বললো : সাচ তোম

আওয়ামী লীগক্কা লিডার হ্যায় ! বাঙালি আওরাৎ তো হামলোগকা সামনে এয়সে বাচিত নেহি কর সেতা ।

বর্বররা স্বামী ও একমাত্র ভাইটিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পর বেগম মুশতারী শফী সাতটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের হাত ধরে গ্রামের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন— নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। সব রকমের পথোকষ্ট ও তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনোক্রমে গিয়ে পৌঁছেছিলেন মুজিবনগরে। সেখানে স্বামীর এতদিনের শিক্ষা ও উৎসাহের আলোকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' যোগদান করেছিলেন কথক হিসেবে। নাম নিয়েছিলেন ‘উম্মে কুলসুম'— স্বামী শত্রুর কারাগারে, নিজের জন্যে তাঁর যেন কোনো ক্ষতি না হয় ।

দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর বেগম মুশতারী শফী ফিরে এলেন চট্টগ্রামে, গেলেন তাঁর পরিত্যক্ত ‘মুশতারী লজে'- যার প্রতিটি ইটের গাঁথুনিতে তাঁর স্বামীর স্পর্শ রয়েছে। এই সেই বাড়ি— এখানে কেউ নেই, কিছু নেই। আভিজাত্যের সব উপকরণই ছিল। এখন কিছুই নেই। সবই লুণ্ঠিত। দেয়ালের সাথে লেপটে-থাকা বৈদ্যুতিক তারগুলোও খুলে খুলে নিয়ে গেছে তস্কররা। ঘরের এককোঙ্গে কাগজপত্রের জঞ্জালের মধ্যে পাওয়া গেলো একখানা পাসপোর্ট ছবি। সেটাই কুড়িয়ে নিলেন বেগম মুশতারী শফী ।

সব গেছে— সব যাক। সাড়ে সাত কোটি পরিবারেরই তো হয়েছে এমনি সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি। কিন্তু এই ছবির মানুষটিকে যদি ফিরে পাওয়া যেতো! সাতটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ও তাদের মায়ের কাছ থেকে ড. শফীই শুধু যদি হারিয়ে না যেতেন! (রচনা ১২- ২-৭২)

এটি ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামের দৈনিক ‘আজাদী'তেও প্রত্রস্থ হয়েছিল। পরে ১৯৭৬ সালের ৭ এপ্রিল সংখ্যা 'পিপলস ভিউ' পত্রিকায় নিবন্ধটির ইংরেজি তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল । তরজমা করেছিলেন ফকীর আহমদ। শিরোনাম 'In Memory of Dr. M. Shafi, a Martyr for Freedom'

আবুল ফজল 'দুর্দিনের দিনলিপি' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ব্যাপী লিখেছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফী সম্পর্কে। ১৯৭৭ সালের ৮ এপ্রিল দৈনিক সংবাদে আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । শিরোনাম ‘না মুক্তিযোদ্ধা, না বুদ্ধিজীবী' । নিবন্ধটি হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে এখানে :

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে আয়োজিত চট্টগ্রামের এক সভায় তিন বছর আগে একটা বিষয়েই আমি কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলাম। সেটা হচ্ছে শহীদ স্মৃতিকে অমরত্ব দানের দায়িত্ব সাধারণত গ্রহণ ও বহন করে থাকে- মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে দলীয় সংগঠন কিংবা সংগ্রামী সহকর্মীগণ এবং বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান কিংবা অনুরাগী ছাত্র ও সতীর্থগণ। ঘটা করে স্মৃতি উদযাপন নির্ভর করে প্রধানতই শহীদের পরিত্যক্ত আত্মীয়-বান্ধবের অর্থবিত্তের ওপর। প্রকৃতপক্ষে দেশের জন্যে জীবনদানকারী একজন শহীদ দেশ ও জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেন, বলা হয়—তা সহজেই পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু পরিত্যক্ত পরিজন অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের চিরদিনের জন্যে 'অনাথ' করে দিয়ে যে দুর্ভোগের মধ্যে আপতিত করে যাওয়া হয়, তার সম্পূরণ অসম্ভব। শহীদের আত্মাহুতির ক্ষয়ক্ষতি দেশে রাজনীতির সর্বস্তরের উত্তরণের প্রাক্কালেই একান্তভাবে তার পরিত্যক্ত আত্মজনদের জন্যে 'অপূরণীয়'। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা বা বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুচিহ্নিত শহীদদের পরিবারের প্রতি সমাজ কিছু সমমর্মিতা বোধ করলেও, অনুরূপভাবে চিহ্নিত নয়-এমন দুস্থ পরিবারের লোকদের ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদাও অনেক সময় অনেকে স্বীকার করেন না। একটা বাড়িতে দেশের মুক্তিসংগ্রামের কিছু মহড়া কোনোকালে যে হয়েছিল, সেটাই আর কারো মনে থাকে না। শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে আয়োজত সেই সভায় আমার ঐ ব্যতিক্রমী বক্তব্য শুনে উপস্থিত অন্যতম আলোচক আবুল ফজল এ কথায় সায় দিয়েছিলেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন একে 'ইতিহাসের ট্রাজেডি' বলে ।

আমি এখন এমন একজনের কথা বলতে যাচ্ছি, ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল ঠিক এই দিনটিতে যিনি দখলদার সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন— তারপর থেকে তাঁর আর সন্ধান কেউ বলতে পাবে না। তিনি ডাক্তার মোহাম্মদ শফী- তাঁর কথাই আবুল ফজল তাঁর 'দুর্দিনের দিনলিপি' গ্রন্থে লিখেছেন। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"ডাক্তার শফী দাঁতের চিকিৎসক। দীর্ঘদেহী এ মানুষটার গায়ের রঙ কিছুটা কালো হলেও চেহারার আদল আর দৈহিক গঠনে তিনি ছিলেন সুপুরুষ। কলকাতার ছেলে, কথায় কলকাতার উচ্চারণ ভঙ্গি সহজেই কানে ঠেকতো। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকের মতো তিনিও চাটগাঁ এসে চিকিৎসা শুরু করেছিলেন.....অত্যন্ত ভদ্র অমায়িক ও ব্যাহারে চরম বিনয়ী ছিলেন শফী। নিজের পেশায়ও ছিলেন দক্ষ । আমার বা আমার পরিবারের

যখন কারো কোনো রকম দাঁতের কষ্ট দেখা দিয়েছে তখন আমরা ড. শফীর শরণাপন্ন হতাম। আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ফি তো নিতেনই না নিদর্শন হিসেবে কিছু দিতে চাইলেও তাও গ্রহণ করতেন না। আমাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ও অত্যন্ত হিতৈষী তরুণ বন্ধুটিও আজ আর ইহলোকে নেই। ইনিও সৈনিক নামধারী ঘাতকের বন্দুকের শিকার হয়েছেন...... ... ডাক্তার শফীর স্ত্রী বেগম মুশতারী শফী এক অসাধারণ কর্মিষ্ঠা মেয়ে। তিনি স্বামীর পূর্ণ সহযোগিতায় 'বান্ধবী' নামে মেয়েদের এক সামাজকল্যাণমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, স্রেফ মহিলাদের লেখা দিয়ে ঐ সংস্থার মুখপত্র হিসেবে ‘বান্ধবী' নামে একখানি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা গত ছ'সাত বছর ধরে বেশ সাফল্যের সাথে চালিয়ে আসছেন। সে সঙ্গে মেয়েদের জন্য গানের ক্লাশ আর সেলাই স্কুল খুলেছেন। কিছুকাল থেকে নিজের ঘরে ‘মেয়েদের প্রেস' নামে একটি ছাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । ঐ প্রেসে কম্পোজ করা থেকে যাবতীয় কাজ মেয়েরাই করতো, ওদের সেভাবে দেওয়া হতো শিক্ষা। এভাবে বহু দরিদ্র আর বেকার মেয়ের অন্নের সংস্থান করার পথ খুলে দিয়েছিলেন বেগম শফী। নি:সন্দেহে এ একটি অনন্য উদ্যোগ। স্রেফ মেয়েরা একটি প্রেস চালাচ্ছে এমন দ্বিতীয় নজির আমার জানা নেই । এসব কিছুর পেছনে ডাক্তার শফীর সমর্থন, প্রেরণা, সাহায্য আর সহযোগিতা যে ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এসবের জন্যে তিনি নিজের বৈঠকখানা আর ঘরের একটা অংশ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে কুণ্ঠিত হননি কোনো দিন। আজ সে দরদি সমাজহিতৈষী মানুষটিও এক অমানুষিক বর্বরতার শিকার হয়ে হারিয়ে গেছেন চিরকালের জন্য— হারিয়ে গেছেন শুধু তার আপনজনের জীবন থেকে নয়— আমাদের অনেকের জীবন থেকেও ।

ছ'টি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে বেগম মুশতারী শফী আজ কোথায় কিভাবে জীবনধারণ করছেন, কিভাবে এ দু:সহ শোক সহ্য করে বেঁচে আছেন জানি না— বেগম মুশতারী শফীর ভাগ্যের কথা মনে হলে, আমার ভিতরটা যেন কেমন এক অসহ্য বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ সমাজ সেবার একি পরিণতি? সমাজের কাজ করতে গিয়ে তাদের যে এমন চরম মূল্য দিতে হবে তা কি ডাক্তার আর মিসেস শফী একবারও ভাবতে পেরেছিলেন? না আমরা পেরেছিলাম তা চিন্তা করতে? আমরা শহরে ফিরে আসার পর আমার এক ছেলে ওদের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে এসেছে ‘মুশতারী লজের' দরজায় মস্ত বড় এক তালা ঝুলছে। নিষ্ঠুর ব্যাধের শর নিক্ষেপে বাংলাদেশের এক

কৌঞ্চ বধূ আজ এমনি করে নীড়হারা। কে জানে এমনি করে বাচ্চাদের পক্ষপুটে নিয়ে তিনি আজ কোথায় হাহাকার করে ফিরছেন? (১৮-৭-৭১)'

বস্তুত ডাক্তার শফী ও তাঁর একমাত্র শ্যালক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, কম, ক্লাশের ছাত্র শহীদ খোন্দকার এহসানুল হক আনসারীকে যেসব অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়, তার একটি ছিল, স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা- কর্মীদের তাঁর বাড়িতে আশ্রয় ও প্রত্যক্ষ উৎসাহদান ।

ঘটনাচক্রে ডাক্তার মোহাম্মদ শফী ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের দলভুক্ত হয়ে শাহাদৎ বরণ করেননি— করেছেন তার অনেক আগে এবং অনুরূপভাবে তরুণ এহসানুল হক আনসারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়োজিত হবার সুযোগ লাভের আগেই শহীদ হয়েছিলেন। তাই এঁরা কেউই ইতিহাসের উপজীব্য হননি। এই নিবন্ধকারসহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রাথমিক চারজন প্রতিষ্ঠাতা-কর্মীর (সর্বজনাব বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ) পক্ষে ডাক্তার শফীর স্মৃতি রোমন্থন না করা সত্যের অপলাপ, বিবেকের উৎপীড়ন এবং জীবনের অবমাননা বলেই আমি মনে করি ।

এ প্রসঙ্গে গত ২৫ মার্চ ১৯৭৭ বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ব্রিগেডিয়ার এম এ মঞ্জুর, বীর উত্তমকৃত বক্তব্যটি স্মর্তব্য । তিনি বলেছেন, '১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন এবং লিখেছেন। কিন্তু কয়জন লিখেছেন সেই বীর সন্তানের কথা, ছেপেছেন ১৬ বছরের তরুণের সেই মুখখানি, স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মায়ের কাছ থেকে যে বিদায় নিয়েছিল কোনো এক ছোট গ্রামে। সেই প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়ে আর কোনো দিন ফিরে আসেনি তার দু:খিনী মায়ের কোলে। কোথায় সেই বেঙ্গল রেজিমেন্ট অথবা বাংলাদেশ রাইফেলের বীর সৈনিকদের গাথা, যারা বীরত্বের জন্য ভূষিত হয়েছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে। হাজার হাজার তরুণের হাজার হাজার সাধারণ মানুষের এই বীরগাথাই হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। আমাদের লিখতে হবে সেই ইতিহাস, যে ইতিহাস প্রেরণা যোগাবে আগামী দিনের নাগরিকদের।'

আবুল ফজলের ভাষায় 'ইতিহাসের এই নিষ্ঠুরতম শোকগাথা রচনার জন্য নতুন কোনো বাল্মীকির আবির্ভাব ঘটবে কি?

১৯৭৩-এর এপ্রিল মাসে 'মাসিক বান্ধবী'র একটি স্মরণিকা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর নবপর্যায়ে অনিয়মিতভাবে কয়েকটি সংখ্যা আমরা প্রকাশ করেছিলাম। স্মরণিকা সংখ্যায় শুধু মেয়েদের লেখা না দিয়ে পুরুষ-লেখকের কাছ থেকেও স্মৃতিচারণমূলক লেখা নেয়া হয়েছিল। আমি লিখেছিলাম খোন্দকার এহসানুল হক আনসারীর ওপর। আমার সেই লেখাটির শিরোনামও ছিল 'না মুক্তিযোদ্ধা না বুদ্ধিজীবী' । লিখেছিলাম :

একজনের কথা আমি স্মরণ করতে চাই— স্মরণিকার আকারে কিছু লিখতে চাই এবং যদিও আমি কিছুতেই এখনো মনে মনে মানতে চাই নে, তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে এবং দীর্ঘসূত্রীভাবে সর্বরকম অনুসন্ধানের সীমার বাহিরে থাকা সত্ত্বেও চিরতরে হারিয়ে গেছেন— আমি সর্বমুহূর্তে বিশ্বাস করতে চাই, যে কোনো উপলক্ষের আশ্রয়ে তিনি সহসা আমাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারেন— দখলদার হার্মাদদের ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির মধ্যে কেবলমাত্র একজনের আকস্মিকভাবে বেঁচে যাওয়ার মতো এবং সেই আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণ রেখেই আমি তাঁর কথা, মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তাঁর সঙ্গে একই গৃহবাসে আমার যে-দিনগুলো শেষ দেখার মতো অতিক্রান্ত হয়েছিল, তারই খণ্ড স্মৃতিচারণ করতে চাই ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি না মুক্তিযোদ্ধা না বুদ্ধিজীবী। আর সেজন্যেই ‘বান্ধবীর’ বিশেষ স্মৃতি-সঙ্কলনের বিজ্ঞপ্তি রচনা করতে গিয়ে তাঁর নাম- সংযোজনের সূত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি এবং বেগম মুশতারী শফী। আমরা শুধু অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিলাম, আমাদের এহসানের কথা 'বান্ধবীর' বিশেষ সংখ্যাটিতে পত্রস্থ করতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। কেননা বান্ধবী কার্যালয়ে আজকাল আমরা সর্বমুহূর্তে একজন ডাক্তার এম শফীর বিচরণ প্রত্যক্ষ না করেই শুধু বিচলিত হই নে, সেই সঙ্গে বিচঞ্চল হই এহসানের অনুপস্থিতির জন্যেও। এহসান— খোন্দকার এহসানুল হক আনসারী যার জন্ম ১৯৪৪ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার ৫১/১/১, করৈয়া রোডে, যে-বাড়ির সামনে ন'মাসের শরণার্থী জীবনে আমার সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ মুশতারী থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই শৈশব-কৈশোরের স্পর্শলিপ্ত গৃহে প্রবেশের প্রবণতা সংবরণ করতে পারেননি— আমিও সহগামী অনুসারী হয়েছিলাম। আলাপ হয়েছিল বর্তমান বাসিন্দাদের সঙ্গে। মুশতারী ওঁদেরকে বলেছিলেন : আমার একমাত্র ভাই এহসান— ওকে এবং ওর দুলাভাইকে ৭ এপ্রিল ('৭১) পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে । ভাইটিকে এতো

করে বলেছিলাম, পেছনের দরজার দিয়ে তুই সরে যা- যে ভাই আমাদের এতো শান্ত-সুবোধ, একটি কথা বলতো না কোনো দিন মুখের ওপর, সেদিন আমার কথার অবাধ্য হয়েছিল, তল্লাশিকারীদের মধ্যে আমাকে ফেলে রেখে গেলো না কিছুতেই— স্বেচ্ছায় গেলো না, কিন্তু আমাকে ছেড়েই সে গেলো ওদের হাতে বন্দি হয়ে। তারপর আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘর ছাড়লাম, দেশ ছাড়লাম । ভাইটি আমার এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, জানি নে।

জানি নে, এহসান এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে— সেই শরণার্থী জীবনে, এখন থেকে পৌনে দু'বছর আগে আমরা যা জানতাম না, এখনো পুনর্বাসনপ্রাপ্ত জীবনেও জানি নে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-কম ক্লাসের ছাত্র ছিলেন এহসান। 'বান্ধবী'র সঙ্গে তাঁর ঘরোয়া সম্পর্ক ছিল- বোনের সম্পাদিত পত্রিকার বৈষয়িক বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপস্থিত সাহায্য দান। পত্রিকার কার্যালয়ে দৈনন্দিন আনাগোনা সূত্রে মুশতারী শফীর ছোট ভাই আমারও অনুজ সম্পার্কিত হয়েছিলেন।

২৫ মার্চ '৭১ রাত মুশতারী লজেই কেটেছিল আমার ঘটনাচক্রে এবং চট্টগ্রাম বন্দরে দু'দিন আগে পাকিস্তানি যুদ্ধ-জাহাজ নোঙর করার সূত্র ধরে এখানে যে গণ-অসন্তোষের সূত্রপাত হয়েছিল, তার রেশ হিসেবে সেই রাতটি অনবরত বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির শব্দে ছিল চঞ্চল । ঢাকার অতর্কিত হামলার কথাও সে রাতেই শেষবারের মতো টেলিফোনের যোগাযোগক্রমে অনুমানগতভাবে এখানে অনেকেরই জানা হয়ে গিয়েছিল। মুশতারী লজের একটি শোবার ঘরে এহসান তাঁর সমবয়সী দু'জন অভ্যাগত কাসেম ও ফারুক (দু'জনই আমার স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র উদ্বোধন-দিনের প্রাথমিক সহকর্মীসহ এবং অন্য শোবার ঘরে খাটের ওপর ডাক্তার সাহেব ও মেঝেতে আমি আর মুশতারী ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুয়ে বসে রাত জাগছিলাম । গোলাগুলির প্রতিটি শব্দে ছেলেমেয়েরা ভীতবোধ করছিল । আমি ওদের মন ধরে রাখার জন্যে অন্ধকার ঘরে বাচালতার কৎ করছিলাম চাপা স্বরে। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে যখনই ছেলেমেয়েদের হাসির শব্দ এবং আমার অসতর্ক কণ্ঠস্বর উচ্চতর হচ্ছিল, তখনই একটি চাপা ধমক দিচ্ছিলেন এহসান। সুন্দর সুঠাম দীর্ঘদেহী এহসান, যাঁর মধ্যে দীর্ঘদিনের আলাপ পরিচয়েও কোনোরকম ইতরতা দেখতে পাওয়া যায়নি, যিনি ছিলেন একজন সত্যিকার অর্থে অধ্যয়ন-তপস্বী, নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া-শোওয়া এবং নমাজ পড়া, পাঠ্য বই পড়া আর

প্রাপ্তবয়স্ক কর্মজীবীদের চেয়েও পরিচ্ছন্ন চালচলন- আমাদের ২৬ মার্চের চাঞ্চল্য এবং আমার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আকস্মিক উদ্যোগ, দ্রুত পরিকল্পনা, ব্যতিব্যস্ততা এসব কিছুই একেবারে চোখের সামনে হতে দেখেও তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি। অস্বাভাবিক নির্বিকার একজন মানুষ তিনি- প্রথমদিন ২৬ মার্চ '৭১ উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে আমি, কাসেম ও ফারুক কালুরঘাট থেকে হাঁটাপথে রাত করে এনায়েত বাজারে ফেরার পর ডাক্তার সাহেবের বড়ো মেয়ে ইয়াসমীন ফারজানা যখন আমাকে বলেছিল : কাকু, তুমি যে কাসেম-মামাকে খবর পড়ার সময় ডিকটেশন দিয়েছিলে, সেটাও আমরা শুনেছি রেডিওতে— তখন এহসান বলেছিলেন : আপনারা আগে সব লিখে নিতে পারেননি, ভাই?— সে-রাতে এহসান পরবর্তী অধিবেশনের জন্যে সংবাদ-পাণ্ডুলিপি তৈরিতে আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন ।

কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনের নিরাপত্তার জন্যে আমি ২৭ মার্চ '৭১ পটিয়ার অস্থায়ী ছাউনি থেকে মেজর জিয়াকে ডেকে এনেছিলাম এবং মেজর সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর প্রথম ইংরেজি ভাষণ প্রচার করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে- সেদিন রাতে বাসায় ফেরার পর এহসান মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন : মেজর জিয়ার ভয়েস সত্যি বীরোচিত। তাই না, বেলাল ভাই?

২৯ মার্চ '৭১ সকালে আমি সহকর্মী কাসেম, ফারুক ও হাবিবউদ্দীনসহ এনায়েত বাজার থেকে শেষ বিদায় নিয়ে ট্রান্সমিটারের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে এহসানের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। বলেছিলাম : এখন এই আসা-যাওয়ার পথ নিরাপদ মনে হচ্ছে না-শহরে আর ফিরে আসতে চাইনে ।

এহসান কোনো জবাব দেননি- ডাক্তার সাহেব হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, আমাকে শিশুবৎ স্নেহে চুমো খেয়েছিলেন এবং কণ্ঠস্বরে কান্না জড়িয়ে বলেছিলেন : সেই ভালো, দেশের কাজে যদি মনে করিস ট্রান্সমিটারেই থেকে যাওয়া ভালো কিংবা দূরে কোথাও চলে যেতে হয়, তা-ই যা । খোদা হাফেজ! কিন্তু এই যে আজ রাতে ফিরবি নে, একথা ডলিকে (মুশতারী) বলিসনে। ও ছাড়তে চাইবে না ।

এহসান মৌনী হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন । মনে হয় ওঁর সমগ্র অন্ত:করণ তখন আমাদের জন্যে শুভেচ্ছায় পরিপূর্ণ ছিল।

ফরিদপুরের সমৃদ্ধ গ্রাম গের্দার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের— খোন্দকার নাজমুল

হক আনসারীর একমাত্র পুত্র এহসান, চার বোনের একমাত্র ভাই এহসান— বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এহসানকে করেছে নিরুদিষ্ট, করেছে তাঁর বোনকে সর্বস্বান্ত। পারিবারিক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে এতোটা ক্ষতি স্বীকার আর কাউকে করতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই ।

৩০ মার্চ '৭১ কালুরঘাট ট্রান্সমিটার-ভবনে দখলদার বাহিনী বিমান হামলা করে- সেটাই ছিল বাংলাদেশে প্রথম বিমান হামলা- তারপর আমি চট্টগ্রাম শহর থেকে টেলিফোনের যোগসূত্র থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তারপর মুক্ত অঞ্চলে ১০ জন কর্মীর দলটি নিয়ে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার ও একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার/পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম, তখনই মে' '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে মুশতারী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন- জেনেছিলাম, ৭ এপ্রিল '৭১ দখলদার বাহিনী 'মুশতারী লজে' হানা দিয়েছিল এবং প্রতিবেশী অবাঙালিদের প্ররোচনায় নানান বানোয়াট অভিযোগের সূত্রে ডাক্তার মোহাম্মদ শফী এবং এহসানুল হক আনসারীকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল ।

সামরিক বাহিনীর দ্বারা এহসানও যদি সেদিন ঘরছাড়া না হতেন, হতেন একজন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মুক্তিযোদ্ধা- এম. কম. ক্লাসের পাঠশেষে কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ পেলে এহসান অবশ্যই হতেন একজন বুদ্ধিজীবী। জিজ্ঞাসা, ত্রিশ লক্ষ অপহৃতের মধ্যে ক'জন মুক্তিযোদ্ধা এবং বুদ্ধিজীবীর স্থান সঙ্কুলান হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে? সেই ২৯ মার্চ '৭১ এহসানের হাতে আমি কিছু কাগজপত্র এবং একটি ঝর্না কলম জমা রেখেছিলাম । একজন বিশ্বস্ত আমানতদার এহসান আমার সেই আমানত ফেরত দেবার আর অবকাশ পাননি। জানি নে, মুশতারী তাঁর একমাত্র ভাইটিকে দখলদার বাহিনীর হাতে ধৃত অবস্থায় যার হেফাজতে রেখে ঘরছাড়া দেশছাড়া হয়েছিলেন, এহসানের সেই উপাস্য পুরুষ আজ এহসানকেই আমানত রেখেছেন কি না। এহসানের বৃদ্ধ আম্মাকে আমরা আজ কি বলে প্রবোধ মানাবো? কনিষ্ঠা ইসমত করিমকে কি সান্ত্বনা দেবো? (রচনা ৩১-৩-৭৩)

৭ এপ্রিল বিকেলে একজন কাবুলিওয়ালা এসেছিলেন। মুশতারী লজের পূর্বের ভাড়াটে । এসেছিলেন উমেদারি নিয়ে । সামরিক বাহিনীর লোকেরা ২৫ হাজার টাকা দাবি করেছেন। ডাক্তার মোহাম্মদ শফীর মুক্তিপণ। বেগম মুশতারী শফী বলেছিলেন : নগদ এতো টাকা কোথায় পাবো? আমার কাছে সোনার অলঙ্কার

আছে। ২৫ ভরির ওপর ।

কাবুলিওয়ালাটি উর্দুতে বলেছিলেন : না, ওতে হবে না। নগদ টাকা দিতে হবে ওদেরকে । নইলে ইজ্জতের সওয়াল । আপনার ঘরে রয়েছে খুবসুরত আওরত।

সন্ধ্যার পর বেগম মুশতারী শফী ঘরের বার হয়েছিলেন। প্রতিবেশী অবাঙালিদের দ্বারে দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন। এঁদেরকেই দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ শফী। এই তো অল্প কয়েকদিন আগেই। বুকটান করে দাঁড়িয়েছিলেন পথ আটকে । নগদ টাকা কিংবা নিরাপত্তার আশ্বাস- কিছুই পাওয়া যায়নি।

বহিরাগতরা সরে পড়েছিলেন সবাই। কেবল মাসুদা নবি, এয়ার মাহমুদ, শাফাউন্নবী এবং ৭টি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েসহ মা বেগম মুশতারী শফী। সে রাতে রান্না চড়েনি। নির্জলা উপবাসে বিনিদ্র স্তব্ধতায় পেয়ে বসেছিল সবাইকে। সর্বকনিষ্ঠা শারমীনের বয়স ৬ বছর।

শেষরাতে বৃষ্টি নেমেছিল। সেই ছিল সুযোগ। কাজের ছেলেটিকে রেখে এক-কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সবাই। পেছনের দেয়ালের খিড়কির দরজা দিয়ে। স্টিলের আলমারির চোরা কুঠুরি খোলা সম্ভব হয়নি। হাতের কাঁপুনির জন্যে । শব্দ হবার ভয়ে। সোনাদানা এবং দামি মালামাল সবই হয়েছিল পরিত্যক্ত ।

কোথাও একটু আশ্রয় দরকার দিনেকের জন্যে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে ঠিক করা হবে, কোথায় যাওয়া হবে শহর ছেড়ে। বাটালি রোড থেকে রেয়াজুদ্দীন বাজার সংলগ্ন চৈতন্য গলি। গোরস্থানের জানাজার ঘরে ছেলেমেয়েদের বসিয়ে রেখে খুঁজতে হয়েছিল আশ্রয় । তারপর তো অনেক অভিজ্ঞতা ।

চট্টগ্রাম থেকে ৩৬ মাইল দূরে মিরেরশরাই থানা। মিঠাছড়া গ্রামে আনানটোলা খানকা শরীফ গন্তব্য। যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না। মাঝে মাঝে আংশিক পথে রিকশা চলাচল ছিল । উৎসাহকর ছিল শহর ছেড়ে পালিয়ে চলা জনস্রোত। সেই স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় বেগম মুশতারী শফী ডান পায়ের আঙুলে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। অসহ্য ব্যথা । পায়ে ছিল স্পঞ্জের স্যান্ডেল। অন্ধকারে ঘর ছেড়ে বের হবার সময় দুই জোড়ার দুটি স্যান্ডেলে পা গলিয়েছিলেন। দুটিই ছিল বাম পায়ের।

: সেই দীর্ঘ পথের মিছিলে শাফাউন্নবী গলা ছেড়ে গান গেয়েছিলেন : ‘পথের ক্লান্তি ভুলে.. কতোদূর আর কতোদূর বলো, মা!

এয়ার মাহমুদ জানিয়েছিলেন : আশপাশে আমি গিয়ে জানমালের ক্ষতি করলেও খানকা শরীফে যায়নি । সুফি সাহেবের বাড়ি বলেই হয়তো। কিন্তু আর বেশিদিন ওখানে টেকা যাবে না । কারণ, বেগম মুশতারী শফীর পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল । স্থানীয় লোকরা এ জন্যে শঙ্কাগ্রস্ত। তাছাড়া হাতে টাকাকড়ি নেই ।

: কিন্তু এখানে তো কষ্ট হবে। এখানে এসে উঠতে হবে ক্যাম্পে।

: সে-ও ভালো ।

এয়ার মাহমুদকে ৫০/-টাকা দিয়েছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী। আমি বলে দিয়েছিলাম, না এসে পারলেই ভালো। আর যদি বর্ডার ক্রস করতেই হয়, যেন সব ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসা হয়।

২৬ মে সন্ধ্যায় ওঁরা সবাই আগরতলা পৌঁছেছিলেন। আর সেদিনই দুপুরের ফ্লাইটে আমি চলে গিয়েছিলাম কলকাতায়। ওঁরা এসে উঠেছিলেন ক্র্যাফটস্ ইন্সটিটিউটে। ন্যাপ-এর ক্যাম্পে। ওখানেই ছিলেন বেগম মুশতারী শফীর বান্ধবী মতিয়া চৌধুরী। ছিলেন চৌধুরী হারুনর রশীদ।

বড়ো মেয়ে ষোড়শী ফারজানাকে চট্টগ্রামে রেখে আসা হয়েছিল। খালু ইমদাদুল করিম রেখে দিয়েছিলেন। আমেরিকান এক্সপ্রেসের ম্যানেজার ইমদাদুল করিম। তাঁর জন্যে সামরিক বাহিনীর অধিকৃত এলাকায় ছিল না জীবনের ঝুঁকি । অন্যদিকে ঐ বয়সী মেয়েকে নিয়ে সীমান্ত পারাপারে ছিল যথেষ্ট ঝুঁকি।

পরবর্তী সময়ে শরণার্থী বেগম মুশতারী শফী অহরহ বিমর্ষ থাকতেন। স্বামী ও ভাই-এর জন্যে সন্তাপ ছাড়াও চট্টগ্রামে ছেড়ে-আসা কন্যাটির জন্যে ।

মুশতারী লজের দেয়ালে ছিল লেনিনের ছবি। বাঙালিদের ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ছবি প্রায়ই থাকে । হানাদারদের কাছে দাদা ও নানার ছবি বলা হতো । ওদের তাই ধারণা হয়েছিল, সব বাঙালিদের একই দাদা ও নানা । এ রকম একটা রটনা শোনা গিয়েছিল ।

মে মাসের গোড়ার দিকের কথা । অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ উঠে এসেছিলেন

জেল রোডের বাড়িতে । আমাদের সঙ্গেই তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের প্রথম চতুরংশে আমি ছিলাম তাঁর অধীনে নব্য সাংবাদিক । আমরা সবাই স্বভাবত তাঁকে ‘স্যার' বলতাম। দেখাদেখি তাহেরউদ্দীন ঠাকুরও ‘স্যার' ডাকতে শুরু করেছিলেন।

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদকে বলা হতো 'লায়ন কিলার'। বঙ্গবন্ধুর নৌকায় চেপে তিনি সিংহ শিকার করেছিলেন। নিজের মুখেই বলতেন : আমার কি সাধ্য ছিল জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীকে ভোটে ডিফিট দেয়া? একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নামের জোরে এটা সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে জেলখানায় সাক্ষাৎ হয়েছিল অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের। সত্য-মিথ্যা জানি না, রটে গিয়েছিল জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর এই সরস উক্তিটি : ও-বা খালেদ, তোমরার বঙ্গবন্ধু তো সোনার বাংলা বানাই ফেলা-র। আঁর লাই চাইর হাত মাটির বাংলা যেন রাখে ।

১৯৭৩ সালে যে কোনো জটিলতার কারণে আমার একটি প্রত্যয়নপত্রের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ও এম আর সিদ্দিকীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম । অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের কাছে যেতে হয়নি আমাকে। কথা হয়েছিল টেলিফোনে। ১০ আগস্ট ১৯৭৩-এ। সেদিনই জাতীয় সংসদের প্যাড-এ সুন্দর হস্তাক্ষরে তিনি এই প্রত্যয়নপত্রটি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন :

‘বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম-এর সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক জনাব বেলাল মোহাম্মদ দীর্ঘকাল থেকে আমার পরিচিত। যশস্বী সাহিত্যিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব বেলাল মোহাম্মদ তাঁর সততা, কর্মনিষ্ঠা ও অটুট মনোবলের জন্যে সকলেরই প্রিয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর-প্রেম, তাঁকে এমনই দু:সাহসী করে তুলে যে, ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তিনি একক প্রচেষ্টায় নিজের বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে, তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে ‘স্বাধীন বাংলা বেতার' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম কর্নেল (তখন মেজর) জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানাবার ব্যবস্থা করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উপর বিমান হামলার পর জনাব বেলাল মোহাম্মদের উৎসাহে অতিরিক্ত ট্রান্সমিটার সঙ্গে

নিয়ে দলটি রামগড়ে পৌঁছে।

১৯৭১ সনের ২৫শে মে পর্যন্ত অর্থাৎ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার চালু না হওয়া পর্যন্ত জনাব বেলাল মোহাম্মদ বস্তুত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রাণ ছিলেন । ঐ সময় পর্যন্ত আমিও এ বেতারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। কথিকা ইত্যাদি প্রচার- বিষয়াদি লেখা, প্রচার-সূচি তৈরি করা, কণ্ঠ দেওয়া, ব্যবস্থাপনা, পরিবেশনা সবই তাঁকে করতে হত। স্ত্রী পুত্র পরিজনদের দেশে ছেড়ে এসে, রাতদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে মুক্তিযুদ্ধকে তিনি যেভাবে প্রেরণা দিয়েছেন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রামের সামান্যতম সুযোগ-সুবিধাও তাঁদের ছিল না। ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ এ জীবন উপলব্ধি করতে পারবেন না। ২৫শে মে থেকে মুজিবনগরে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতারের নূতন কেন্দ্রে তিনি যোগ দেন। এখানে দায়িত্ব কিছুটা হ্রাস পেলেও সংগঠন ও পরিচালনা ছাড়াও প্রচারের জন্যে লেখা ও নিজের লেখা ব্রডকাস্ট করার দায়িত্বও তাঁর ছিল । তাঁর দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা আমাকে তাঁর ভক্ত করে রেখেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বাধীন বাংলা বেতার মুখ্যস্থান দখল করবে আর জনাব বেলাল মোহাম্মদ থাকবেন বেতারের প্রাণবিন্দু হিসাবে। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে জীবন বিপন্ন করে যদি তিনি ‘স্বাধীন বাংলা বেতার' প্রতিষ্ঠা না করতেন, তবে সে বেতারের জন্ম পরে হত কিনা সন্দেহ। প্রতিভা ও স্বাদেশিকতার অপূর্ণ সমাহার জনাব বেলাল মোহাম্মদ ।

আমি নিজে তাঁর গুণমুগ্ধ। আশা করি, জাতির কাছ থেকে তিনি উপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতি পাবেন। তিনি জাতির গৌরব। এ গৌরব অম্লান থাকুক, এ আমার একান্ত ইচ্ছা।— মোহাম্মদ খালেদ, সংসদ সদস্য।'

২০ আগস্ট ৭৩-এ এম আর সিদ্দিকীর দেয়া প্রত্যয়নপত্রটি ছিল :

‘বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক জনাব বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম উদ্যোক্তা-সংগঠক-পরিচালক। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগীয় ১০ জন কর্মীর একটি ক্ষুদে দল গঠন করে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার-ভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেন। কেন্দ্রের নামকরণ তাঁরই কৃত। ২৭শে মার্চ তিনি পটিয়ার অস্থায়ী সামরিক ছাউনি থেকে মেজর জিয়াউর রহমানকে (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার)

ট্রান্সমিটার-ভবনে আহ্বান করে আনেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে ঘোষণা প্রচারের জন্যে। ৩০শে মার্চ ট্রান্সমিটার-ভবনে বিমান হামলা হয়— সেটাই ছিলা দখলদার বাহিনীর বাংলাদেশে প্রথম বিমান হামলা। এরপর জনাব বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বাধীন ক্ষুদে দলটি একটি ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারসহ মুক্ত অঞ্চলে সরে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখেন। তখন থেকে আমাদের মধ্য থেকে জাতীয় পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ স্বাধীন বাংলা বেতারের সার্বক্ষণিক উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে জনাব বেলাল মোহাম্মদ ২৫শে মে ১৯৭১ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এরপর মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উচ্চশক্তির ট্রান্সমিটারে জনাব বেলাল মোহাম্মদ ও তাঁর দলটি নবাগত অন্যান্য সহকর্মীসহ দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া অবধি স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আত্মনিয়োগকারী একজন স্বত:প্রণোদিত কর্মী হিসেবে জনাব বেলাল মোহাম্মদের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল । তাঁর জীবন যাত্রার সার্বিক কল্যাণ আমার একান্ত কাম্য।— এম আর সিদ্দিকী, সংসদ সদস্য।'

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ আমাদের সঙ্গে নিয়মিত ব্রডকাস্টার হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের চিরকুট নিয়ে এসেছিলেন প্রণোদিৎ বড় য়া। সঙ্গীত প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এখানে তো তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগাবার উপায় ছিল না। পরে প্রণোদিৎ বড় য়া কলকাতায় ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের আমলেও আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ে।

আগরতলা পর্যায়ে আমাদের গানের স্টক ছিল নামমাত্র। সূচক সুর হিসেবে কালুরঘাট পর্যায় থেকে প্রচলিত হয়েছিল 'জয় বাংলা' সিনেমার গানটি। গাজী মাজহারুল আনোয়ার রচিত 'জয় বাংলা বাংলার জয়।' চট্টগ্রাম বেতারের স্টুডিও রেকর্ড ‘কেঁদো না কেঁদো না মা গো, আর তুমি কেঁদো না/ফারুকের মতো বীর সন্তান যার, তার কি কখনো সাজে কান্না' এবং ঢাকায় উৎপন্ন গ্রামোফোন রেকর্ডের একটিমাত্র সঙ্গীত ও তিনটি নজরুল গীতি ‘কারার ঐ লৌহ কপাট, ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ও ‘মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম'।

এসব গান প্রত্যেক অধিবেশনেই বারবার সংযোজিত হতো ।

শহরের শ্যামনগরে নেতাদের অফিস। একদিন সে অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এম আর সিদ্দিকীর দর্শনার্থী হয়েছিলেন একজন সুবেশী তরুণ। ভেতরে গোপনীয় বৈঠক চলছিল। আগন্তুককে বলা হয়েছিল বাইরে একটু অপেক্ষা করতে । চটে গিয়েছিলেন তিনি ।

: হোটেলের সামনেই তো একবেলা অপেক্ষা করলাম। এক প্যাকেট পানামা সিগারেট পুড়িয়ে শেষ করলাম। কথা ছিল গাড়ি পাঠানো হবে। কোথায় কার গাড়ি! আমি জানতে চাইবো, কি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এঁরা এখানে? একটা গাড়ি পাঠাতে পারেন না! কথা ঠিক রাখতে পারেন না!

যেচে জিজ্ঞেস করেছিলাম : আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

: এসেছি ঢাকা থেকে । গতকাল রাতে পৌঁছেছি। কি ঝুঁকি নিয়ে বর্ডার ক্রস করতে হয়েছে, জানেন! সাথে প্রচুর টেপ। নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এঁরা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। টেপগুলো সব জড়িয়ে গেছে। আগরতলা রেডিও স্টেশনে গিয়ে গুছিয়ে নেবো। কথা ছিল, এঁরা সকালে হোটেলে গাড়ি পাঠাবেন।

জানতে চেয়েছিলাম, ওসব টেপ-এ কি আছে। বলেছিলেন : টেপ-এ সব সংগ্রামী গান, গণসঙ্গীত। এখানে কারা সব রেডিওতে কি সব প্রচার করছে, কিছুই হয় না মাথামুণ্ড। তাই তো এসেছি টেপ নিয়ে ।

: আপনি কি ঢাকা বেতারের লোক? আপনার কি নাম ?

: হ্যাঁ, আমার নাম শহীদুল ইসলাম। আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন এসেছেন। সেই মুহূর্তে শহীদুল ইসলামকে নিজের পরিচয় দিইনি। পরিচয় পেয়ে পাছে অপ্রস্তুত হন মুখের ওপরে বিরূপ মন্তব্য করার জন্যে । সত্য হলেও অপ্রিয় ছিল মন্তব্যটি। এম আর সিদ্দিকীর কাছে নামগুলো ছিল । একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন :

১। আশফাকুর রহমান খান, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, স্ক্রিপ্ট রাইটার ও এ্যানাউন্সার । ২। তাহের সুলতান, প্রোগ্রাম প্রডিউসার ও প্ল্যানার। ৩। টি এইচ শিকাদার, প্রোগ্রাম প্রডিউসার, স্ক্রিপ্ট রাইটার ও গীতিকার। ৪। শহীদুল ইসলাম, গীতিকার, স্ক্রিপ্ট রাইটার, এ্যানাউন্সার, নিউজম্যান, নিউজ রিডার ও

প্রোগ্রাম প্ল্যানার। ৫। আশরাফুল আলম, স্ক্রিপ্ট রাইটার, প্রোগ্রাম প্ল্যানার ও এ্যানাউন্সার। ৬। আলী রেজা চৌধুরী, নিউজ রিডার, এ্যানাউন্সার ও প্রোগ্রাম প্ল্যানার। ৭। মনজুর কাদের, এ্যানাউউন্সার ও নিউজ রিডার। ৮। নওয়াব জামান, ড্রাইভার। এবং ৯। মোহাম্মদ ফখরুল হোসেন, এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম প্রডিউসার, টি-ভি।

রটে গিয়েছিল, ঢাকা বেতার থেকে কয়েকজন সিনিয়ার অফিসার এসেছেন। কেবল একজন আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন— আশফাকুর রহমান খান। বলেছিলাম : এঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে খুবই ভালো হবে ।

পরের দিন দুপুরবেলা একটি পিক-আপ এসে দাঁড়িয়েছিল জেল রোডে। আমাদের ঘরের সামনে হর্ন বাজিয়েছিল। সামনের সিটে এইচ টি ইমাম ছিলেন। দেখেই বেরিয়ে এসেছিলাম ।

: এই বাড়িতে তো যাওয়া যাবে না। দরকারি আলাপ আছে। আপনি গাড়িতে উঠুন ।

গাড়িতে আশফাকুর রহমান খান ছিলেন পেছনের সিটে। শহরের একপ্রান্তে টিলার ওপরে একটি বাড়িতে নেমেছিলাম আমরা। এইচ টি ইমামের বাসস্থান।

ঢাকা থেকে আগত বেতারকর্মীদের কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তাই-ই আলোচ্য বিষয়। বলেছিলাম : আমি বি এস এফ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করতে পারি।

এইচ টি ইমাম বলেছিলেন : তা-ই করুন।

সেটা ছিল মে মাসের মাঝামাঝি সময় ।

কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী বলেছিলেন : এখানে আর ভিড় করে কাজ নেই। তোমরাও এখানে আর বেশিদিন নেই। আমাদের স্টেট মিনিস্টারের কাছে তোমরাই তো প্রস্তাব দিয়েছিলে পাওয়ারফুল ট্রান্সমিটারের জন্যে। সেই ট্রান্সমিটারের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। ফিফ্টি কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ।

: সেটা কোথায়?

: মুজিবনগরে— মানে, কলকাতায়। সেই ট্রান্সমিটার কিন্তু তোমাদের এজাইল গভর্নমেন্টের কনট্রোলে ছেড়ে দেয়া হবে। মুজিবনগরে গেলে তোমাদের আসল

নামেই চলতে-ফিরতে পারবে। ছদ্মনাম নিতে হবে না ।

বলেছিলাম : কিন্তু আমাদের ঢাকার সহকর্মীদের ব্যাপারে কি বলবেন ? তাঁরা তো এসে গেছেন । এখন কি করবেন?

কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী বলেছিলেন : তাঁরা মুজিবনগরে চলে যাক । অ্যাডভান্স গ্রুপ হিসেবে। ওখানে তোমাদের একজন এম-পি (এম এন এ) মি: মান্নান রেডিওর দায়িত্বে আছেন। বেতারকর্মীদের একটা তালিকা তৈরি হচ্ছে, যাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে গিয়ে মুজিবনগর পৌঁছচ্ছেন। তোমাদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছিলাম আমরা অ্যাডভান্স গ্রুপ হিসেবে। এখন নতুন নতুন অনেকেই এসে পড়ায় ওঁরাই বরং যাক ।

: মুজিবনগরে এঁরা কিভাবে যাবেন?

: সোজা কলকাতায় ৯ নং সার্কাস এভেন্যুতে বাংলাদেশ মিশন অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। মিশনের লোকরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মুজিবনগরে।

আশফাকুর রহমান খানকে মুজিবনগরে যাবার পথ জানিয়ে দিয়েছিলাম । দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল ২৫ মে ১৯৭১। ঐ দিন সকালবেলার অধিবেশনটি হবে শর্টওয়েভ থেকে আমাদের শেষ অধিবেশন। সকালবেলার অধিবেশন শেষ করে আমরা হাত গুটাবো। মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নেবো ।

৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে ২৫শে মে সন্ধেবেলা। অগ্রগামী দলটি সে ব্যাপারে প্রস্তুতি নেবেন। শর্টওয়েভের সর্বশেষ অনুষ্ঠান এবং মিডিয়াম ওয়েভের প্রথম অনুষ্ঠানের মধ্যে যেন কালক্ষয় এড়ানো যায়। স্থানান্তরের কারণে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারের ধারাবাহিকতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় ।

লিয়াজোঁ রক্ষা করেছিলেন কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী। বলেছিলেন : তোমাদের একটা কিউশিট এবং অনুষ্ঠানের স্কেলিটন আমাকে তৈরি করে দেবে মুজিবনগরের জন্যে ।

উত্তরে বলেছিলাম : কেন, বলুন তো? মুজিবনগরে তো আমাদের দক্ষ দক্ষ কর্মীদের সমাবেশ হয়েছে। বেতারের সিজন্ড ঘোষক-কথকরা রয়েছেন। ঢাকার বন্ধুরা ভালো ভালো গানের টেপ নিয়ে এসেছেন। ওঁরা আমাদের এখানকার চেয়ে অনেক সুন্দর অনুষ্ঠান তৈরি করে নেবেন ।

: তা হয়তো হবে। সেটা ধারাবাহিকভাবে হবে। এখন আমরা চাইবো, শ্রোতারা যেন বুঝতে পারেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একই কেন্দ্র । শুধু নতুন ট্রান্সমিটার থেকে প্রচার করা হচ্ছে।

কিউ শিট তৈরি করে দিয়েছিলাম। অধিবেশনের প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি ঘোষণা-লিপিসহ ।

আগরতলা পর্যায়ে শেষের দিকে দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের রূপরেখা দাঁড়িয়েছিল এরকম: প্রথম অধিবেশন : সকাল ৮.৩০ মি: থেকে ৯.৩০ মি: (বাংলাদেশ সময়) : (স্থিতিকাল এক ঘণ্টা ।

অনুষ্ঠানমালা : বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ, পত্রপত্রিকার মন্তব্য, দু'টি কথিকা (মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণামূলক) ও সঙ্গীত।

দ্বিতীয় অধিবেশন : বিকেল ৫.০০ মি: থেকে সন্ধে ৭.০০ মি: অথবা রাত ৮.০০ মি: থেকে রাত ১০.০ মি: (বাংলাদেশ সময়) : স্থিতিকাল ২ ঘণ্টা (কোনো কোনো সময় আড়াই ঘণ্টা)।

অনুষ্ঠানমালা : বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ, বাংলায় সংবাদ পর্যালোনো, ইংরেজি বিশ্ব সংবাদ শিরোনাম, বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি পাঠ, রেডিও পাকিস্তানের বক্তব্যের ওপর কাউন্টার প্রোগ্রাম এবং স্লোগান সহকারে সঙ্গীত ।

২৪ মে কলকাতার উদ্দেশে আমাদের শারফুজ্জামানকে যাত্রা করিয়ে দেয়া হয়েছিল । কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী একটি ট্রাঙ্ক গুছিয়ে দিয়েছিলেন। ওতে ছিল একটি ডিস্ক রেকর্ডার, একটি টেপ রেকর্ডার, বাণীবদ্ধকৃত অনুষ্ঠানসম্ভারের টেপ ইত্যাদি। আগরতলা বিমান বন্দর থেকে ড. এ আর মল্লিকের পরিবার-পরিজনকে শারফুজ্জামান সফর-সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন। দমদম বিমান বন্দরে বি-এস-এফ-এর লোক প্রতীক্ষিত থাকবেন বলে কর্নেল শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী জানিয়ে দিয়েছিলেন। বিমানপথে গৌহাটিতে যাত্রা বিরতি এবং ২৫ মে সকালের ফ্লাইটে গৌহাটি থেকে দমদমে নেমেছিলেন শারফুজ্জামান। তখন সকাল ৯টা। এদিকে বিমানের সিডিউল বিঘ্নিত হওয়ায় দমদমে পৌঁছেই অপেক্ষমান কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে বিমান বন্দরের নিরাপত্তা-কর্মীদের সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরা এদিক-সেদিক যোগাযোগ করে কাঙ্ক্ষিত অভ্যর্থনাকারীকে শারফুজ্জামনের সামনে হাজির করিয়েছিলেন। কনেল

শঙ্করপ্রসাদ বার্ণার্জী একটি ‘কোড’-শব্দ বলে দিয়েছিলেন। আগন্তক পি কে কাউলকে সেই শব্দের মাধ্যমে জেনুইন মেনে নিয়ে ট্রাঙ্কসহ তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন শারফুজ্জামান ।

দুপুরে পৌঁছেছিলেন মুজিবনগরে । তখন ওখানে আগাম গ্রুপ, তথা ঢাকা বেতারের সহকর্মীরা অনুষ্ঠান প্রযোজনা/বাণীবদ্ধকরণের কাজে নিয়োজিত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠানমালা।

২৫ মে সন্ধ্যায় আগরতলায় বসেই আমরা টিউন করেছিলাম মুজিবনগর । চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম অধিবেশন । ২৬ মে দুপুর আমাদের মধ্যে দু'জন মুস্তফা আনোয়ার ও আমি মুজিবনগরে পৌঁছেছিলাম। অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতিতে ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ (৮১৯ কিলোহার্জ) থেকে থেকে দু'টিমাত্র অধিবেশন প্রচারিত হয়েছিল এবং তা পূর্বপরিকল্পিতভাবেই ।

তার আগে ২৪ মে অপরাহ্নে আগরতলায় আমরা সবাই সম্মিলিত হয়েছিলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-দলের দশজন এবং সুব্রত বড় য়া। ১ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারটি ডিসমেন্টাল করা হয়েছিল। সৈয়দ আবদুশ শাকের, রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম চৌধুরী ও কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ উঠে এসেছিলেন জেল রোডের বাড়িতে । মাসীমার রান্নাবান্নার বহর বেড়েছিল । দুলালের বাজারের থলি ভারি হয়েছিল।

১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি রামগড়ে আনা হয়েছিল ১০ এপ্রিল বেলা ২টায়। রাশেদুল হোসেন ও আমিনুর রহমান রামগড় থেকে পটিয়া ফিরে গিয়েছিলেন ট্রান্সমিটারের জন্যে । গিয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর জিপে। ফটিকছড়ি হয়ে হাটহাজারি- গহিরা-মদনহাট-রাঙ্গুনিয়া-পাহাড়তলি-চন্দ্রঘোনা-কাপ্তাই। কর্ণফুলি নদী পার হয়ে বান্দরবান-দোহাজারি-পটিয়া, পটিয়ায় মেজর মীর শওকত আলীর সঙ্গে তাঁদের দেখা। কিন্তু পটিয়া মাদ্রাসায় ট্রান্সমিটারটি ছিল না। সরিয়ে নেয়া হয়েছিল বান্দরবনের সি এন্ড বি গুদামে। রাশেদুল হোসেন ও আমিনুর রহমান ৮ এপ্রিল সকালে দোহাজারি হয়ে বান্দরবানে পৌঁছেছিলেন। ওয়াপিদা-র একটি পিক-আপ-এ তোলা হয়েছিল ট্রান্সমিটার ও যন্ত্র সরঞ্জাম। আবার ফিরতি পথচলা । চন্দ্রঘোনা হয়ে রাঙ্গুনিয়া-পাহাড়তলি-মদনহাট-গহিরা-হাটহাজারি-ফটিকছড়ি ।

১০ এপ্রিল ট্রান্সমিটারসহ পাঁচজন কর্মী বাগাফায় পৌঁছেছিলেন । তার দু'দিন আগেই আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শালবাগানে। দশজন কর্মীর বিচ্ছিন্নতা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার ইনস্টল করার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল বাগাফা-বেলোনিয়া সড়কসংলগ্ন ফরেস্ট হিল-এ। বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দশ মাইল দূরে।

অযত্নে এবং অদক্ষ হাতে তাড়াহুড়ো করে ডিসমেন্টাল করে নেয়া হয়েছিল ট্রান্সমিটার । কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন থেকে । সঙ্গে ছিল না কোনো গাইড বুক । সৈয়দ আবদুশ শাকের একমাত্র বেতার প্রকৌশলী। তিনজন সহযোগী রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান ও রেজাউল করিম চৌধুরী। ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ১২ এপ্রিল যথাযথভাবেই ইনস্টল করেছিলেন তাঁরা। এবং নিজেদের কণ্ঠে ঘোষণা প্রচার, রেকর্ডের গান প্রচার ছাড়াও সৈয়দ আবদুশ শাকের নিজের লেখা কথিকাও প্রচার করেছিলেন । একবার মাত্র মে মাসের গোড়ার দিকে আগরতলায় এসেছিলেন সৈয়দ আবদুশ শাকের । আমাদের কাছ থেকে কিছু অনুষ্ঠানসম্ভার নিয়ে গিয়েছিলেন।

এ পর্যায়ে নিজের একটি স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ। সহকর্মী আমিনুর রহমান ও রাশেদুল হোসেনের দেয়া তথ্যসম্বলিত । ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল নিবন্ধটি। শিরোনাম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রসঙ্গে'। অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

পত্রান্তরে আমি বলেছি : এ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা একটি স্বত:স্ফূর্ত ব্যাপার । বহু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা এবং কর্মতৎপরতা ২৬ মার্চ '৭১ সালে অনুরূপ একটি বেতার কেন্দ্রের জন্ম দিয়েছে ।

সাধারণভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দশজন বিপ্লবী কর্মীর নাম বিশেষভাবে উচ্চারিত। ....

আমাদের দশজন প্রাথমিক কর্মীর প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদ আলাদা অভিজ্ঞতা । কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একক কৃতিত্ব যেমন কারুর নেই, তেমনি একক বর্ণনায় প্রত্যেকের কর্মতৎপরতার কথা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশেরও অবকাশ নেই।

প্রকৌশল বিভাগীয় আমার দু'জন সহকর্মী রাশেদুল হোসেন ও আমিনুর

রহমানের কিছু অভিজ্ঞতা এই নিবন্ধে উল্লেখ করছি— যা আমি মনে করি, আমাদের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ।

আমিনুর রহমান বলেন,

২৭ মার্চ '৭১ বিকেল ৪টার সময় আমি রাশেদ ও জামানসহ জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। পরে আমি কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সান্ধ্য অধিবেশনে যোগদান করেছিলাম। (উল্লেখ্য, মেজর জিয়া সেদিনই তাঁর প্রথম ভাষণ প্রচার করেছিলেন)।

এর আগে ২৬ মার্চ '৭১ সকালে বাসায় বসে তৎকালীন প্রাদেশিক অনুষ্ঠানে মার্শাল ল রেগুলেশন প্রচারের আগাম ঘোষণা শুনেই আমি বেতার ভবনে ছুটে এসেছিলাম । সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী মহীউদ্দিন। কন্ট্রোল রুমে তখন শিফ্ট-ইন-চার্জ ছিলেন হারুন- অর-রশিদ। এছাড়া ছিলেন অনুষ্ঠান বিভাগীয় মুস্তফা আনোয়ার। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ঢাকা থেকে সম্প্রচার বন্ধ রাখার । তবে টিক্কা খানের ঘোষণা রেকর্ড করে নিয়েছিলাম অফ-দ্য এয়ারে।

সেটা শুনেই বুঝেছিলাম আমাদের কিছু করা প্রয়োজন। তখন ট্রান্সমিটারের বন্ধুদেরকে তালা বন্ধ করে চলে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলাম ।

আমরাও বেতার-ভবনে তালা লাগিয়ে সব চাবি সিকিউরিটি গার্ডকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর আমার টি এন্ড টি কলোনির বাসায় এক বৈঠক করেছিলাম— বৈঠকে ছিলেন মুস্তফা আনোয়ার, সৈয়দ আবদুশ শাকের, রাশেদুল হোসেন ও মহীউদ্দীন । বৈঠকে ঠিক করেছিলাম বেতার চালু করবো বলে।' (উল্লেখ্য, মহীউদ্দীন ছাড়া বাদবাকিরা পরবর্তীকালে কালুরঘাটে এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেছিলেন ....)।

রাশেদুল হোসেন ...এ মর্মে বর্ণনা দেন :

‘মেজর জিয়া আমাকে ও আমিনকে ট্রান্সমিটারটি নিয়ে আসার জন্যে মুক্ত অঞ্চল থেকে পটিয়া পাঠালেন ৫ এপ্রিল '৭১। সঙ্গে দুজন সশস্ত্র জোয়ান ও বন্ধু নসরুল্লাহকে দিলেন । সেদিন রাত ১০টায় আমরা দুটি জিপে যাত্রা করলাম। পাকা রাস্তায় পাকিস্তানি সৈন্যদের আনোগোনা থাকতে পারে বলে নিরাপদ পথ হিসেবে আমরা ফটিকছড়ি- নাজিরহাট কাঁচা রাস্তাটি বেছে নিলাম। আমাদের যাত্রা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো। উঁচুনিচু পাহাড়ি

রাস্তায় গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় আমরা ফটিকছড়ি বন বিভাগীয় একটি বাংলোয় রাত কাটালাম । ৬ এপ্রিল ভোরে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম । গাড়িতে নাজিরহাট, হাটহাজারি হয়ে গহিরা এবং গহিরা থেকে পায়ে হেঁটে বিকেল প্রায় ৪টায় আমরা রাঙ্গুনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে কাপ্তাই-চট্টগ্রাম সড়কে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে পৌছে লে: মাহফুজ-এর কাছ থেকে জানতে পারলাম, কর্ণফুলি ব্রিজ-এর নিকট ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং সড়কপথে পটিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমরা পথ-পরিবর্তন করে রাত ৯টার দিকে কাপ্তাই পৌঁছলাম । স্থানীয় কর্মীরা জানালেন চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলি নদীর ওপার থেকে বান্দরবান পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে। বান্দরবান থেকে পটিয়া যাবার রাস্তার সন্ধানও তাঁরা দিলেন। অবশ্য এ রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যাবে কি না, তা তাঁরা সঠিক করে বলতে পারলেন না । ৭ এপ্রিল কাপ্তাই থেকে একটি পিকআপ ভ্যান জোগাড় করা হলো ট্রান্সমিটার আনার জন্যে। আমাদের মারফতে মেজর শওকতের কাছে পৌঁছাবার জন্যে ক্যাপটেন হারুনের রেখে যাওয়া কিছু রসদ দেয়া হলো। দুই গাড়ি বোঝাই রসদ নিয়ে আমরা সকাল ৮টায় কাপ্তাই থেকে রওনা হলাম। চন্দ্রঘোনায় পৌঁছে অনেক কষ্টে নৌকোর সাহায্যে গাড়িগুলো ওপারে নেয়া হলো। এবার শুরু হলো আমাদের দুর্গম পথযাত্রা । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হয়তো এই রাস্তা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল— এখন এ রাস্তায় গাড়ি চালানো সত্যি বিপজ্জনক। পথে বেলা ৩টায় আমরা একজন চাকমা চেয়ারম্যানের বাড়িতে কিছু খাবার খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যে ছ'টায় আমরা বান্দরবান পৌছলাম । পথে কয়েকবার আমাদের গাড়ি রাস্তার গর্তে আটকা পড়ে। স্থানীয় লোকেরা হাত লাগিয়ে গাড়ি তুলে দেন ।

বান্দরবান থেকে দোহাজারি পর্যন্ত অর্ধেক পথ কাঁচা রাস্তা— সম্পূর্ণ রাস্তাই পাহাড়ি । রাত প্রায় দশটায় আমরা পটিয়া কলেজে মেজর শওকতের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং মেজর জিয়ার পত্রখানা তাঁকে দিলাম ।

পটিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে জানলাম, আমাদের ট্রান্সমিটারটি এখানে নেই— সেটা দোহাজারি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেজর শওকত দোহাজারি আওয়ামী লীগ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে খবর নিয়ে জানালেন, ট্রান্সমিটার ইতোমধ্যে বান্দরবান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে রাতটি আমরা পটিয়ায় কাটালাম ।

৮ এপ্রিল ভোরে আমরা আবার দোহাজারির পথে যাত্রা করলাম। দোহাজারির

দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে নিয়ে বেলা ১২টায় বান্দরবান পৌঁছে সেখানে সি এণ্ড বি'র গুদামে রক্ষিত আমাদের ট্রান্সমিটারটি গাড়িতে তুললাম । বেলা ২টার সময় সেখান থেকে যাত্রা করে পথে কোথাও বিশ্রাম না নিয়ে রাত প্রায় ৯টার সময় আমরা নাজিরহাট এবং নাজিরহাট থেকে পরদিন সকাল ৭টায় রওনা দিয়ে বেলা ২টার সময় আমরা রামগড় পৌছলাম ।

১০ এপ্রিল ট্রান্সমিটার মুক্ত অঞ্চলের নির্বাচিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আমরা পাঁচজন কর্মী শাকের, আমিন, রেজাউল করিম, হাবিবউদ্দীন ও আমি ইনস্টলেশনের কাজে লেগে গেলাম । উল্লেখ্য, আমাদের সঙ্গে কোনো গাইড বুক ছিল না । কিন্তু সার্কিট ডায়াগ্রামের ওপর নির্ভর করে আমরা ইনস্টলেশনের দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছিলাম। ১২ এপ্রিল আমরা এক কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটার থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার করি ।.....

সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কর্তৃপক্ষ একই ফ্লাইটে দু'টির বেশি টিকিট দিতে অপারগ হয়েছিলেন । ২৬ মে দুপুরের ফ্লাইটের টিকিট দু'টিতে দমদম যাত্রী হয়েছিলাম আমি ও মুস্তফা আনোয়ার । একে একে অন্যান্যরা কলকাতায় পৌঁছেছিলেন পরবর্তী কয়েকদিনে । টিকিটের টাকা বাংলাদেশ সরকারের দেয়া। পাকিস্তানি টাকা দেয়া হয়েছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে। তাঁরা ভারতীয় টাকায় পাল্টে দিয়েছিলেন। আমাদের জেল রোডের বাড়ি ভাড়া এবং খাওয়া-খরচের টাকাটাও হয়তোবা ছিল তেমনি ।

দেশমুখ-এর কাছ থেকে দুই দফায় পেয়েছিলাম দু'হাজার টাকা— খাওয়া-খরচের জন্যে । সব টাকা খরচ হয়নি। উদ্বৃত্ত টাকা থেকে মাসীমাকে একটি পরনের কাপড় কিনে দিয়েছিলাম। পরে ক্র্যাফটস্ ইন্সিটিটিউট-এ বেগম মুশতারী শফীর সঙ্গে মাসীমার পরিচয় হয়েছিল। বলেছিলেন : মা, তোমার দেওর মোহনের কথা ভুলতে পারি না । আমাকে এই শাড়িটা দিয়ে গেছে। মোহনের মতো ছেলে হয় না।

জি-পি-শাউ বলেছিলেন : দাদা, দেশে যখন ফিরে যাবেন, আমাদের কথা মনে থাকবে তো! আজ হোক, কাল হোক, আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যাবেনই। আমার কিন্তু একটা জিনিসের খুব শখ। একটা বিদেশী শেভিং মেশিন। হাতলের সাথে ফিট করা থাকে— প্যাচ ঘোরালে পদ্মফুলের মতো দল মেলে। ব্লেডটা লাগিয়ে আবার প্যাঁচ ঘোরাতে হয়।

দেশে ফেরার পর জি-পি-শাউকে চিঠি লিখেছিলাম। সি-২, ভি এম হসপিটাল কম্পাউন্ড আগরতলা ঠিকানায়। উত্তর পাওয়া যায়নি।

বিদেশী জিনিসের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল পরে। এবং অত্যন্ত নগ্নভাবে। এমনিতে ভারতে আলপিন থেকে বিমান পর্যন্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা বিদ্যমান। পথেঘাটে শুধু নিজস্ব উৎপন্ন অ্যামবাসাডর মোটর গাড়ি। কিন্তু বিলাস - ব্যাসনের সহজাত প্রবৃত্তি এখনো অটুট। প্রমাণিত হয়েছিল, ১৬ ডিসেম্বর পর বাংলাদেশে তাঁদের বিরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখে। শহর-বন্দর-সেনানিবাস থেকে বিদেশী সৌখিন দ্রব্য তাঁরা দু'হাতে লুটে নিয়েছিলেন। বাধা দিতে গিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন বাংলাদেশের মেজর এম এ জলিল ।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটি গল্প বলেছিলেন। একটা ছাগলকে তাড়া করেছিল একটা হিংস্র বাঘ । একজন মৌলবি তখন বাঘের হাত থেকে ছাগলটিকে রক্ষা করেছিলেন। মৌলবি ঘাস-পাতা খেতে দিয়ে ছাগলটিকে তাজা করে তুলেছিলেন । একদিন ছাগলটিকে জবাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ছাগল বলেছিল : আপনি সেদিন আমাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন নিজেই আমাকে খাবেন কেন?

উত্তরে মৌলবি বলেছিলেন : বাঘ তোমাকে হারাম খেতে চেয়েছিল। আমি তো তোমাকে হালাল করেই খাবো ।

আগরতলা জেল রোডের বাড়িতে উঠে আসার পর স্বস্তিবোধ করেছিলাম। তখন অর্থাৎ এপ্রিল ১৯৭১-এর শেষ ভাগে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলাম । ডায়েরি রক্ষা করিনি। দ্রুতহাতে ছিন্নপত্রে লিখিত বিবরণীটিতে উল্লেখিত হয়েছিল সমগ্র কার্যক্রম। সেই বিবরণীর শেষতম তথ্যটি ছিল :

পরে ১৭ এপ্রিল পটিয়া মাদ্রাসায় অর্থাৎ যেখানে আমরা দু'দিন ১-কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার নিয়ে অবস্থান করেছিলাম, সেখানে বোমা ফেলে পাকিস্তানিরা। এ ছাড়া সে এলাকার এম-এন-এ অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীর সদস্যপদ বাতিল করার জন্যে ট্রান্সমিটার চুরির অজুহাত দেখানো হয়। (২৭-৪-৭১, আগরতলা)

একটি ঘোষণা সরবরাহ করেছিলেন আগরতলার সংগ্রামী কর্তৃপক্ষ। ১৬ এপ্রিল '৭১-এ আমরা তা প্রচার করেছিলাম। ঘোষণাটি ছিল :

“স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের নিশ্চিহ্ন করার এক জঘন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। এ ব্যাপারে তারা হানাদার বাহিনীকে পরিচালিত করার জন্যে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছে— তা হচ্ছে, তাদের নিয়োজিত গুপ্তচররা পূর্বাহ্নে গিয়ে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ির সামনে ক্রস চিহ্ন দিয়ে আসে, যাতে হত্যাকারী পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা সেই চিহ্ন ধরে তাদের বর্বর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারে ।

বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যেন অনুরূপ ক্রস চিহ্ন কোনো বাড়ির সামনে দেখা গেলেই তা সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলা হয় ।

এপ্রিল-মে' ৭১ মাসে আগরতলায় বেশ কয়েকটি প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়েছিল । ‘বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামীদের সদর দপ্তর থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত'। এই দুটি প্রচারপত্র আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রচার করেছিলাম :

১। ‘দেশবাসীর প্রতি বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর আবেদন :

স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম চলছে। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে ।

খোদাতায়ালার ইচ্ছায়, আমরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবই! পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। কারণ, আমরা আমাদের জনগণের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছি ।

বাংলাদেশের মানুষ অতি কষ্টে ফসল উৎপাদন করেছে। আর গত ২৩ বৎসর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই ফসল ভোগ করেছে।

আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে রক্তশোষণকারী পশ্চিম পাকিস্তানি জোঁকদের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাতে ফল হয়নি। কাজেই এখন আমরা অস্ত্রের সাহায্যে তাদের দূর করব।

যদি এই সময়ে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে তাড়াতে না পারি, তাহলে আগামী ২০ বৎসর পর্যন্ত আমাদের সম্পদ আরও নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করবে। তখন আমাদের একটি শিশুও বেঁচে থাকবে না। আমরা বাঙালি, আমরা বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করছি। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য আমরা যুদ্ধ করছি।

এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। প্রত্যেকটি বাঙালি এই কর্তব্য পালন করতে নীতিগতভাবে বাধ্য ।

বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গলের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিরা উদাসীন। বাংলাদেশের সবুজ মাঠে যে সোনার ফসল ফলে শুধু তারই প্রতি তারা আকৃষ্ট। বাংলাদেশের পাট, চা, চাউল এবং অন্যান্য ফসলের প্রতি তাদের লোভ। এই সব ফসল থেকে যে আয় হয় তার সবটাই খরচ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতির জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের সকলকে মেরে ফেলতে চায়। কারণ, তাহলে আমাদের দেশ তারা নিজেরা দখল করে বসতে পারবে।

তারা আমাদের ধ্বংস করবে— এ আমরা সহ্য করব না। আমাদের কাছ থেকে তারা আমাদের মাতৃভূমি ও আমাদের দেশকে ছিনিয়ে নেবে— এ আমরা বরদাস্ত করব না। যে বাঙালি শত্রুসৈন্যদের সাহায্য করবে, সে তার নিজের জনগণের কাছে বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচিত হবে । বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এই বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেবে ।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা সবাই বাঙালি স্বেচ্ছাসেবক। খাদ্য, আরাম ও বেতন ছাড়াই আমরা সবাই দেশের জন্য যুদ্ধ করছি, প্রাণ দিচ্ছি।

আমরা কখনও বাংলাদেশের জনগণকে ছেড়ে যাবো না ।

পশ্চিম পাকিস্তানি শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। আমরা— মুক্তি বাহিনীর জোয়ানরা রয়েছি আগেভাগে । জনগণকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে আমাদের পেছনে ।

পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের আমরা দিনের পর দিন দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমরাও যুদ্ধ করতে জানি এবং তাদের ধ্বংস করতে পারি । সমগ্র বাংলাদেশ— সিলেট থেকে কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম ও রাজশাহী থেকে যশোর, শত শত পাকিস্তানি সৈন্যকে আমরা হত্যা করেছি এবং সব জায়গাতেই তাদের গতিরোধ করছি।

যতই দিন যাবে আমাদের মুক্তিবাহিনী ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং অধিক সংখ্যায় পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যা করবে। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে আমরা পাকিস্তানিদের পরাজিত করবোই।

আপনারা সংকটে ধৈর্যশীল হউন, শত্রুসৈন্যের কার্যকলাপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। অন্তরে আস্থা রাখুন— যে আমরা ন্যায়ের পথ অবলম্বন করেছি! সারা

পৃথিবীর মানুষ আমাদের সমর্থন করবে।

কিছুসংখ্যক লোক কোনো কোনো সময় দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলাদেশের মানুষকে আরও বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে । উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া আমাদের কোনো পথ নেই । এই পথই আমাদের মহান পথ, আর এই পথ ধরেই আসবে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের মুক্তি।'

২। 'স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলী : দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

হানাদার পাকিস্তানি পশুশক্তিকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে হটিয়ে দেবার ও বাঙালিকে শোষণমুক্ত করে একটি নতুন সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার দীপ্ত শপথ ও ব্রত নিয়ে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ও নেতৃত্বে গত ১২ এপ্রিল রাত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার থেকে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার পর থেকে মুক্তি সংগ্রাম ঠিক পূর্বের মতই এক সুস্পষ্ট গতিতে চলছে। প্রতিটি বাঙালি আজ নিজ নিজ ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলে সংকল্পকে দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ়তর করে তুলেছে। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশ্বাসঘাতক জঙ্গি পশু সরকারকে বিনাশ করে বিশ্বের দরবারে আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে বলে— বাঙালির যুদ্ধ আজ আরও তীব্রতর, বিশ্বাস আজ অটুট, প্রতিটি বাঙালি আজ সংগ্রাম থেকে অবিচ্ছিন্ন।

বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে এ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন স্বাধীন বাংলার মহানায়ক বাঙালির প্রিয় বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর তাঁর সহকারী হিসেবে রয়েছেন ত্যাগী ও শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ ।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব অতিরিক্তভাবে তাঁর ওপর ন্যস্ত। খন্দকার মোশতাক আহমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত। স্বাধীন বাংলা সরকারের মন্ত্রী পরিষদে আর যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন জনাব মনসুর আলী, জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান ।

জনযুদ্ধের আশু সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি কতগুলো

নির্দেশাবলী জারি করেছেন ।

পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী ও তাদের ভাড়াটিয়া হানাদার সৈন্যবাহিনী আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের ওপর নগ্ন পৈশাচিক বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাঙালির অপরাধ, তারা অবিচারের অবসান চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ, তারা তাদের মা-বাপ, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততিদের জন্যে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার দাবি জানিয়েছে । বাঙালির অপরাধ, তারা মানুষের মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে বাঁচতে চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ, আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট এ পৃথিবীতে, আল্লাহর নির্দেশমত সম্মানের সাথে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ, মহান স্রষ্টার নির্দেশমত অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংকল্প ঘোষণা করেছে ।

মানবতার বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনী দানবিয় শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের সহায় আধুনিক মারণাস্ত্র আর আমাদের সহায় পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার সাহায্য, বাংলাদেশের জনসাধারণের অটুট মনোবল, মুক্তিলাভের দৃঢ় সংকল্প, শত্রু সংহারের অবিচল প্রতিজ্ঞা ।

বাংলাদেশের এ সংগ্রামে দল, মত, শ্রেণী, ধর্ম নেই। বাংলার মাটি, পানি, আলো, বাতাসে লালিত-পালিত মানুষের আজ একমাত্র পরিচয় আমরা বাঙালি। তাই বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, ধনিক-বণিক, নারী-পুরুষ সকলকেই মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা করতে হবে, মুক্তি সৈনিকের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। বাংলার মাটি থেকে শত্রুকে উৎখাত করার জন্যে প্রত্যেককেই এগিয়ে যেতে হবে!

নির্দেশাবলী :

১। প্রতি শহর/গ্রামে/মহল্লায় এক একজন অধিনায়ক নির্বাচিত করে সমাজ জীবনে শৃংখলা রক্ষা করতে হবে আর সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে শত্রুর সাথে অসহযোগ প্রতিরোধ সংঘাতের দূর্বার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ।

২। নিজ নিজ এলাকার খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদার হিসাব রাখতে হবে আর চাহিদা মেটাবার জন্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াবার আর

সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে হবে ।

৩। কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কার্যাকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। আদেশ অমান্য করলে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৪। দৈনন্দিন জীবনে সংযম ও কৃচ্ছতা চালিয়ে যেতে হবে। সর্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে পারস্পরিক মমত্ববোধে ভ্রাতৃত্বের হাতকে দৃঢ়তর করতে হবে। আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে আত্মনির্ভরশীল বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ।

৫। শত্রুকে চিনতে হবে। অবাঙালি সামরিক বেসামরিক শত্রু তো আছেই। তারা কমবেশি চিহ্নিত। মারাত্মক হলো ঘরের শত্রু। ধর্মের দোহাই দিয়ে, অখণ্ডতার বুলি আওড়িয়ে, কালোবাজারি মজুতাদারির বেশে শত্রুর চর সরলপ্রাণ বাঙালির আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। এরা দোস্ত হিসাবে মনে ঠাঁই পেতে চায়। একবার ওদের খপ্পরে পড়লে আর নিস্তার পাওয়া যাবে না। এ ধরনের লোককে চিনে রাখতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতার পথ ছেড়ে দেয়ার জন্যে তাদের বলতে হবে। তবুও যদি তাদের শুভবুদ্ধির উদয় না হয় তখন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তাদের নাম ঠিকানা জানিয়ে দিতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ দেশদ্রোহীর নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করবেন ।

৬। গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মুক্তিবাহিনীর নিকটতম শিক্ষণ-শিবিরে রক্ষীবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও এরা প্রয়োজনে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন।

৭। গ্রাম/শহর অথবা মহল্লার নেতারা নিজেদের মধ্যে নেতা নির্বাচন করে গ্রাম গ্রামান্তরে যোগাযোগ ও পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা রক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালাবেন। এর উপরের স্তরের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকবে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে।

৮। বাংলাদেশের সকল মুক্ত এলাকায় সরকারি, আধাসরকারি, বেসামরিক কর্মচারীরা স্তরে স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশে কাজ করবেন। শত্রু কবলিত এলাকায় জনপ্রতিনিধিরাই ব্যক্তি বিশেষ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করবেন।

৯। সকল সামরিক, আধাসামরিক, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি কর্মচারী অনতিবিলম্বে নিকটতম মুক্তিসেনা শিবিরে যোগ দেবেন এবং কোনো অবস্থাতেই শত্রুর সহযোগিতা করবেন না ।

১০। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষভাবে নৌ-চলাচল সংস্থার কর্মচারীরা কোনো অবস্থাতেই শত্রুর সাথে সহযোগিতা করবেন না এবং যতদূর সম্ভব যানবাহনাদি নিয়ে মুক্ত এলাকায় চলে আসবেন।

গুজবে কান দিবেন না । গুজব রটাবেন না । নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবেন না । মনে রাখবেন আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম । পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার দুশমন বাঙালি মুসলমান নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা কাউকে হত্যা করতে, জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। মসজিদের মিনারে আজান প্রদানকারী মোয়াজ্জেন, মসজিদে-গৃহে নামাজরত মুসল্লি, দরগাহ মাজারে আশ্রয়প্রার্থীও হানাদারদের গুলি থেকে বাঁচেনি। এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম । সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'য়ালার ওপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকুন।

স্মরণ করুন, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন : অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর। বিশ্বাস রাখুন : আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।

জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। জয় বাংলা ।

২৬ মে দুপুরে কলকাতায় পৌছে প্রথমেই একটা খাতায় নাম লিখেছিলাম। নিজের এবং সহকর্মীদের । যারা তখনো আগরতলায় । খাতাটি আগেই খোলা হয়েছিল । সংগ্রামী সরকারের বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এম-এন-এ আবদুল মান্নানের অফিসে। ২১-এ, বালু হাক্কাক লেন-এ। সেটা ছিল সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' পত্রিকার অফিস। আবদুল মান্নান ছিলেন সম্পাদক। আহমদ রফিক ছদ্মনামে। সেই পত্রিকার সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন অনু ইসলাম। প্রকৃত নাম নজরুল ইসলাম। রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক। ‘জয় বাংলা' পত্রিকার প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে ফেরি করা পর্যন্ত সব কাজেই সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে নিয়মতান্ত্রিক নিযুক্তি পেয়েছিলেন । তবে শেষ দিন পর্যন্ত ‘জয় বাংলা'র অফিসেই কর্মব্রতী ছিলেন অনু ইসলাম ।

রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক শামসুল হুদা চৌধুরী এবং মেসবাহউদ্দীন

আহমেদ মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পৌছেছিলেন কলকাতায়। শামসুল হুদা চৌধুরী দায়িত্ব নিয়েছিলেন বেতারকর্মীদের তালিকা সংরক্ষেণের। ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের অনুষ্ঠান শুরু করার প্রস্তুতিপর্বে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এম আর আখতার, পটুয়া কামরুল হাসান ও আমিনুল হক বাদশা। আমিনুল হক বাদশা এপ্রিল মাসের শেষ দিকেই আগরতলা থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

আগরতলা থেকে আমার সঙ্গে আলোচনাক্রমে ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক আশফাকুর রহমান কলকাতা পৌছেছিলেন ২৩ মে। সঙ্গে ছিলেন অনুষ্ঠান প্রযোজক টি এইচ শিকদার ও তাহের সুলতান। এই তিনজনই ২৫ মে-র অধিবেশনের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা গ্রহণ ও উপস্থাপনায় সর্বতো ভূমিকা নিয়েছিলেন। আগরতলা থেকে আমার সরবরাহকৃত সিডিউল থেকে শুধু কেবল উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ঘোষণাটি নেয়া হয়েছিল। আর নেয়া হয়েছিল সূচক সুর হিসেবে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' রেকর্ডের গানটি।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নং দ্বিতল বাড়িটি। ওখানে নিচের তলায় এক কক্ষে ছিলেন এম মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাক আহমদ। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রথম কক্ষে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মাঝের কক্ষটিতে তাজউদ্দিন আহমদ । শেষতম কক্ষটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও। বাংলাদেশের নির্বাসিত সরকারের অপর মন্ত্রী কামরুজ্জামান অন্যত্র থাকতেন।

খাবারের ঘর ছিল নিচের তলায়। মন্ত্রী ও নেতারা আগে খেতেন নেপালি দারওয়ানের প্রহরায়। পরে বেতারকর্মী ও অন্য অভ্যাগতরা। তখন হাতাহাতি মাতামাতি। একদিন রাবারের ছাগ-মাংস দাঁতে চেপে এম আর আখতার বলেছিলেন : মনে হয়, কুত্তার মাংস চিবোচ্ছি ।

প্লেটের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। যার আগে যে নিতে পারে। একদিন শেখ কামাল আমার সঙ্গে এক পাতে খেয়েছিলেন প্লেটের অভাবে এবং খিদেয় তর সইছিল না বলে । তাছাড়া শেষকালে খাবার ফুরিয়ে যাবার আশঙ্কাও ছিল ।

ক্রমেই আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছিল। বেতারকর্মী ছাড়াও কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যযন্ত্রী, কথক-লেখকরাও এ-বাড়িতে উঠে এসেছিলেন। মন্ত্রীরা দিন কয়েকের মধ্যেই সরে গিয়েছিলেন। সি আই টি রোড-এ আশু ঘোষের বাড়িতে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কক্ষে আমি পেয়েছিলাম একটি

কালো গগল্‌স, একটি কাঁচ চিড় ধরা এবং পোস্টাফিসের ছাপ-মারা একটি এরোগ্রাম। ওতে ঠিকানা ছিল :

Hon 'ble Sayeed Nazrul Islam

Acting President, Sovereign Democratic Republic of Bangladesh

Bangladesh Kutnaitik Mission, Calcutta

পরে এক সময় আমি গগল্‌সটি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ফেরৎ দিতে গিয়েছিলাম । তিনি বলেছিলেন : ওটা তুমি রেখে দাও ।

এরোগ্রামটিও আমার কাছে সংরক্ষিত। অনুরূপ আরেকটি পোস্টাল খাম পাওয়া গিয়েছিল আবদুস সামাদ আজাদের নামে। ঠিকানা :

Janab M. A. Samad (Azad)

(Mujibnagor).

8/57, Baliganj Circular Road, Calcutta.

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটি গলিপথের সর্বশেষ বাড়ি। তারপরেই মোষের খাটাল । কর্দমাক্ত প্রাঙ্গণ ।

মন্ত্রীরা চলে যাবার পর বালিগঞ্জের বাড়িতে রান্নাবান্না রহিত হয়েছিল । তখন থেকে আমরা যার যার সুবিধামতো হোটেল-রেস্তোরাঁয় চলে যেতাম। প্রধানত গড়িয়াহাটায় যাতায়াত করতাম আমরা। ট্রামে ২০ পয়সা লাগতো। এ ছাড়া উল্টো পথে অপর একটি খাওয়ার হোটেল খুঁজে বের করেছিলেন কামাল লোহানী। সেখানে যেতে হতো ট্যাক্সিতে।

একবার আউটিং-এর সুযোগ হয়েছিল। মেদিনীপুরের কোলাঘাট-এ। রূপনারায়ণ নদীর তীরে । উপলক্ষ ছিল তাহের সুলতানের বিয়ে। তারিখ ৩০ জুলাই ১৯৭১। সেটা ছিল তাহের সুলতানের পিতৃনিবাস। পরিবার-পরিজন সেখানেই বসবাসরত। তাহের সুলতান বাংলাদেশের নাগরিক । কোলাঘাটের পথে দামোদর নদী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই নদী সাঁতরে পার হয়ে 'অপূর্ব মাতৃভক্তি' দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এ আবার কেমন খরস্রোতা নদী? এ যে নিতান্তই একটা খাল। এপার-ওপার ব্রিজ। আমরা গাড়িতেই

দামোদর পারাপার করেছিলাম । প্রকৃতপক্ষে, বর্ষাকালে এ নদীর একমুখো স্রোত ভয়াবহ রূপ নেয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীটি সাঁতরে পার হয়েছিলেন এক বর্ষণমুখর রাতে।

আমীর আলী এভেন্যু থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি। তারপর জুট রিসার্স ইনস্টিটিউট-এর কাছাকাছি এ বাড়ির গলির মুখ । গলির মুখেই রামুর চায়ের দোকান । পুরি ও ভাজি কিংবা টোস্ট বিস্কুট । এছাড়া চা ও টাটকা দুধ। জড়োসড়ো দোকান ঘর। বসবার জন্যে খুঁটির ওপরে অমসৃণ তক্তা পাতা। চা পরিবেশন করা হয় মাটির খোরায়। খেয়েই ছুঁড়ে ফেলা হয় এদিক-সেদিক ।

উড়িষ্যার বাসিন্দা রামুর ছিল অপরিসীম গর্ব। রাষ্ট্রপতি রবাহগিরি ভেঙ্কটগিরি তাঁরই রাজ্যের লোক। আমাদের প্রতি রামুর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। হিন্দিতেই কথা বলতেন । আশাবাদ শোনাতেন। জয় বাংলার জয় হবেই ।

রামুর চা-এর সভ্যভব্য খদ্দের ছিলাম আমরাই— স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা। স্থানীয় খদ্দের ছিলেন টাঙ্গাওয়ালা এবং কুলি-মজুর। রামুর মতো সবাই উদোম গা, খালি পা ।

শুধু একটি রেকর্ডিং স্টুডিও। বসতঘরের একটি কক্ষ। সাউন্ডপ্রুফও নয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিতও নয়। সেই জুন মাসের গরমে প্রথম দিকে কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখাও ছিল না। স্টুডিওকক্ষে রক্ষিত ছিল রেকর্ডিং সরঞ্জাম ও টেপ। সব অনুষ্ঠান রেকর্ড করে নেয়া হতো। সম্পূর্ণ অধিবেশনের প্রচারসম্ভার। সময়সীমা আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। বারোশ' ফিট-এর ৫/৬টি টেপ ।

দু'জন বাহক নিয়োজিত ছিলেন। পালাক্রমে দায়িত্ব নির্বাহ করতেন। এসে চুপচাপ বসে থাকতেন। ব্যাগভর্তি টেপগুলো পেলেই দে-ছুট। রাস্তায় দাঁড়ানো থাকতো ট্যাকসি ।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটি যেন বেতার-ভবন। আর দূরে কোথাও ট্রান্সমিটার । কিন্তু সেটা কোথায়? জানতাম না আমরা। যেমন আগরতলায় ৪০০ ওয়াট শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারও ছিল আমাদের অজ্ঞাত কোনো স্থানে ।

প্রচার-সময়ের এক ঘণ্টা আগে শেষ করতে হতো রেকর্ডিং। দেরি হলে তাড়া দিতেন বাহক । একটিমাত্র তোতা-বোল : স্যার, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একদিন মাত্র একটি বাড়তি কথা বলতে শুনেছিলাম। যুবকটি বলেছিলেন :

স্যার, আগামীকাল পূজোর জন্যে রাস্তায় খুব জ্যাম হবে। ব্যাগটি দেড় ঘণ্টা আগেই যেন পাই ।

দু'-একদিন সান্ধ্য অধিবেশন প্রচার বিলম্বিত হয়েছিল। হয়তো-বা পথের ভিড় ঠেলতে গিয়ে। অর্থাৎ ৫০-কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি বেশ দূরেই ইনস্টল করা হয়েছিল। কলকাতার শহরতলিতে? অথবা সেটা কি 'আকাশবাণী'র স্পেয়ার ট্রান্সমিটার ছিল ?

শেষ সংবাদ বুলেটিনটিও বাণীবদ্ধ করে দিতে হতো ৪/৫ ঘণ্টা আগে। 'আকাশবাণী'র ছিল সজীব সংবাদ বুলেটিন। স্বাভাবত আমাদের সংবাদ হতো বাসি । বিড়ম্বনা হতো বাংলাদেশ সরকারের সান্ধ্য প্রেস রিলিজ নিয়ে। আকাশবাণী'তে সেটার কভারেজ হতো। অথচ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শেষ সংবাদ বুলেটিনে হতো না । বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত এম-এন-এ আবদুল মান্নানকে জানিয়েছিলেন কামাল লোহানী। বলা হয়েছিল, আমাদের সরকারের প্রেস রিলিজ যেন আগে আমরা পাই। অন্য প্রচার সংস্থা যেন আগে কভারেজ দিতে না পারে। এ ব্যাপারে যত্ন নেয়া হয়েছিল।

স্টুডিওতে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল আশফাকুর রহমান খানের। তিনি অনুষ্ঠান ঘোষণা ও শ্লোগানেও প্রায়ই কণ্ঠ দিতেন। ঘোষণা ও শ্লোগানে কণ্ঠ দিতেন অনেকেই। আশরাফুল আলম, টি এইচ শিকদার, মুস্তফা আনোয়ার, শহীদুল ইসলাম, আবু ইউনুস, মোতাহার হোসেন, মহসিন রেজা প্রমুখ ।

একবার রেকর্ড করা হলে ইরেজ করার সুবিধা ছিল না। পরপর সাজিয়ে-গুছিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান একবারেই বাণীবদ্ধ করা হতো। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রচারসম্ভার তৈরি করার দৈনন্দিন দায়িত্ব নির্বাহ করতেন আশফাকুর রহমান খান ।

এ পর্যায়ে সমাবেশ ঘটেছিল সর্বস্তরের বেতারকর্মীদের। নৈমিত্তিক কথক এবং শিল্পীদের। বাংলাদেশের খ্যাতনামি ব্যক্তিত্বরা এসেছিলেন সীমান্ত পেরিয়ে। সীমিত হলেও ছিল নতুন নতুন অনুষ্ঠান চালু করার সুযোগ-সুবিধা। দাপ্তরিক পরিবেশ এবং প্রকৌশলিক সরঞ্জাম ।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল। তাঁদেরকে অবশ্যই হতে হবে বাংলাদেশের নাগরিক । অর্থাৎ ভারতীয় বা পশ্চিমবঙ্গের কারো কণ্ঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ । একমাত্র ব্যতিক্রম হয়েছিল একজনের ক্ষেত্রে। কাজী

সব্যসাচী। তাঁর কণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার আবৃত্তি বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল । এ ছাড়া কলকাতায় উৎপন্ন এই গান ব্যাপক প্রচারিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে :

'শোনো একটি মুজিবরের থেকে

লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি

আকাশে বাতাসে ওঠে রণি :

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।'

গানটির গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার । কণ্ঠশিল্পী অংশুমান রায়।

গোবিন্দ হালদারের লেখা তিনটি গান গৃহীত হয়েছিল । ১। 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' (সুর ও কণ্ঠ আপেল মাহমুদ)। ২। 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলা স্বাধীনতা আনলো যারা' (শিল্পী স্বপ্না রায়) এবং ৩। 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' (শিল্পী সমর দাশ ও সঙ্গীরা)। গানগুলো বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল আমাদের স্টুডিওতে। অনুষ্ঠানে প্রচারের সময় গীতিকারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। গোবিন্দ হালদার তাঁর গানের বাণী সরবরাহ করেছিলেন কামাল লোহানীর মাধ্যমে।

বনগাঁর গোবিন্দ হালদার ছিলেন কামাল আমেদের পূর্ব পরিচিতি। কামাল আমেদ ঢাকার বিশিষ্ট কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। জন্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গীয়। ১৯৪৯ সালের পর থেকে ঢাকার বাসিন্দা। কামাল লোহানী ও কামাল আমেদ ঢাকার সমাজ-সংস্কৃতি অঙ্গনে পরস্পর ঘনিষ্ঠ। কামাল আমেদই গোবিন্দ হালদারকে পদ্মামেঘনার পটভূমি ও মানুষ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন। দুটি খাতাভর্তি গানের কথা দিয়েছিলেন গোবিন্দ হালদার । কামাল লোহানী সেগুলো এনে দিয়েছিলেন সুরকার সমর দাশকে ।

কলকাতায় উৎপন্ন গ্রামাফোন রেকর্ডের একটি গান, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম'। গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। কণ্ঠশিল্পী ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল জব্বার । গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাজানো হতো ।

এ ছাড়া একজন মাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় তরুণ সাংবাদিকের লেখা গৃহীত হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার হাফেজ আমীর আলী। তিনি ছিলেন কোরানের হাফেজ।

তাঁর লেখা প্রচারের সময় নাম বলা হতো ‘হাফেজ আলী'। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। সপ্তাহে একটি করে কথিকা তিনি বাইরে আমাকে সরবরাহ করতেন। বিনিময়ে ২০ টাকা পারিতোষিক পেতেন । কলকাতার বাংলাদেশ মিশন থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আমাদের কাছে। পাকিস্তান আমল থেকেই তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন মিশন অফিসের সঙ্গে। তাঁর ছিল একান্ত ক্ষোভ । লেখার হাত খুবই পটু । পত্রপত্রিকার জন্যে তাৎক্ষণিক ফিচার লেখায় পারদর্শী। কলকাতার সব ক'টি দৈনিকের সঙ্গেই তিনি সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু নিতান্ত মুসলিম বলেই তাঁকে স্থায়ী নিযুক্তি দিতে সকলের অনীহা। জনাব হোসেন আলী স্বয়ং তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হবার পরও মিশন অফিসে সমান আনাগোনা হাফেজ আমীর আলীর । আমাদের কাছে অনুরোধ এসেছিল এঁকে কিছু অর্থানুকূল্য দেয়ার জন্যে । আমি ও শামসুল হুদা চৌধুরী পরামর্শ করেছিলাম! স্থির হয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে লেখা ক্রয় করা হবে। হাফেজ আলীর লেখা প্রচার শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাস থেকে ।

একসময় ব্যক্তিগত আলাপ প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেছিলেন, আমাদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। নেতা তাঁকে একটা কাজ দিয়েছিলেন । জীবনী লেখার কাজ। হাফেজ আমীর আলী সে কাজ সম্পাদন করেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁকে একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিল। এপ্রিল-মে মাসের দিকে। সে বাবদে তিনি ৪ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। হাফেজ আমীর আলী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন : আপনারা হয়তো জানেন না, আওয়ামী লীগের বড়ো বড়ো নেতারাও কেউ কেউ কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম অনুরাগী নন। জীবনী লেখার ব্রিফিং নেবার সময় আমি বুঝতে পেরেছি।

হাফেজ আমীর আলী ১৯৭২ সালের শুরুতে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন। ‘ইত্তেফাকে’ চাকরির চেষ্টা করেছিলেন। পরে কবি আল মাহমুদ সম্পাদিত ‘গণকণ্ঠে'র কলকাতা প্রতিনিধি হয়ে ১৫ এপ্রিল '৭২-এ ফিরে গিয়েছিলেন। ১-৬-৭২ তারিখে এক পত্রে আমাকে লিখেছিলেন, 'কলকাতা ছেড়ে দেশে (কৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর) চলে এসেছিলাম গত ১৫ মে । এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সাহিত্য-সাংবাদিকতা এবং লেখার জগৎ থেকে কেটে পড়ে আবার পুরানো লাইন হাফেজীতে ফিরে যাবো । কলকাতায় ‘যুগান্তরে’ কিছু কমসমে হলেও ফিচারে একটা কাজ পেয়েছিলাম, কিন্তু তবুও।'

সরাসরি পশ্চিমবঙ্গীয় একজন গীতিকারের কয়েকটি গান এবং একজনমাত্র লেখকের কয়েকটি লেখা। যথাক্রমে গোবিন্দ হালদার এবং হাফেজ আমীর আলীর 1 একজনের নাম আদৌ প্রচার করা হয়নি এবং তাঁকে পারিতোষিক দেয়া হয়নি। আর অন্যজনের নাম বিকৃত করে প্রচার করা হয়েছিল। তাঁকে পারিতোষিক দেয়া হয়েছিল এবং তা বিশেষ মহলের অনুরোধে। এ ছাড়া নীতিগতভাবেই বাংলাদেশের নাগরিকদের কণ্ঠস্বরই শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হতো ।

বেতারের নীতিমালার প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল। আগরতলায় আমার সঙ্গে মতভেদ দেখা দিয়েছিল আমিনুল হক বাদশার। সেটা বেশিদূর গড়ায়নি। মুজিবনগর বা ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার পর্যায়ে প্রশ্নটি প্রকটতর হয়েছিল। তখন একটি ছিন্নপত্রে আমি একটি মুসাবিদা করেছিলাম। 'প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ গণ সরকার'-এর লেটার-হেড-এ, মুসাবিদাটি কোনো কাজে আসেনি। আমি নিজের কাছেই রক্ষিত রেখিছিলাম। যেমন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র-

* এ হচ্ছে একটি নব বিকশিত জাতীয়তাবাদের প্রচার-যন্ত্র-যে জাতি ধর্মবর্ণ দলমতের ঊর্ধ্বে সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উদ্বুদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ। এ প্রচার-যন্ত্র কোনো বিশেষ দলীয় সঙ্কীর্ণতা পোষণ করতে পারে না।

* নির্বাচনের পরিবেশ ও যুদ্ধের পরিবেশ এক নয়। কাজেই নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার বা সামর্থ্য বিবেচিত হতে পারে না ।

* বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল দলীয় যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীই সত্যিকারের যোদ্ধা। তাদের প্রত্যেকের সংগ্রামী উৎসাহ ও প্রেরণার জন্যে সকল দলীয় নেতাদেরকে এ প্রচার-যন্ত্রের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে দেয়া উচিত। এ ব্যাপারে 'আকাশবাণী'র আদর্শ গ্রহণযোগ্য-সে মাইকে সকল দলমতের কথা তুলে ধরার সুযোগ আছে।

* বাংলাদেশের জন্যে এখন কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে দেশকে হানাদারমুক্ত করা বা দেশের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এ সময়ে জনগণের কাছে যে-কোনো দলমতের আদর্শই গৌণ।

* বাংলাদেশের গণআন্দোলন দীর্ঘদিনের- বাঙালিদের মনে স্বাধীনতার চেতনাবোধ জেগেছে বহু আন্দোলনের চড়াইউৎরাই বেয়ে। বহু নেতা ও রাজনৈতিক দলের সামগ্রিক কর্মতৎপরতার ফসল বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ । কাজেই বেতারে বিশেষ একটি দলের কৃতিত্ব জাহির করা সত্যের অপলাপ এবং জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নবতর নজির ছাড়া আর কিছুই নয়। এখনো স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন একটি নির্বাসিত সরকারের বিকৃতাশ্রয়ী অনুরূপ আত্মপ্রচার নি:সন্দেহে গর্হিত ।

* একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে জাতীয় যুদ্ধের একমাত্র ধারকবাহক বলে বিবৃত করা হলে এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধের মর্যাদা দেয়া হয় না-ফলে বিশ্বের গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আনুকূল্য পাওয়া দুস্কর। একটি পার্টির প্রতি নয়, বরং জনগণের প্রতি সহায়তা আশা করাই সঙ্গত ।

* প্রচারের জন্যে সব গানই হওয়া উচিত লোকগীতি এবং গণসঙ্গীত। আবেগ উচ্ছ্বাসের চেয়ে বীরদর্প ও সাহসিকতার আমেজ ফুটে ওঠা উচিত— কথা, সুর ও পরিবেশনায়। বাংলাদেশের নামকরা গণসঙ্গীতের গায়ক ও সুরকারদের এ উপলক্ষে সমাবেশ হওয়া দরকার ।

* বয়াতীর গানে বাংলার অতীত ও বর্তমানের সকল পর্যায়ের জননেতাদের বাণী ও প্রশংসাবাদ প্রচার করতে হবে ।

* ছোটদের জন্যে প্রতি রবিবার 'জ্ঞানের আলো' প্রশ্নোত্তরের আকারে পরিবেশন করা হয়— ওতে ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন এবং নগ্ন জবাবে শুধু আওয়ামী লীগের কথাই বলা হয়। এটা নি:সন্দেহে ইতিহাসকে বিকৃত করারই শামিল এবং ওয়াকিবহাল মহলে ও বাংলার গণমনে এর প্রতিক্রিয়া বিরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ।

* মুক্তিযোদ্ধাদের দিশারি হিসেবে এবং সামগ্রিক উৎসাহ উদ্দীপনার জন্যে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস থেকে দলমতের ঊর্ধ্বে বীরপুরুষদের জীবনী ও ত্যাগ- তিতিক্ষামূলক কর্মজীবনালেখ্য নিয়মিত প্রচার করা উচিত। বর্তমান যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের কথা মর্যাদার সঙ্গে অবশ্যই তুলে ধরা উচিত।

* মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি ব্যাপক হারে প্রচার করা উচিত-এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির

সময়-সীমা আরো বেশি করা দরকার ।

* কথিকা প্রচারের জন্যে বেশির ভাগই বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োজিত করা দরকার-তাঁরা যে-কোনো মতাদর্শের অনুসারীই হোন না কেন! এখন হচ্ছে রাজনৈতিক দলমতের ঊর্ধ্বে দেশের স্বাধীনতার একক প্রশ্ন ।

* সামগ্রিকভাবে এ প্রচারযন্ত্রের অকৃত্রিম নীতি হওয়া উচিত, এটি একটি যুদ্ধরত জাতির মুখপাত্র, কোনো একটি রাজনৈতিক দলের প্লাটফরম নয়। তবেই প্রচার সংগ্রাম—যাকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলা হয়, তার উদ্দেশ্য সফল তথা দেশের অবাধ স্বাধীনতা হবে ত্বরান্বিত ।

সংরক্ষিত মুসাবিদাটির নিচে তারিখ লেখা হয়নি। এটা সম্ভবত আগস্ট ১৯৭১-এ রচিত হয়েছিল । তার আগেই শুরু হয়েছিল কথক নির্বাচনের জন্যে ক্লিয়ারেন্স নেয়া । সব লেখা প্রচারের আগে দেখিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। দায়িত্বটি ছিল শামসুল হুদা চৌধুরীর । বালিগঞ্জ থেকে বালু হাক্কাক লেন-এ লেখার ফাইল নিয়ে আনাগোনা । বাংলা অভিধান থেকে বের করেছিলাম একটি শব্দ। 'দিক্ষা'। অর্থ অতিরিক্ত দেখনের ইচ্ছা । কে একজন বিজ্ঞ সহকর্মী বলেছিলেন : দেখতে যখন চাইছেন, দেখিয়ে আনতে তো হবেই। কিন্তু বেশিদিন ধৈর্য থাকবে না ।

: কার? আমাদের পক্ষে কিন্তু এটা অসহ্য ।

: আরে, না । আমরা একটু সহ্য করবো বই কি! যাঁরা দেখতে চান, তাঁদের কথা বলছি। তাঁরাই দেখার ধৈর্য হারাবেন।

তা-ই হয়েছিল, কয়েকদিন পরেই দায়িত্বটা বর্তে গিয়েছিল শামসুল হুদা চৌধুরীর ওপর। তাই বলে সব লেখা দেখার প্রয়োজন ছিল না তো! এম আর আখতারের লেখা 'চরমপত্র', ফয়েজ আহমদের 'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে' কিংবা আব্দুল তোয়াব খানের 'পিণ্ডির প্রলাপ' আমরা কি দেখে দেবো? হ্যাঁ, তবুও দেখার ছিল । 'উপরোক্ত', 'নিম্নরূপ' এসব শব্দ যেন পাণ্ডুলিপিতে না থাকে। থাকলে লেখক-কথককে অনুরোধ করা হতো শব্দটা পাল্টে নেবার জন্যে ।

৫০ কিলোওয়াটের কর্মকালে আমার স্ক্রিপ্ট লেখার দায়িত্ব কমেছিল। মুস্তফা আনোয়ারকেও এখন আর রোজ রোজ একাধিক কথিকা লিখতে হতো না। তবু এক-আধটা কথিকা লেখার আগ্রহও গিয়েছিল টুটে। সেই দিক্ষার ধকলে

পড়ে। আমার একটি পাণ্ডুলিপিতে 'জনযুদ্ধ' শব্দটি ছিল ।

: আরে, আরে! এটা কি লিখেছেন? 'জনযুদ্ধ' তো মাও সে তুং-এর কথা! এই অংশটুকু প্রচার করবেন না।

কেটে দেয়া হয়েছিল একটা প্যারাগ্রাফ। সে কথিকাটি আমি আর প্রচার করিনি এর পরে স্বত:স্ফূর্তভাবে কথিকা লেখার উৎসাহ হারিয়েছিলাম ।

পরে 'জয় বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধেই 'জনযুদ্ধ' শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া গিয়াছিল। সেই অংশটক 'জয় বাংলা পত্রিকা থেকে পাঠ' শিরোনামে প্রচার করেছিলাম আমরা। দারুণ উৎসাহ নিয়ে ।

নতুন নতুন অনুষ্ঠান হয়েছিল সংযোজিত। প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ফিক্সড্ পয়েন্ট- এর। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়-সূচি। সংবাদ বুলেটিন প্রচারের সময় ও স্থিতিকাল। ধারাবাহিক কথিকাসমূহের প্রচার-সময়। সপ্তাহিক অনুষ্ঠানের প্রচার-বার। নাটক জীবন্তিকার ফ্রিকোয়েন্সি । উর্দু অনুষ্ঠানের প্রচার-সময় । ইংরেজি অনুষ্ঠানের প্রচার- সময় ।

ফিক্সডপয়েন্ট তৈরির পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না । ও কাজটি অনুষ্ঠান প্রযোজক- সংগঠকদের। সহকর্মী তাহের সুলতান সহযোগিতা দিয়েছিলেন। প্রথম ফিক্সড্ পয়েন্ট তৈরি হয়েছিল এভাবে :

খবর : বাংলা (প্রত্যাহিক) সকাল ৭-১০ মিঃ – ১০মিঃ বেলা ১-০৫ মিঃ-৫ মিঃ সন্ধে ৭-৫০ মিঃ-১০ মিঃ রাত ৮-২০ মিঃ-৫ মিঃ রাত ১০-২৫ মিঃ-৩ মিঃ

ইংরজি (প্রাত্যাহিক) সকাল ৭-২০ মিঃ -১০ মিঃ বেলা ১-১০ মিঃ-৫ মিঃ রাত ৮-৫০ মিঃ-১০ মিঃ

অনুষ্ঠান পরিচিতি উর্দু (প্রাত্যহিক) : (প্রাত্যাহিক) রাত ৯-৩০ মিঃ-৫ মিঃ সকাল ৭-০৭ মিঃ-২ মিঃ বেলা ১-০৩ মিঃ-২ মিঃ সন্ধে ৭-০৩ মিঃ-২ মিঃ

কোরান পাঠ ও অনুবাদ : (প্রাত্যহিক) সকাল ৭-০২ মিঃ-৫ মিঃ

ধর্মীয় কথিকা : ইসলামের দৃষ্টিতে (শনিবার ছাড়া প্রতিদিন) রাত ৯-৪৫ মিঃ-০১ মিঃ

গীতা পাঠ : (প্রতি বৃহস্পতিবার) বেলা ১-২৩ মিঃ-৭ মিঃ

বাইবেল পাঠ : (প্রতি রবিবার) বেলা ১-২৩ মিঃ-৭ মিঃ

ত্রিপিটক পাঠ : (প্রতি মঙ্গলবার) বেলা ১-২৩ মিঃ-৭ মিঃ

বজ্রকণ্ঠ : (প্রাত্যহিক) সকাল ৮-১৫ মিঃ-৫ মিঃ সন্ধে ৭-৩০ মি-৫ মিঃ

সংবাদ ভিত্তিক কথিকা বিশ্ব জনমত (প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার) বেলা ১-২৩ মিঃ-৭ মিঃ

পত্র-পত্রিকার মন্তব্য : (প্রতি শনিবার) রাত ৯-৪৫ মিঃ-১০ মিঃ

সংবাদ পর্যালোচনা : (রবিবার ছাড়া প্রতিদিন) রাত ৯-৩৫ মিঃ-৫ মিঃ

প্রতিধ্বনি : (প্রতি রবিবার) রাত ৯-৩৫ মিঃ -৫ মিঃ

বিবিধ কথিকা : পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে (প্রতি রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবার) রাত ৯-১০ মিঃ-১০ মিঃ

পুতুলনাচের খেল : (প্রতি সোমবার) রাত ৯-১০ মিঃ-১০ মিঃ

সূর্যশপথ : (প্রতি বুধবার) রাত ৯-১০ মিঃ-১০ মিঃ

রাজনৈতিক মঞ্চ : (প্রতি শনিবার) রাত ৯-৩০ মিঃ ১০ মিঃ

দৃষ্টিপাতজ : (প্রতি বুধ, শুক্র ও রবিবার) রাত ১০-০০ মিঃ-১০ মিঃ

চরমপত্র : (প্রতি সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার, মাসের ১ম ও ৩য় শনিবার ছাড়া) পিণ্ডির প্রলাপ রাত ১০-০০ মিঃ -১০ মিঃ

: (বুধবার ছাড়া প্রতিদিন) সকাল ৮-২০ মিঃ -১০ মিঃ

মানবাধিকার ও বাংলাদেশ : (প্রতি বুধবার সকাল ৮-২০ মিঃ- ১০মিঃ

রণাঙ্গনে বাংলার নারী : (প্রতি সোমবার) সকাল ৭-৩৫ মিঃ-১০ মিঃ

মুক্তিসংগ্রামের মায়ের ভূমিকা : (সোমাবার ছাড়া প্রতিদিন) সকাল ৭-৩৫ মিঃ- ১০ মিঃ

নাটক : মাসের ১ম ও ৩য় শনিবার) রাত ৯-৫৫ মিঃ-৩০ মিঃ রবিবার)

জীবন্তিকা : জল্লাদের দরবার (প্রতি বুধ ও রাত ১০-১০ মিঃ-১৫ মিঃ

গ্রামবাংলা : (প্রতি সোম, মঙ্গল ও শুক্রবার) রাত ১০-১০ মিঃ ১৫ মিঃ

আজব অভিজ্ঞান : (প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ১০-১৫ মিঃ- ১০ মিঃ

জনতার আদালত (প্রতি শনিবার) বেলা ১-২৩ মিঃ – ৭ মিঃ

সাহিত্য আসর (প্রাত্যহিক) বেলা ১-৪০ মিঃ-৭ মিঃ

ক) রক্ত স্বাক্ষর স্বরচিত কবিতা পাঠ (প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার)

খ) ছোটগল্প (প্রতি মঙ্গল ও শনিবার) উর্দু অনুষ্ঠান (প্রাত্যহিক)

গ) রক্তের আখরে লিখি (প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার) রাত ৯-২০ মিঃ-১৫ মিঃ

কথিকা (মাসের ২য় ও ৪র্থ রবিবার ছাড়া প্রতিদিন)

খ) জীবন্তিকা (মাসের ২য় ও ৪র্থ রবিবার)

গ) খবর

ইংরেজি অনুষ্ঠান (প্রাত্যহিক) রাত ৮-৩০ মিঃ-৩০ মিঃ

ক) কথিকা/সাক্ষাৎকার

খ) সঙ্গীত

গ) খবর

অগ্নিশিখা (প্রাত্যহিক) সন্ধে ৭-৩০ মিঃ-৫৫ মিঃ

ক) বজ্রকণ্ঠ (প্রতিদিন)

খ) প্রতিনিধির কণ্ঠ (প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার)

গ) জনতার সংগ্রাম (প্রতি রবি ও বুধবার)

ঘ) দুর্জয় বাংলা (প্রতি শুক্রবার)

ঙ) বেঈমানের দলিল (প্রতি সোম ও শুক্রবার)

চ) দর্পণ (প্রতি বৃহস্পতিবার)

ছ) বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ (প্রতি মঙ্গল ও শনিবার)

জ) বাংলার মুখ : জীবন্তিকা (প্রতি সোমবার) ঝ) আবৃত্তি (প্রতিদিন

ঞ) যুদ্ধের খবর (প্রতিদিন)

ট) জয়যাত্রা : সাক্ষাৎকার (প্রতি রবি ও বুধবার)

ঠ) রণাঙ্গনে : প্রামাণ্য অনুষ্ঠান (প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার)

ড) দেশাত্মবোধেক গান

সংগীত (প্রাত্যহিক) রাত ৮-২৫ মিঃ-৫ মিঃ

আমার সোনার বাংলা : ৭-৩৫ মিঃ – ৫ মিঃ

গণসংগীত বেলা রাত ৮-৩০ মিঃ-২০ মিঃ রাত ৯-৪০ মিঃ -৫ মিঃ

গণসংগীত ও স্লোগান সকাল ১-১৫ মিঃ –৮ মিঃ সকাল ৮-০০ মিঃ ১৫ মিঃ সন্ধে ৭-১৫ মিঃ – ১৫ মিঃ

দেশাত্মবোধক গান পল্লীগীতি/পুঁথিপাঠ/জারিগান সন্ধে ৭-৩০ মিঃ-২০ মিঃ ১-৩০ মিঃ-১০ মিঃ ৯-০০ মিঃ-১০ মিঃ

যন্ত্রসংগীত বেলা বেলা ১-৪৭ মিঃ-৬ মিঃ

নজরুল গীতি রাত সকাল ৭-৪৫ মিঃ – ৫ মিঃ

রবীন্দ্র সংগীত (প্রতি বৃহস্পতিবার এবং মাসের ২য় ও ৪র্থ শনিবার) রাত ১০-১০ মিঃ-৫ মিঃ

একটি সাহিত্য আসর প্রচারিত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক পটভূমি'। পরিচালনা করেছিলেন ডক্টর আনিসুজ্জামান। আবদুল গাফফার চৌধুরী (চলচ্চিত্র ও সংবাদ'), বুলবন ওসমান ('উপন্যাস, গল্প ও শিশু সাহিত্য'), হাসান মুরশিদ (প্রবন্ধ') এবং উম্মে কুলসুম ('কবিতা') আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন ।

প্রতিদিন বেলা ১-৪০ মিঃ-এ ১০ মিঃ সাহিত্য আসর। এতে অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন, স্বরচিত কবিতা পাঠক রফিক নওশাদ, মীজানুর রহমান, বিপ্লব দাশ, আল মাহমুদ, মাহবুব তালুকদার, আশরাফুল আলম, শাহজাহান ফারুক, মুসা সাদেক, আসাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিক, প্রণব চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, সবুজ চক্রবর্তী, সৈয়দ আলী আহসান ও অসিত রায়চৌধুরী। ছোট গল্প পাঠ অসিত রায়চৌধুরী, শওকত ওসমান, বিপ্লব বড় য়া, আবদুল জলিল, বুলবন ওসমান, নরেন বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর আলম, গণেশ ভৌমিক (খাজা সুজন)। জাফর সাদেক (মোহাম্মদ আবু জাফর) 'রক্তের আখরে লিখি' শিরোনামে প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবার আলেখ্য পাঠ করতেন।

শহীদুল ইসলাম পরিকল্পিত 'সোনার বাংলা' সংমিশ্র অনুষ্ঠান কিছুকাল নিয়মিত প্রচার করা হয়েছিল । পরে নামকরণ করা হয়েছিল 'গ্রামবাংলা' । ওতে স্টকভয়েস ছিলেন এয়ার মাহমুদ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, এম এস চাঁদ ও আপেল মাহমুদ ।

এম আর আখতার ছোটদের জন্যে সংমিশ্র অনুষ্ঠান 'ওরা রক্তবীজ' পরিচালনা করতেন। অনুষ্ঠানটি দু'বার মাত্র প্রচারিত হয়েছিল । ওতে একটি আইটেম ছিল, ''জ্ঞানের আলো'।

'অগ্নিশিখা' অনুষ্ঠানের একটি দিনওয়ারি কথকের তালিকা ছিল। যেমন :

প্রতি রবিবার : মোস্তাফিজুর রহমান (কাঠগড়ার আসামি'), মলয় ভৌমিক ('জনতার সংগ্রাম'), জাহাঙ্গীর আলম (?)

প্রতি সোমবার : বদরুল হাসান ('বেঈমানের দলিল'), গাজীউল হক (রণাঙ্গনের চিঠি'), হাফেজ আলী ('আমাদের সংগ্রাম চলবে')

প্রতি মঙ্গলবার : ডাক্তার বদরুদ্দোজা ('স্বাস্থ্যের কথা'), মেজবাহ আহমদ ('ইবলিশের মুখোশ'), শামীম চৌধুরী (?), প্রণব চৌধুরী/বিপ্লব বড় য়া (?)/ মনিরুজ্জামান চৌধুরী (?)

প্রতি বুধবার : মোস্তাফিজুর রহমান ('কাঠগড়ার আসামি'), বদরুল হাসান ('দুর্জয় বাংলা), বুলবন ওসমান/তপন ভট্টাচার্য ('ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল'), অসিত রায়চৌধুরী ('একটি আলেখ্য')/সবুজ চক্রবর্তী (?)

প্রতি বৃহস্পতিবার : আশরাফুল আলম ('দর্পণ'), শামীম চৌধুরী (?) গণেশ

ভৌমিক (?), বিপ্রদাশ বড় য়া (‘জনতার সংগ্রাম’))

প্রতি শুক্রবার : বদরুল হাসান (‘বেঈমানের দলিল') গাজীউল হক (“জনতার

সংগ্রাম'), পারভীন আওশর (?), মুসা সাদেক (‘রণাঙ্গন ঘুরে এলাম') প্রতি শনিবার : মহাদেব সাহা (‘বিশ্ববিবেক ও বাংলাদেশ'), আসাদ চৌধুরী

(মৃত্যুহীন প্রাণ'), শামীম চৌধুরী (?), মুসা সাদেক (‘ঘুরে এলাম মুক্তাঞ্চল') রণেশ দাশগুপ্ত (‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর')

আগ্নিশিখা অনুষ্ঠানে গাজীউল হকের লেখা অমিত্রাক্ষর কবিতার আবৃত্তি সংযোজিত হয়েছিল-‘এহিয়া বধ-কাব্য'। আবৃত্তি করতেন আশফাকুর রহমান খান ও উম্মে কুলসুম (বেগম মুশতারী শফী) দ্বৈতকণ্ঠে প্রতি সোম ও শুক্রবার।

রাত ৮-৫০ মিঃ-১০ মিঃ

প্রতিদিন ‘পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে'-লেখা ফয়েজ আহমেদ, পাঠ কামাল লোহানী রাত ৯-০০ মিঃ-১০ মিঃ

সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি (মাসের ১ম ও ৩য় শনিবার ছাড়া) চরমপত্র— এম আর আখতার

মাসের ১ম ও ৩য় শনিবার নাটক

বুধ, শুক্র ও রবিবার

রাত ৯-৩০ মি:-১০ মি:

‘রাজনৈতিক মঞ্চ’-সাদেকীন

প্রতিদিন (রবিবার ছাড়া) ‘সংবাদ পর্যালোচনা –আমীর হোসেন প্রতি রবিবার ‘প্রতিধ্বনি'

‘দৃষ্টিপাত' শিরোনামে লিখতেন ডক্টর মযহারুল ইসলাম, রণেশ দাশগুপ্ত ও আবদুল হাফিজ। ‘কাঠগড়ার আসামি' শিরোনামে মুস্তাফিজুর রহমান ও বদরুল হাসান। 'পিণ্ডির প্রলাপ' ধরাবাহিক কথিকার লেখক ছিলেন আবদুল তোয়াব খান। ডক্টর এ আর মল্লিক একটি কথিকা প্রচার করেছিলেন-'মানবাধিকার ও বাংলাদেশ'। জাহির রায়হান দুটি কথিকা প্রচার করেছিলেন। একটির

শিরোনাম ‘পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ'।

শওকত ওসমানের ধারাবাহিক কথিকার শিরোনাম ছিল “ইয়াহিয়া জবাব দাও’-১ম সওয়াল, ২য় সওয়াল ইত্যাদি।

সিকান্দার আবু জাফর ঢাকায় একটি লিফলেট বের করেছিলেন। ২৬ জুলাই ১৯৭১-এ। তারপর কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। ‘অভিযোগ' শীর্ষক লিফলেটটির অংশবিশেষ তিন পর্যায়ে প্রচার করা হয়েছিল।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা ‘শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন' ধারাবাহিকভাবে আহমদ রফিকের (আবদুল মান্নান) কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। বিশেষ দিবস উপলক্ষে প্রচারিত দুটি কথিকা রণেশ দাশগুপ্তের 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সূর্য সেনের স্মৃতি' এবং রণজিৎ পাল চৌধুরীর ‘এবার মায়ের পূজোয় আমরা' ।

কথকদের মধ্যে আরও ছিলেন ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, ড. বেলায়েত হোসেন. ড. এ জি সামাদ, ড. অজয় রায়, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, ড. এ কে এম আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, ডাক্তার নূরুন নাহার জহুর, ড. কামাল এ খান, দীপ্তি লোহানী, রাফিয়া আখতার ডলি প্রমুখ ।

কথক হিসেবে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন আবুল মঞ্জুর। দীর্ঘদিনের বন্ধু। আগরতলায় আগেই দেখা হয়েছিল। তখন নিজেদের কাজ সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলিনি। সেজন্যে এখন সংকোচবোধ করেছিলাম। আবুল মঞ্জুর বলেছিলেন : আপনাদের ঐ গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়াসকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই তো কেউ কেউ শত্রুপক্ষের এজেন্ট । কাজেই যাচাই না করে কারো কাছে ধরা দিতে নেই ।

আগরতলায় গিয়েছিলেন সাংবাদিক মঈনুল আলমও। পরে শত্রুকবলিত চট্টগ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন।

কল্যাণ মিত্র লিখতেন ধারাবাহিক নাটিকা, 'জল্লাদের দরবার'। অভিনয়ে স্টক ভয়েস ছিলেন রাজু আহমদ ও নারায়ণ ঘোষ (মিতা)। অপর দুটি জীবন্তিকার শিরোনাম ছিল ‘জনতার আদালত' ও 'মীর জাফরের রোজনামচা'। নাট্যকর্মীদের মধ্যে আরো ছিলেন রণেন কুশারী, সৈয়দ হাসান ইমাম, সুমিতা দেবী, উম্মে কুলসুম মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, আতাউর রহমান, প্রসেনজিৎ বসু, জহরুল হক, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহলানবীশ, করুণা রায়, গোলাম রাব্বানী, মাসুদা

নবি, অমিতা বসু, সৈয়দ দীপেন, লায়লা হাসান, শুক্তি মহলানবীশ, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, রাশেদুর রহমান, কাজী তামান্না, দিলীপ সোম, বাদল রহমান, মাজহারুল হক, আসলাম পারভেজ, সুফিয়া খাতুন, তাজিন মুর্শিদ, দিলশাদ বেগম, এয়ার মাহমুদ, এস এম চাঁদ, সুভাষ দত্ত, নাজমুল ইসলাম, মামুনুর রশীদ, ফিরোজ ইফতেখার প্রমুখ।

উর্দু অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন জাহিদ সিদ্দিকী। নিয়মিত অপর অংশগ্রহণকারী শহীদুর রহমান । জাহিদ সিদ্দিকীর একটি উর্দু কথিকা প্রচারিত হয়েছিল ১৪ আগস্ট। বলা হয়েছিল 'আজ মৃত পাকিস্তানের জন্মদিন'। উর্দু জীবন্তিকাও প্রচারিত হয়েছিল কয়েকটি । অংশগ্রহণে জাহিদ সিদ্দিকী, শহীদুর রহমান, পারভীন হোসেন ও উম্মে কুলসুম ।

ইংরেজি অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন আলমগীর কবির। নাম ব্যবহার করতেন আহমদ চৌধুরী। নিয়মিত অংশগ্রহণকারী ছিলেন আলী যাকের।

প্রত্যেক অধিবেশনে কিউশিট তৈরি করা হতো। ‘শব্দ সৈনিক' সংকলনে ২৬-৮- ৭১ তারিখের ৩য় অধিবেশনের কিউশিটটি ব্লক করে পত্রস্থ করা হয়েছিল। সেটি আমার হস্তাক্ষর । কিউশীট-এ স্বাক্ষর করার বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রচলিত ছিল না ।

আশফাকুর রহমান খান সংগীতের একটা ফিক্সড পয়েন্ট তৈরি করেছিলেন। ওতে সংগীতানুষ্ঠানের শিরোনাম দেয়া হয়েছিল।

‘কোটিপ্রাণ এক প্রাণ' শিরোনামে আমার লেখা একটি গ্রন্থনা-লিপি । এতে ৩টি গান সংযোজিত হয়েছিল ।

একটি জাতি একটি দিগন্তে এসে মিশেছে— সেই দিগন্ত ‘শেখ মুজিব'। সাড়ে সাতকোটি মানুষ এক হয়েছে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে— সেই কেন্দ্রবিন্দু ‘শেখ মুজিব'।

আজকের বিশ্ব-ইতিহাস জানে, একটিমাত্র নামে পরিচিত সাড়ে সাতকোটি মানুষের একটি জাতি, একটিমাত্র শব্দে বাংলার আকাশ-বাতাস উষ্ণ অধীর। সেই নাম সেই শব্দ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'।

'সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর-একটি নাম

মুজিবর মুজিবর মুজিবর।'

বাংলার সন্তান শেখ মুজিব স্বদেশকে ভালোবাসা দিয়েছেন প্রাণ ঢেলে। দেশকে ভালোবেসে তিনি ভালোবেসেছেন দেশের জনগণকে। আর, ভালোবাসার মূল্যে তিনি জয় করেছেন বাঙালির হৃদয়মন । বাংলার গাঁয়ের চাষী নায়ের মাঝি জেলে তাঁতি কামার কুমোর ছাত্র শিক্ষক যুবক বৃদ্ধ সকলের তিনি 'মুজিব ভাই'। সকলের তিনি বন্ধু— বঙ্গবন্ধু ! শেখ মুজিব তোমার-আমার সকলের নেতা।

'তোমার নেতা মুখ মুজিব'।

জেল জুলুম আর ফাঁসির ভয়ে কোনোদিন ভীতি প্রকাশ করেননি যে মহান নেতা, তাঁরই আজ বিচার-প্রহসন শুরু করেছে পাকিস্তানি বর্বরশাহি । কিন্তু কার বিচার কে করে? সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামী প্রতীক বঙ্গবন্ধুর বিচার করার অধিকার কার? বিশ্ববিবেক তো আর নিশ্চুপ হয়ে নেই। বাংলার নেতা বিশ্বমানবতার নেতা শেখ মুজিবের স্বপক্ষে আজ বিশ্বজনতা জাগ্রত । নৃশংস বর্বরোচিত বিচার-প্রহসন তারা মুখ বুজে সইবে না। পশুশক্তিকে আজ অচিরেই দাঁড়াতে হবে জনতার বিচারালয়ের, অপরাধীর কাঠগড়ায় ।

"বিচারপতি, তোমার বিচার করবে যারা,

আজ জেগেছে সেই জনতা।'

২২ শ্রাবণ (৮-৮-৭১) উপলক্ষে প্রচারিত হয়েছিল আমার লেখা এই গ্রন্থনা-লিপিটি

রবীন্দ্র-স্মৃতিতে নিবেদিত একটি দিন বাইশে শ্রাবণ। বাংলার কবি বিশ্বকবির স্মৃতিস্নিগ্ধ এই দিনটি বাঙালির জাতীয় জীবনের এমন এক চরম মুহূর্তে আজ এসেছে, যে সময়টি একই সঙ্গে বড়ো করুণ এবং বড়ো বেশি কর্তব্যমুখর। রবীন্দ্রনাথের দেশ বাংলাদেশের মানুষ আজ একদিকে যেমন নিজেদের আবাসভূমিতে ধ্বংসস্তূপে বসবাস করছে, অন্যদিকে তেমনি তারা অপূর্ব জীবন ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্তিত্ব- রক্ষার কর্মে তৎপর ।

যে-গ্রামবাংলা রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসায় অভিষিক্ত, রবীন্দ্র-সত্তাকে আশা-

আনন্দ আর হাসি-কান্নায় ভরিয়ে দিয়েছে যে অপরূপা মা-জননী, আজ সে বাংলা-মাতৃকা বিদেশী হানাদারদের হাতে লাঞ্ছিতা। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ ফুলে ও ফসলে সজীব সমৃদ্ধ দেশ— সসাগরা বসুন্ধরার এক অনন্য জনপদ— অথচ শতাব্দীর বঞ্চনায় নিপীড়িত। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ব্যথাহত আত্মার আকুতি—

'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে'

গ্রামবাংলার শিলাইদহে রচিত হয়েছিল রবীন্দ্র-কুঠি। শিলাইদহের কুঠিবাড়ির রবীন্দ্রনাথই তো অমর কাব্যকীর্তির স্রষ্টা। আর সেই সৃষ্টির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে একটি মহান জীবন। যে জীবনের মৃত্যু নেই। সৃষ্টির কর্মে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র-জীবনকে বাইশে শ্রাবণ তাই পারেনি বিস্মৃতি দিয়ে ঘিরে দিতে ।

অথচ কি আশ্চর্য, রবীন্দ্র-নিবাস শিলাইদহকে আজ ধ্বংস করে দিয়েছে বর্বর হানাদাররা। আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের ভাষা আর সাহিত্যকে রক্ষা করেছি আন্দোলনের জীবন-প্রয়াসে, তারা তো পারিনি একটি স্মৃতিমন্দিরকে আগলে রাখতে! এরা আমাদের আত্মাকে আহত করেছে। কিন্তু তবু— তবু তো আমরা পদানত হইনি। আমরা আজ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছি। আমরা ব্যারিকেড নির্মাণ করেছি বাংলার শহর-সড়ক-প্রান্তর- লোকালয়ে।

রবীন্দ্রনাথ, আমরা আজ মরতে শিখেছি— কিন্তু মৃত্যুকে ভয় করতে নয়। কেননা তুমিই তো দিয়েছ সে প্রেরণা—

''আমি ভয় করবো না ভয় করবো না'

বাংলাকে ভালোবাসি বলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি। রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি বলেই তো ভালোবাসি আমরা বাংলাদেশকে। রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার সোনার দেশ বাংলা, আমাদের জন্ম-মৃত্যু-লালনভূমি বাংলাদেশ । বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করবো আমাদের অবাধ উদার স্বাধীনতাকে । রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছে আজ সাড়ে সাতকোটি বাঙালির একটি জাতি— একটি নবজীবন- যৌবন-চেতনা ।

একক ও সমবেত কণ্ঠে আরো বহু গানে নৈমিত্তিক শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। সর্বস্তরের কণ্ঠশিল্পীগণের মধ্যে ছিলেন সমর দাশ, মলয় ঘোষ দস্তিদার, হরলাল রায়, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ

রায়, মান্না হক, এম এ মান্নান, শাহ আলী সরকার, সনজিদা খাতুন, সরদার আলাউদ্দীন আহমেদ, কল্যাণী ঘোষ, অনুপকুমার ভট্টাচার্য, মনজুর আহমদ, কাদেরী কিবরিয়া, সুবল দাশ, আবদুল গনি বোখারী, শাহীন মাহমুদ, অনিল চন্দ্র দে, অরূপ রতন চৌধুরী, মোশাদ আলী, শেফালী ঘোষ, হেনা বেগম, মফিজ আঙ্গুর, লাকী আখন্দ, স্বপনা রায়, মালা খান, রূপা খান, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, আবু নওশের, রমা ভৌমিক, মনোয়ার হোসেন, কিশোর রায়, কামাল উদ্দীন, ইকবাল আহমদ, রঞ্জন ঘটক, মনোরঞ্জন ঘোষাল, তোরাব আলী শাহ, নায়লা জামান, বুলবুল মহলানবীশ, এম এ খালেক, মাকসুদ আলী সাঁই, ফকির আলমগীর, মনজুলা দাশগুপ্ত, সুব্রত সেনগুপ্ত, উমা চৌধুরী, মোশারফ হোসেন, ঝর্ণা ব্যানার্জী, দীপা ব্যানার্জী, সুকুমার বিশ্বাস, তরুণ রায়, প্রবাল চৌধুরী, রফিকুল আলম, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, লীনা দাশ, সাকিনা বেগম, রেজওয়ানুল হক, অনীতা বসু, মহিউদ্দীন খোকা, রিজিয়া সাইফুদ্দিন, রেহানা বেগম, মিহির নন্দী অমিতাভ সেনগুপ্ত, ভক্তি রায়, অর্চনা বসু, মোস্তফা তানুজ, সাধন সরকার, মুজিবুর রহমান, মিনু রায়, রীতা চাটার্জী, শান্তি মুখার্জি, জীবনকৃষ্ণ দাশ, শিবশঙ্কর রায়, সৈয়দ আলমগীর, ভারতী ঘোষ, শেফালী সান্যাল, মদনমোহন দাশ, শহীদ হাসান, অরুণা সাহা. জয়ন্তী ভূঁইয়া, কুইন মহাজাবিন, মৃণাল ভট্টাচার্য, শাফাউন নবি, প্রদীপ ঘোষ মিহির কর্মকার, শক্তিশিখা দাশ, মিহির লালা, গীতশ্রী সেন, গৌরাঙ্গ সরকার, প্রণব চন্দ্র ঘোষ, সাইদুর রহমান, কাঞ্চন তালুকদার, মুকুল চৌধুরী, মলিনা দাশ, জরিন আহমদ, ইন্দু বিকাশ রায়, বাসু দেব, পরিতোষ শীল, মিতালী মুখার্জি, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, তপন ভট্টাচার্য (তপন মাহমুদ), শুক্তি মহলানবীশ, তিমির নন্দী, মামুনাল চৌধুরী, আফরোজা মামুন প্রমুখ ।

যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন সুজেয় শ্যাম, কালাচাঁদ ঘোষ, গোপী বল্লভ বিশ্বাস, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, সুবল দত্ত, বাবুল দত্ত, অবিনাশ শীল, অরুণ গোস্বামী, সুনীল গোস্বামী, তড়িৎ হোসেন খান, দিলীপ দাশগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, জুলু খান, রুমু খান, বাসুদেব দাশ, সমীর চন্দ্র, শতদল সেন এবং আরো অনেকে ।

গুরুসদয় দত্তের 'মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ/ অনুকরণ খোলস ভেদি/ কায়মনে বাঙালি হ' গানটি চিরায়ত। ব্রতচারীর গান। পটুয়া কামরুল হাসান ছিলেন সেকালের ব্রতচারী আন্দোলনের কর্মী। তাঁরই আগ্রহে অ-শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে গানটি রেকর্ড করা হয়েছিল। কামরুল হাসান লীড দিয়েছিলেন। শেখ কামাল, আমিনুল হক বাদশা, কামাল লোহানী ও আমি

কণ্ঠ মিলিয়েছিলাম। স্বভাবত পরিবেশনায় তাল লয়- এ খুঁত ছিল । ৩/৪টি অধিবেশনে প্রচারের পর সমালোচিত হয়েছিল। পরে রেকর্ডটি বাতিল করা হয়েছিল।

মোহাম্মদ শাহ্ বাঙালি প্রকৃত নাম মোহাম্মদ শফীউল্লা। সন্দ্বীপের বাসিন্দা চারণ কবি। প্রথম জীবনে হাটবাজারে কৃমির ওষুধ ফেরি করতেন, মাইকে ছড়াগান গেয়ে গেয়ে। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ আজিজ আবিস্কার করেছিলেন তাঁকে। কৃমির ওষুধ ফেরির বদলে পার্টির প্রচার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। মোহাম্মদ শফীউল্লা বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত প্রীতি অর্জন করেছিলেন। পাকিস্তান আমলে বেতার-শিল্পী হবার কোনো আগ্রহই দেখাননি তিনি ।

১৯৬৮ সালে সন্দ্বীপের কাটগড় হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পল্লীগীতি উৎসব। চট্টগ্রাম থেকে অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। শেষতম নৈশ আইটেমটি ছিল কবিগান । প্রবীণ কবিয়াল অক্ষয়কুমার জলদাস ও কবিয়াল ওয়াজিউল্লাহ-র মধ্যে কবির লড়াই। সহসা অক্ষয়কুমার জলদাসের পক্ষ নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মোহাম্মদ শফীউল্লা। হঠকারী বক্তব্য রেখেছিলেন ওয়াজিউল্লাহ-র বিরুদ্ধে। উপস্থাপনা এবং চাটুকারিতা ছিল চমৎকার। আমি একই সঙ্গে অবাকও হয়েছিলাম, বিরক্তও হয়েছিলাম। সেই মোহাম্মদ শফীউল্লাহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এসেছিলেন দাবি নিয়ে । অত্যন্ত চড়া গলা এবং উপস্থিত ছন্দোবন্ধ সরস বাক্যরচনায় পটু। বালিগঞ্জের বাড়িতে আমাকে বলেছিলেন : আপনাদের পাকিস্তান রেডিওতে তো থুথু ফেলতেও যাইনি । এখন এসেছি অনুরোধ নিয়ে, দাবি নিয়ে। রেডিওতে গান গাইবার জন্যে। তবে ছদ্মনামে প্রোগ্রাম করবো। দেশের বাড়িতে বৌ-বাচ্চারা আছে। আমার জন্যে যেন ওদের বিপদ না হয় । নামের সাথে বাঙালি শব্দটা থাকবে। আপনি একটা নাম ঠিক করে দিন।

মোহাম্মদ শাহ্ বাঙালি নাম আমারই দেয়া ।

চট্টগ্রামের একজন থানা পর্যায়ের আওয়ামী লীগ কর্মী মৌলানা নুরুল ইসলাম জ্বেহাদী। তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন নেতার নামে। মুজিবর রহমান জেহাদী । কোরান পাঠ প্রচার করতেন । কোরান পাঠে অংশগ্রহণকারী অপর দুজন ছিলেন মৌলানা খাইরুল ইসলাম যশোরী ও ওবায়দুল্লাহ্ বিন সাইদ জালালাবাদী ।

মৌলানা নুরুল ইসলাম জ্বেহাদী সুকণ্ঠ ছিলেন না। শুদ্ধ মোখারেজে কোরান

পাঠ করতেন। কিন্তু কারীয়ানা এলান বা গায়কী ছিল না। বাংলা অনুবাদও তাঁর কণ্ঠে ভালো হতো না। উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কলকাতায় অনেক খুঁজে একটি বাংলা তরজমা গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছিল । কাজী আবদুল ওদুদের তরজমা। মৌলানা নুরুল ইসলাম জ্বেহাদী যে অংশটুকু পাঠ করতেন, সেটার তরজমা অন্য কাউকে পড়তে হতো। অন্যতম পাঠক ছিলেন আবদুল্লাহ-আল ফারুক।

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা চালু হবার পরের কথা। প্রথম দিকে অধিবেশন শুরুতে কোরান পাঠ প্রচার করা হতো না। ধর্মনিরপেক্ষতার বরাত দেয়া হয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন : বেতার জাতীয় প্রচার সংস্থা । এতে ধর্মীয় ভাষ্য প্রচারে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। দেশের মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত। বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের দিনগুলোতে শুধু বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। আমাদের দেশ মুসলিম প্রধান। স্বভাবত মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব বেশি ঘটা করে উদ্যাপিত হবে।

বাংলাদেশ বেতার থেকে কোরান পাঠের আগ্রহ ছিল মৌলানা নুরুল ইসলাম জ্বেহদীর। আগ্রহ চরিতার্থ করার উপায় ছিল না। চেষ্টা করা হয়েছিল ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার পর। সরাসরি নেতার কাছে প্রস্তাবটি পৌঁছানো হয়েছিল। জনমতের বরাত দেয়া হয়েছিল। বেতারে কোরান পাঠ বন্ধ হওয়ায় জনগণ বিক্ষুব্ধ। অচিরেই অধিবেশন শুরুতে কোরান পাঠ চালু করতে বলা হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্রের ভারপাপ্ত পরিচালক কামাল লোহানীর কাছে পরুরি বাচনিক নির্দেশ এসেছিল । এম আর আখতারের মাধ্যমে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির আলোকে পরপর কোরান-গীতা- ত্রিপিটক-বাইবেল। সরকারি জনসভায়ও একই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। পরপর ৪টি ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ। পাঠকের অভাবে অন্ততপক্ষে কোরান ও গীতা থেকে। বেতারের অনুষ্ঠানে আবারও জনমতের বরাত এসেছিল। এরকম পরপর সর্বধর্মগ্রন্থ নয়। বরং জনসংখ্যাওয়ারি আনুপাতিক হওয়া দরকার। ক্রমান্বয়ে সেই ব্যবস্থাই কায়েমি হয়েছিল। কোরান পাঠ প্রতিদিন অধিবেশনের শুরুতে। এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অন্যতর নির্দিষ্ট সময়ে। আনুপাতিক হারে সপ্তাহে গীতা ৪ দিন, ত্রিপিটক ২ দিন ও বাইবেল ১ দিন।

মৌলনা নুরুল ইসলাম জ্বেহাদী কিন্তু বাংলাদেশ বেতারের কোরান পাঠক হতে পারেননি। কেননা তাঁর কারীয়ানা এলান বা গায়কী ছিল না ।

আগরতলা থেকে ট্রাঙ্ককল এসেছিল জুন-এর প্রথম সপ্তাহে। এম আর সিদ্দিকীর

অফিস থেকে বেগম মুশতারী শফী। আগরতলা ক্র্যাফটস ইনস্টিটিউট-এ ওরা উঠেছিলেন। মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। চৌধুরী হারুনর রশীদ ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে পরিচিত। এসব সুবিধা ছিল। একটা সমস্যা দাঁড়িয়েছিল। আওয়ামী লীগের অফিসে যাতায়াত নিয়ে। ন্যাপ-এর ক্যাম্পের সেটা অপছন্দ। এদিকে এই ক্যাম্পে থাকাটা আওয়ামী লীগের লোকদের সঙ্গে অনাত্মীয়তা। দু'-একদিনেই এই জটিলতা বুঝে নিয়েছিলেন বেগম মুশতারী শফী । কাজেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন কলকাতায় চলে আসার জন্যে। পার্ক সার্কাসে তাঁর আত্মীয়র বাসা। মামা জাহাঙ্গীর কবির। সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের ভাই। পত্র-পরিচিতা ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী । প্রথমে গিয়েছিলাম ব্রাইট স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে পাম এভেন্যুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাসায়। রবীন্দ্রপ্রীতিধন্যা সম্মানিতা মহিলা : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'ন হন্যতে'-র প্রখ্যাত লেখিকা। বলেছিলেন : এখানে এতোগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে থাকবে কোথায়? জাহাঙ্গীর কবিরের বাসাটা খুবই ছোট । গিয়ে দেখে এসো ।

এদিকে আমারই একবার আগরতলা যাবার সুযোগ হয়েছিল। রেকর্ডিং সরঞ্জামের সঙ্গে ভালো মাইক্রোফোন ছিল না। সৈয়দ আবদুশ শাকের বলেছিলেন : আগরতলায় আমাদের ১-কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের সঙ্গে একটা ভালো মাইক্রোফোন আছে। ওটা আনিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়।

আনতে হলে আমাদের একজনের যাওয়া দরকার। এই সুযোগটা আমি গ্রহণ করেছিলাম। ডিসমেন্টাল করে ট্রান্সমিটারটি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর শালবাগান হেড কোয়ার্টার্সে রাখা হয়েছিল। সৈয়দ আবদুশ শাকের একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন এডজুট্যান্ট সায়গলকে। আমার পরিচিতি এবং সাক্ষাতের উদ্দেশ্য।

৩০ জুন কলকাতা থেকে বিমানযাত্রা। যাত্রীবাহী সৌখিন বিমান নয়। কোরিয়ার বিমান। মালামাল বহনকারী। ফ্রি পাসের ব্যবস্থা করেছিলেন নাথবাবু। কলকাতায় আমাদের সরকারের সঙ্গে যিনি লিয়াজোঁ করতেন। পাস-এ আমার নাম লেখা হয়েছিল : 'বেলাল মোহাম্মদ এম-এন-এ (বাংলাদেশ)'। অপর একজন সত্যিকার এম-এন-এ ছিলেন সহযাত্রী । বাংলাদেশের নির্বাসিত গণ-প্রতিনিধিদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল ।

বিমানের পেটটা মালামাল বোঝাই-এর পরিসর। দুপাশে লোহার কাঠামোতে ত্রিপলের সীট। রোড সার্ভিসের বাস-এর সিটের মতো। আকাশপথটা দীঘল। সরাসরি কলকাতা-আগরতলা নয় । বাংলাদেশের আকাশ পাকিস্তানের দখলে।

তাই অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে আসাম মেঘালয়ের ওপর দিয়ে আকাশপথ। কোরিয়ার বিমানটি পথে পথে ৭টি বন্দরে থেমেছিল। ডিব্রুগড়ে যাত্রা-বিরতি। রাতটি কাটাতে হয়েছিল বিমান বন্দরের ওয়েটিং রুমে। সোফায় গা এলিয়ে জেগে-ঘুমিয়ে। সহযাত্রী এম-এন-এ সহ বেরিয়ে গিয়ে অসমীয়া হোটেলে ভাত খেয়েছিলাম। চর্বিযুক্ত গরুর গোস্ত আর মোটা চালের ভাত ।

১ জুলাই বেলা ১০ টায় পৌঁছেছিলাম আগরতলায় । সোজা ক্র্যাফট্স ইন্সিটিটিউটে ।

: আরে, কি খবর? কলকাতা থেকে নিশ্চয়। ট্রেনে এলেন বুঝি? — জিজ্ঞেস করেছিলেন কমরেড আবদুস সাত্তার ।

: না, বিমানে এসেছি।

: তাহলে এমন পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে রাতে ঘুমাননি । পিঠে ময়লার দাগ ।

বিমানের ত্রিপলের সিটের ময়লা সব কাপড়ে লেগেছিল ।

একটা বড়ো কক্ষে ওঁরা ছিলেন। বেগম মুশতারী শফী, মাসুদা নবি, এয়ার মাহমুদ ও শাফাউন নবি। এরাদ, মেরাজ, নাসরীন, বাপ্পী, চিকু ও শারমীন এবং এয়ার মাহমুদের ছেলে ফিরোজ। মেঝেতে চাটাই পাতা। চাটাই-এর ওপরে পাতলা চাদর ও বালিশ। মশারি ছিল। শোবার সময় টাঙিয়ে নেয়া হতো।

এখানে কমিউন পদ্ধতিতে খাওয়াদাওয়া। কাজ সব ভাগ করা। পালাক্রমে ৫/১০ জনের এক-একটি গ্রুপের মধ্যে দায়িত্ব চক্রায়িত। এক সপ্তাহে এক গ্রুপ রান্নাবান্নার দায়িত্বে, অন্য গ্রুপ বাজার করার । আবার আরেক গ্রুপ খাবার পরিবেশনায় নিয়োজিত । পরের বারে দায়িত্ব বদল করা হতো। সবাইকে কাজ করতে হতো। নেতা ও কর্মীগণ । বাজারের জন্যে মাথাপিছু সীমিত বরাদ্দ। ওতে সবজি ও ডাল-ভাতের সংস্থান হতো । এক-দুই বেলা বনজঙ্গল থেকে কচু কিংবা শাকপাতা তুলে এনে টাকা বাঁচানো হতো । সে টাকায় কোনো বেলা আমিষের ব্যবস্থা করা হতো।

খাবারের জন্যে বিরাট হলঘর । মেঝেতে চাটাই-এর আসন পাতা । ঘরের এক ধারে একটা টেবিলের ওপর থরে থরে টিনের প্লেট সাজানো এবং

কাচের গ্লাস। সবাই এক- একটা প্লেট আর গ্লাস নিয়ে আসনে বসতেন। পরিবেশেনের দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রুপ সক্রিয় হতেন । মেহমানদারির মতো ভাত-তরকারি বেড়ে দিতেন প্লেটে প্লেটে । যার যার চাহিদামতো । ঝুটাগুলো জমিয়ে রাখতে হতো প্লেটের আশে-পাশে। খেয়ে উঠে নিজেই ঝুটাগুলো হাতে নিয়ে বাইরে রাখা ড্রামে ফেলতে হতো। নিজের প্লেট-গ্লাস ধুয়ে সাজিয়ে রেখে দিতে হতো যথাস্থানে ।

নাসরীন বলেছিল : কাকু, তোমার প্লেটটা আমাকে দাও। আমিই ধুয়ে রেখে আসবো ।

আমি দিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আরামপ্রিয়তার সুত্রপাত এভাবেই। আমার কাজটি করে দিয়েছিল মেয়ে— গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে। কিন্তু এ থেকেই মানুষ খাটাবার প্রথার উদ্ভব। টাকার বিনিময়ে, শক্তির দাপটে ।

কর্মীসভা বসতো নিয়মিত। নেতারা কারেন্ট এফেয়ার্স নিয়ে আলোচনা করতেন। কর্মীদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। একটি সভায় যোগ দিয়েছিলাম । কমরেড আবদুস সাত্তার বক্তব্য রেখেছিলেন। বলেছিলেন : আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনেক অমিল । তবু আমরা এখন আওয়ামী লীগকে সমর্থন করবো । এ মুহূর্তে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের মধ্যে দ্বিমত নেই। পরে দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমরা একমত হতে পারবো না । তখন আমরা ওদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাবো। এটা অনেকটা একটা বৃক্ষকে জড়িয়ে যেমন বেয়ে বেয়ে লতিয়ে ওঠে লতা। কিংবা বটের ঝুড়ি। মূল বটবৃক্ষটা হারিয়ে যায় কালক্রমে। ঝুড়ির ওপর গজায় পত্র-প্রশাখা ।

আমি মুখ খুলেছিলাম। সমাবেশটি ছিল ঘরোয়া। নিতান্ত পরিহাস করেই বলেছিলাম : আচ্ছা, সাত্তার ভাই, বৃক্ষটা যদি মাঝপথে বানতুফানে উপড়ে পড়ে, তাহলে লতাটাও তো সেই সঙ্গে ধরাশায়ী হবে। ভারতে যেমন সি-পি আইকে বলা হয় ইন্দিরা কংগ্রেসের বি-টিম, আপনাদেরকেও বলা হবে আওয়ামী লীগের বি-টিম।

উপস্থিত সবাই হেসেছিলেন। এ নিয়ে কোনো বাদানুবাদ হয়নি।

সে যাত্রায় আগরতলায় আমি ১০ দিন ছিলাম। ঐ সময়েই এসেছিলেন শান্তি দস্তিদার। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সহধর্মিণী। বিধবার সাজ। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ণেন্দু দস্তিদার প্রয়াত হয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে দলের

সঙ্গে যাত্রা করার কথা ছিল । নির্দিস্ট সময়ে সকলের সম্মিলিত হবার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ণেন্দু দস্তিদার যথাসময়ে পৌঁছতে পারেননি। চৌধুরী হারুন-অর রশীদরা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেননি। দলীয় সঙ্গীদের না পেয়ে বৃদ্ধ পুনেন্দু দস্তিদার বেপথু সীমান্তের পথে যাত্রা করেছিলেন । বিপাকে পড়ে রোগে ভুগে মারা গিয়েছিলেন । শান্তি দস্তিদার একচোট নিয়েছিলেন চৌধুরী হারুন- অর রশীদকে । বলেছিলেন : একজন বৃদ্ধ মানুষ। সারাটা জীবন পার্টির সেবা করলো । তাঁর জন্যে দু'টি মিনিট অপেক্ষা করা গেলো না! আমি আর এই পার্টির সঙ্গে থাকবো না। এখানে সি-পি এম নেতাদের কাছে সব বলবো । কলকাতায় গিয়ে ।

পথের একটি বাঁক ঘুরলেই জেল রোড। মাত্র ৪০/৪২ দিন আগে আমরা ছেড়ে গিয়েছিলাম এই এলাকা। একদিন জেল রোডের বাড়িটি দেখতে গিয়েছিলাম। রাস্তা- সংলগ্ন দরজাটি খোলা। আমাদের সময়ে বন্ধ রাখা হতো। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন। মাত্র কয়েকদিন আগে প্রসূত একটি সন্তানের পিতা । শিশু ও প্রসূতি এই বাড়িতেই ছিলেন। বাড়ির অপর বাসিন্দা মেজর মীর শওকত আলী । তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গিয়েছিল। মেজর মীর শওকত আলীর স্ত্রী আমাকে খেতে বলেছিলেন। রামগড় চা-বাগান থেকে আগত অন্য একজন অতিথি ছিলেন। ওঁদের আত্মীয়। দুই বেগম সাহেবা, ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন, অতিথি ও আমি একযোগে খেয়েছিলাম সে বেলা ।

এ বাড়িতে বেতারকর্মীদের অবস্থানের কথা এঁরা জানতেন। আমার নামও আগেই শুনেছিলেন। ক্যাপ্টেন আকবর হোসেনকে আমার আগরতলা আসার উদ্দেশ্য জানিয়েছিলাম। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী যে-পদ্ধতিতে ফ্রি টিকিট দিয়েছিলেন, তাও জানিয়েছিলাম । এখন মাইক্রোফোনটি নিয়ে ফিরতে হবে। ফেরার টিকিটের ব্যাপারে পরামর্শ করেছিলাম। বলেছিলেন : শালবাগানেই আমাদের অফিস। ওখানে সিলেটের মেজর চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত অফিসার। আপনাদের ক্যাপ্টেন অলি আহমদও ঐ অফিসে বসেন। ওখানেই আসুন । ব্যবস্থা করে দেয়া হবে ।

ক্যাপ্টেন আকবর হোসেনের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়েছিল । তিনি প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতিও। প্রধান সেনাপতির প্রসঙ্গে

বলেছিলেন : তিনি তো ‘স্ট্যাম্প প্যাড' সি-ইন-সি। ‘এম-এন-এ' সি-ইন-সি। বাবা, এম-এন.এ না হলে সেনাপতিও হওয়া যাবে না! জানেন, ২৫ বছর লাগছে আমাদের পাকিস্তানকে দেশ ছাড়া করতে। আর তা করতে গিয়ে যে 'ভূত' আমাদের ওপর সওয়ার হচ্ছে, সেই ভূতকে ছাড়াতে কত ২৫ বছর লাগবে, কে বলতে পারে!

পরদিন গিয়েছিলাম শালবাগান হেডকোয়ার্টার্সে। টিনের ছাউনি বাঁশের ঘর । আসবাব পত্রের প্রাচুর্য ছিল না। শুধু টেবিল-চেয়ার। বসেছিলাম ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কক্ষে। পাশের কক্ষটি মেজর চৌধুরীর। মাঝখানে বাঁশের বেড়ার পার্টিশন । ও-ঘরের কথাবার্তার শব্দ-এ ঘর থেকে শুনতে পেয়েছিলাম। আমাকে বসিয়ে রেখে ক্যাপ্টেন অলি আহমদও ও-ঘরে গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন আকবর হোসেনের কণ্ঠ : স্যার, একটা কথা বলতে চাইছি। গতকাল কথাটা আমার মনে এসেছে।

মেজর চৌধুরী অনুমতি দিয়েছিলেন । ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন বলেছিলেন: আমরা যেভাবে ভারতের কাছে ঋণী হয়ে যাচ্ছি, এর শোধ দিতে গিয়ে কি আমাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে?

: তার মানে? কি বলতে চাও?

: না, বলছি, আওয়ামী লীগ কেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেবে?

: নেতৃত্ব তো ওদেরই । গত নির্বাচনে ওরাই জনগণের ভোটে জয়ী হয়েছে।
: কিন্তু নির্বাচনটা তো, স্যার, যুদ্ধের জন্যে হয়নি। হয়েছিল ৬-দফার ইস্যুতে। মেজর চৌধুরী থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই আলাচনা। অন্য একটি কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম : ওকে বলতে দিন, স্যার! বলো, আকবর, কি বলতে চাও!

: 'আমি বলতে চাই, দেশ স্বাধীন হবার পর— মানে, আমরা যখন দেশে ফিরতে পারবো, তখন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেয়া হবে না ।

মেজর চৌধুরী বলেছিলেন : তবে কে সরকার গঠন করবে?

: কেন, আমরা! সামরিক বাহিনী। সামরিক সরকার অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বে থাকবেন এবং ইলেকশন দেবেন। ইলেকশন করেই স্বাধীন দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা হাতে নেবে। ৬-দফার আওয়ামী লীগ নয় ।

মেজর চৌধুরী এবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন : তোমার তো কথা শেষ হয়েছে, আকবর? এবার আমার কথা শোনো। এসব বিষয়ে আর কোনোদিন কোনো কথা বলবে না। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, সামরিক বাহিনীর ব্যাপারে আমাদের জনগণ ফেড-আপ হয়ে পড়েছে। সেই ইসকান্দার মীর্জা থেকে শুরু। আর কতো? এখন আওয়ামী লীগের লোকরা আমাদেরই তো ভাইবন্ধু । এদের ওপরে আমরা আস্থা রাখতে পারি ।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আমার খুব মনে পড়েছিল ক্যাপ্টেন আকবর হোসেনের কথা। খোঁজ নিয়েছিলাম তাঁর। খোঁজ পেয়েছিলাম ১৯৭৬-এর একুশে ফেব্রুয়ারির মৌসুমে। চট্টগ্রামের একটি একুশে উদ্যাপন কমিটির সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছিলাম । উদ্যোক্তা ছিলেন একজন তরুণ- আবদুল্লাহ-আল নোমান। আওয়ামী লীগের আবদুল্লাহ আল হারুনের ছোট ভাই। তবে নোমান আওয়ামী লীগার ছিলেন না । এখানে-ওখানে ৬টি সভায় ড: মাহমুদ শাহ কোরেশী ও আমি যোগদান করেছিলাম । সভাপতি বা প্রধান অতিথি হিসেবে। ৭ম বা শেষতম অনুষ্ঠানটি ছিল মুসলিম ইন্সটিটিউট-এ। সেদিনের সভাপতি ড. আনিসুজ্জামান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কাজী জাফর আহমদ। ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী ও আমি ছিলাম আলোচক। সে উপলক্ষে কাজী জাফর আহমদের সঙ্গে পরিচয়। তাঁকেও কথায় কথায় বলেছিলাম ক্যাপ্টেন আকবর হোসেনের কথা। বলেছিলাম : আমি অনেক খুঁজেছি। এখন চাকরিতে আছেন কি না, জানি না ।

কাজী জাফর আহমদ বলেছিলেন : এবারে আপনি তাঁর খোঁজ পেতে পারেন। তিনি আমার পার্টিতেই আছেন—ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টিতে। কর্নেল হয়েছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত ।

পরে কর্নেল আকবর হোসেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিত্ব নিয়েছিলেন। একবার প্রসিডেন্টের সঙ্গে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে গিয়েছিলেন। রেডিও বাংলাদেশ সিলেটের পক্ষ থেকে আমি উপস্থিত ছিলাম শ্রীমঙ্গলের সভায়। সিলেটের ইউনাইটেড পিপল্স পার্টির নেতা নান্টু চক্রবর্তীও ছিলেন। কর্নেল আকবর হোসেনকে তিনি আমার কথা জানিয়েছিলেন। দেখিয়ে দিয়েছিলেন আমার বসবার স্থানটি। একটা কমলা হাতে করে মন্ত্রী কর্নেল আকবর হোসেন সেখানে এসেছিলেন। আমাকে কমলাটি দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁর শিশুপুত্রটির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, যাকে সদ্যজাত দেখেছিলাম

আগরতলা জেল রোডের বাড়িতে। ক্যাপ্টেন আকবর হোসেনের কথা আমি একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম। ‘পুনরুক্তি করে বলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৭৯ সালে কবি দিলওয়ার সম্পাদিত ‘সমস্বর' সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ওতে বলেছিলাম:

তৎকৃত (ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন কৃত) একটি উক্তির প্রতিফলন কালক্রমে আমাদের দেশের প্রশাসনিক পরিমন্ডলে ঘটেছে দেখে আমি চমৎকৃত হচ্ছি। কথাটি ছিল, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনতে গিয়ে অন্যতর প্রভাবে আমাদের প্রভাবিত হয়ে পড়ার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা এবং তা এড়াবার জন্যে একমাত্র উপায়-নির্দেশ, মুক্তিযুদ্ধ শেষে নবতর নির্বাচনানুষ্ঠান ছাড়া যুদ্ধপূর্ব আমলে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে নির্বাচন বিজয়ীদের নিকট কোনোক্রমেই প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ না করা ।

‘পুনরুক্তি করে বলা' প্রবন্ধটি ছিল আমার 'বেতার-মুক্তি সংগ্রামে' প্রবন্ধেরই সংক্ষিপ্ততম পুনরাবৃত্তি । প্রবন্ধটির গৌড়চন্দ্রিকায় লিখেছিলাম :

শ্রদ্ধেয় আবুল ফজল আমাকে আমার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কর্মচাঞ্চল্যের ওপর একটি উপন্যাস রচনার পরামর্শ দিয়েছেন। উপন্যাসই উত্তম পন্থা বটে। গল্পের আভরণে ইতিহাসকে যথেচ্ছ এদিক-সেদিক করা যেতে পারে। যে কথা বলতে চাই না, কিংবা যে কথা বলা যায় না, তা বেমালুম উহ্য রাখা এবং অনুরূপ, একটি তথ্যকে সম্প্রভ রাখার জন্যে অন্যতর তথ্যকে যদি চাপা দেয়া সঙ্গত হয়, গল্পচ্ছলেই তা করা সহজ। এ ছাড়াও ভক্তি ও রাজশক্তি যেহেতু ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক এবং এ এক সর্ববৈদগ্ধসম্মত প্রবচন যে, মহাযুদ্ধে হিটলার যদি বিজয়ী হতেন, কীর্তিমান হতেন, পরাজিত হলেন বলেই নিন্দিত হলেন-তাই অনেক সময় জীবন-রক্ষার তাগিদেই ঐতিহাসিক ঘটনার অনেক প্রত্যক্ষদর্শীকে সাজতে হয় অন্ধ, থাকতে হয় নৈর্ব্যক্তিক। অধিকন্তু এমন ঘটনাও আছে, যা যথাসময়ে ছিল অপরিহার্য, যেমন যুদ্ধকালীন হিংসাত্মক প্রচারণা, হত্যাকাণ্ড (Nothing is unfair in love and war), কিন্তু পরবর্তীকালে তার সঠিক মূল্যায়নে বিভ্রান্তির উদ্রেক হতে পারে, তাই অনুল্লেখ্য।

রাজা বা প্রশাসকমাত্রই দৈবিক প্রতিনিধি-এই আপ্তবাক্য, তথা, Theory of Divine Authority কিংবা Might is Right— নিদেনপক্ষে, Survival of the Fittest এর ধকল থেকে ভাবাবেগাপ্লুত আর বিবেকবান মানুষের

অব্যাহতি কোনোকালেই যেমন ছিল না, আজকালও নেই। সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, Truth is stranger than fiction- আমাদের কাছে অনেক সময় অনেক সত্যকে অনুমিত হতে পারে গল্পের চেয়ে অবিশ্বাস্যকর আলীক বলে। বিশেষ করে, গোয়েবল্সীয় প্রচারণায় প্রতিষ্ঠিত কোনো তথাকথিত সত্য-মিথ্যাকে কোনোকালেই আর সহজে সংশোধন করা যায় না।

প্রবন্ধটিতে ‘বেতার-মুক্তি সংগ্রামে' প্রবন্ধের এই অংশটুকু উদ্ধৃত করেছিলাম :

প্রসঙ্গত বলা যায়, দেশের মুক্তি সংগ্রামের যে কোনো কর্মকান্ডে একক নেতৃত্ব কিংবা একক কৃতিত্বের দাবি অত্যন্ত ঘৃণার্হ। অনুরূপ একক দাবি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আগ্রাহ্য। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে যে কোনো জীবন সচেতন নাগরিকেরই কিছু একটা করার জন্যে চিন্তাভাবনার অবকাশ অবশ্যই ছিল । তাই বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসূত্রে সম্মিলিত স্থায়ী বা অস্থায়ী সর্ব পর্যায়ের কর্মীদেরই নিজ নিজ উদ্যোগ ও কার্যক্রমের পরিচিতি ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য । লক্ষ্য করা যায়, কালুরঘাট কিংবা মুক্তাঞ্চল এবং মুজিবনগর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই তিন পর্বেই এক-দুদিনের জন্যে কিংবা নিবেদিতপ্রাণ হয়ে আগে-পরে যাঁরাই যোগদান করেছেন, তাঁরা প্রায় সবা স্বত:প্রণোদিত হয়েই নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছেন। আর ঐ যোগদানের পূর্বাহ্নে তাঁদের অনেকেরই মনে কিছু একটা করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা অহরহ লালিত হয়েছে, লক্ষ্য করা যায় ।

প্রবন্ধটির উপসংহারে লিখেছিলাম :

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবৃত করার পর শ্রদ্ধেয় আবুল ফজলের উদ্দেশ্যে আমার এই প্রতিশ্রুতি নিবেদিত হচ্ছে, যদি জীবনের আনুকূল্য লাভ করি, তবে অবশ্যই আপনার উপদেশ অনুযায়ী আমি একটি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করবো। বস্তুত, বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : তৃতীয় মহাযুদ্ধে কি কি অস্ত্র ব্যবহৃত হবে?-বিজ্ঞানী উত্তর দিয়েছিলেন : সে তো দেখাই যাবে । তবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যাঁরা বেঁচে থাকবেন, পরবর্তী মহাযুদ্ধের জন্যে তাঁরা ইটপাটকেলকেই শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র হিসেবে পেতে পারেন- এবং আবুল ফজল, আমি জানি না, যদি বাংলাদেশে কোনো একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থনা সর্বজনীন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং বিচার-কক্ষও প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার উপযুক্ত লোকদের আদৌ ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল দেখতে পাওয়া যাবে কি না ।

‘পুনরুক্তি করে বলা’ প্রবন্ধটির প্রথম বাক্য ছিল সংলাপ,

: দেখুন, আমরা তো সব ‘মাইনর’-আমার মনে হয়, আপনি একজন ‘মেজর হিসেবে স্বনামে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে সেটার একটা গুরুত্ব হবে

‘সমস্বর’ সঙ্কলন এবং সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রকাশিত “ইতিহীন ইতিবৃত্ত' (সম্পাদক সীতাব আলী) সংসদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দেয়া হয়েছিল। জেনেছিলাম সংসদের কমান্ডার আকরাম হোসেনের কাছ থেকে ।

ফ্রি টিকিটের ব্যবস্থা করা যায়নি। জহুর আহমদ চৌধুরী টিকিটের জন্য ১১৫ টাকা দিয়েছিলেন। ১০ জুলাই ১৯৭১ সকাল ১০.৩০ মি:-এর ফ্লাইট। জ্যামায়ের কোং প্রাইভেট লিমিটেড-এর টিকিট।

আগরতালায় একদিন বেগম মুশতারী শফীসহ বৈকালিক হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। কলেজ টিলায় দেখা আবদুল কুদ্দুস মাখনের সঙ্গে । তাঁর কাছ থেকে রণাঙ্গনের কিছু খবর লিখে নিয়েছিলাম। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাজে লাগানো হয়েছিল।

আর দেখা হয়েছিল হারুন-অর রশীদের সংগে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজের বাংলা ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক । তখন হাপানিয়া গোমতি ক্যাম্পে পলিটিক্যাল মাটিভেটর এবং ভ্রাম্যমাণ শিল্পী সংস্থার পরিচালক।

জুন মাসে সাবরুম থেকে চিঠি লিখেছিলেন আইনুল কবির। আমার অগ্রজতুল্য বন্ধু । আমানটোলা খানকা শরীফের সুত্রে পরিচয়। তাঁর পিতা মৌলানা নজীর আহমদ বাবামণি সুফী সাহেবের একান্ত সহচর ও আমার আব্বার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আইনুল কবির দলমতনিরপেক্ষ সমাজকর্মী । গ্রামীণ ও থানা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি । মিরেরশরাই থানার বাসিন্দা। দখলদার বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে বর্ডার ক্রশ করে এসেছিলেন। আগে ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম শহরে এনায়েত বাজারে দেখা হয়েছিল। মুশতারী লজ থেকে আমাদের কালুরঘাট যাত্রার লগ্নে ।

বালিগঞ্জের বাড়িতে কর্মী কুশলীর ‘গ্যাঞ্জাম'। শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। দায়দায়িত্ব বণ্টনেরও। এম-এন-এ ইনচার্জ আবদুল মান্নান আমাদের প্রত্যেকের বায়ো-ডাটা চেয়েছিলেন। সেটা জুলাই মাসের শেষ ভাগের কথা। বায়ো- ডাটার নিরিখে আগস্ট মাসের প্রথম ভাগে নিযুক্তিপত্র

ইস্যু করা হয়েছিল । এফেক্ট দেয়া হয়েছিল ১ জুন ১৯৭১ থেকে ।

আমার বায়ো-ডাটায় উল্লেখ ছিল, নিজস্ব লেখক-শিল্পী, চট্টগ্রাম বেতার । ৫ বছরের চুক্তিবদ্ধ । কিন্তু আমাকে প্রোগ্রাম অর্গানাইজার পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পত্রপাঠ ছুটে গিয়েছিলাম বালু হাককাক লেন-এর অফিসে। ভুল শুধরে দেবার জন্যে ।

কি ব্যাপার? না, আপনাদের নিশ্চয় ভুল হয়ে গেছে। এই পদে নিযুক্তির জন্যে আমার কিছু ডিসকোয়ালিফিকেশন আছে। আমার গ্র্যাজুয়েশন নেই। আমার বয়স বেশি ।

সেখানে আবদুল মান্নানের সঙ্গে ছিলেন জিল্লুর রহমান এবং এম আর আখতার। আবদুল মান্নান বলেছিলেন : এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে নাকি?

: না, লাভক্ষতির কথা নয়। এখন তো আমরা টিম ওয়ার্ক করছি। কার কোনো পোস্ট, তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। দেশে ফেরার পর এডজাস্টমেন্টের জটিলতা দেখা দিতে পারে ।

জিল্লুর রহমান বলেছিলেন : আমরা কিন্তু আপনাদের বায়ো-ডাটা নিয়ে এ আই- আর-এর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম ।

এম আর আখতার মুখ খুলেছিলেন : আরে মিয়া, আপনার তো নসিব খারাপ। ব্যালান্সিং, বুঝেছেন, ব্যালান্সিং। করেন তো লিডারগিরি। এখানে অন্য যারা এসেছে, তাদের মধ্যে যদি কেউ এ-আর-ডি আসতেন, আপনাকেও এ-আর-ডি পোস্টিং দেয়া হতো। আর-ডি যদি কেউ আসতেন, আপনাকেও আর-ডি করা হতো। নসিবের দোষ । এসেছে কুল্লে ৩ জন পি-ও, কাজেই বুঝতে পারছেন। আপনাদের ডিপার্টমেন্টে তো বড়ো বড়ো পোস্টে আণ্ডার কোয়ালিফায়েড লোকরা ছিলেন । বোখারী সাহেব পাকিস্তানের ডি-জি ছিলেন, আশরাফ-উজ জামান ঢাকার আর-ডি। আপনি তিন নম্বর। যান যান, নিশ্চিন্তে কাজ করুন গিয়ে ।

দেশে ফেরার পর। আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলমকে আমার মুজিবনগরের পোস্টিং-এর কথা জানাতেই তিনি সস্নেহে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন : ভালোই হয়েছে। বেশি বয়সে চাকরিতে এসেছিলেন। সরকারি চাকরিই যখন করবেন, রেগুলার সার্ভিসের ভবিষ্যৎ আছে।

পরে ঢাকায় রিপোর্ট করতে গিয়ে আশরাফ-উজ জামানকে পেয়েছিলাম । অবসরজীবী ছিলেন । বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব দিয়েছিলেন বেতারের ডাইরেকটরেট জেনারেলের। ঢাকা বেতার ভবনে জনারণ্যের মধ্যে আমি তাঁকে কদমবুসি করে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন ।

কামাল লোহানী বলেছিলেন : বেলাল তো পাইওনিয়ার ।

আশারাফ-উজ-জামান বলেছিলেন : হবে না? চট্টগ্রাম বেতারে ও তো আমরাই রিক্রুট।

ঐ অবস্থাতেই আমি জানিয়েছিলাম আমার মুজিবনগরের পোস্টিং-এর কথা। আশরাফ-উজ-জামান বলেছিলেন : এখন তুমি এ-আর-ডি হচ্ছো। তোমরা সবাই একটা করে লিফ্ট পাবে। এটা সরকারি সিদ্ধান্ত ।

মুজিবনগরে একটা রটনা ছিল। সংগ্রামী সরকারি কার্মচারীদের পোস্টিং-এর ব্যাপারে। নির্বাসিত সরকার ঢাকায় ফিরে এসে সব অফিস-আদালত বিরাণ দেখতে পাবেন। প্রথমে অফিসে শূন্য আসনগুলোতে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী সংগ্রামী কর্মচারীদেরকে নিয়োগ করা হবে। পরে, দখলদার সামরিক সরকারের অধীনে যারা কর্মরত ছিলেন, তাঁদেরকে ক্রমান্বয়ে চাকরিতে বহাল করা হবে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ন'মাসকালের আচরণ যাচাই করা হবে। স্বভাবত সেটা ছিল নাজুক পরিস্থিতি।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ১৪ নম্বর কক্ষটিতে সৈয়দ আবদুশ শাকের বসতেন। দেশ শত্রুমুক্ত হবার পরপর সর্বপ্রথম মুজিবনগর থেকে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার চালু করার ব্যাপারে সরেজমিনে দেখার জন্যে । ক্রমান্বয়ে মুজিবনগর থেকে ফিরে এসেছিলেন অন্যান্যরা। সেই ১৪ নম্বর কক্ষেই এসে জুটতেন সবাই । চাকরির দায়িত্বে পাকাপাকি নিযুক্তির প্রতীক্ষায়। সেটা ছিল ১৯৭২ সালের প্রথম চতুরংশ। সেই ক্রান্তিকালে বেতারকর্মীরা হয়ে পড়েছিলেন দ্বিধাবিভক্ত। ক্ষুদ্রতর দলটি পরিচিত হয়েছিল 'মুজিবনগরের হাজি' হিসেবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি 'দালাল' হিসেবে।

দালাল? ব্যক্তিগতভাবে আমার তখন মনে হয়েছিল, বেতারের নিত্যদিনের ভূমিকাই তো দালালি। যে-সরকার ক্ষমতাসীন, তার দেয়া পলিসির দাসত্ব করা। সরকারি কর্মচারী মাত্রই পলিসির দাস। যাঁরা দখলদার সামরিক সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন, তাঁরাও ছিলেন সেই দাসত্বে নিয়োজিত। মুজিবনগরী

কর্মচারীরাও নির্বাসিত সংগ্রামী সরকারের দাসত্বে ছিলেন নিয়োজিত। চট্টগ্রাম বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ আবদুল কাহ্হার কি অপরাধ করেছিলেন? মুক্তিযুদ্ধের সময়েই তাঁকে মুক্তিবাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সৈয়দ আবদুল কাহ্হারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাকিস্তানে (পশ্চিম পাকিস্তানে)। ওভারসিজ প্রোগ্রামে সিলেটি ভাষায় তাঁকে দিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করানো হয়েছিল। প্রবাসী সিলেটিরা যেন দেশে টাকাকড়ি পাঠান, দেশের অবস্থা স্বাভাবিক। সত্য-মিথ্যার ঊর্ধ্বে সেটা ছিল একজন বেতারকর্মীর ক্ষেত্রে পলিসির দাসত্ব। সেই দাসত্ব অনুশীলনের জন্যে হয়তো তাঁর দিকে তাক করা হয়েছিল পিস্তলের নল, উঁচিয়ে রাখা হয়েছিলে বেয়নেট।

একটা সাধারণ তুলনাও আমার মনে এসেছিল। মুজিবনগরী কর্মচারীদের কাজ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু অন্য কর্মচারীদের কাজ তা হয়নি— কখনো-বা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে গিয়েছিল। এতে কিন্তু কর্মচারীর দক্ষতা বা যোগ্যতা নির্ণীত হয়নি। ঐ বিপরীত ভূমিকাটি শুধু সীমান্তের এপারে বা ওপারে অবস্থানমূলক। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত এবং অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নেয়ার কৃতিত্ব অবশ্যই মুজিবনগরীদের। তাই বলে তার পুরস্কার হিসেবে পদোন্নতি কেন দেয়া হবে? অন্য অনেক পথ ছিল পুরস্কৃত করার। এই মনোভাব আমি প্রকাশ করেছিলাম বন্ধুদের কাছে। একজন সহসা বলে বসেছিলেন : বেশ তো, তুমি প্রমোশন নিও না। ছিলে তো স্টাফ আর্টিস্ট। এখন অফিসার হয়ে গেছ। তোমার তো স্যাটিসফেকশন থাকবেই ।

আরেকজন বলেছিলেন : একটা কথা কিন্তু আপনাকে মানতে হবে, বেলাল ভাই! বিপ্লবের পরে প্রশাসনিক রদবদল প্রয়োজন আছে।

উত্তরে বলেছিলাম : সেটা 'কী পোস্ট'গুলোর ক্ষেত্রে ।

দৈনিক 'পূর্বদেশ'-এ ২৮-২-৭২ তারিখে আমার 'অভিমত' প্রকাশিত হয়েছিল শিরোনাম ছিল ''নিয়োগ-বদলি ও আনুষঙ্গিক বিষয়'। লিখেছিলাম :

দেশ গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে আমাদের অফিস-আদালতে এখন ব্যাপক ভিত্তিতে কর্মচারীদের নিয়োগ-বদলি, অপসারণ, পদোন্নয়ন, পদসৃষ্টি ইত্যাদির হিড়িক। নতুন দেশের এবং নতুন প্রশাসনের প্রয়োজনে বহু কেন্দ্রীয় বিভাগও গঠন বা পুনর্গঠন করা হচ্ছে। হচ্ছে, না বলে উপায় নেই, অসম্ভবরকম মন্থর গতিতে, যার অশুভ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিভিন্ন

অফিস পরিবেশে এবং কর্মচারীদের মনে। নিয়োগ-বদলি- অপসারণের বিষয়গুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা অনেকক্ষেত্রেই স্বস্তিতে কাজকর্ম করতে পারছেন না বা কাজে আত্মনিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন না। দেশগঠনের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে কর্মচারীদের প্রতি আলস্য পরিহারের যে আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, তাতে সাড়া দেবার উৎসাহও তাই ক্ষুণ্ন হচ্ছে বহু ক্ষেত্রে । অর্থাৎ দেশ বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের বিপুল কর্মশক্তির সমকালীন সদ্ব্যবহারের কল্যাণ থেকে। কর্মচারীদের নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি নানা কারণেই বিলম্বিত বা দীর্ঘসূত্রী হচ্ছে। কোনো কোনো কেন্দ্রীয় বিভাগের গঠন বা পুনর্গঠন এবং দখলদার পাকিস্তানি সামারিক জান্তার সঙ্গে যোগসাজশকারী বলে চিহ্নিত কর্মচারীদের অপসারণ ও দেশপ্রেমিকদের মধ্য থেকে নিয়োগ বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের পদোন্নয়ন ইত্যাদি আদৌ কিছু সহজ কাজ নয়। এর জন্যে যথেষ্ট সময়ক্ষয় অপরিহার্য। অথচ বেশি সময় যাচ্ছে বলেই কর্মচারীরা নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে পারছেন না। যাঁদের চাকরি থেকে অপসারিত হবার আশঙ্কা রয়েছে তাঁরা আত্মরক্ষার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছেন এবং যাঁরা নিরীহ হিসেবে চিহ্নিত, তাঁরা পদোন্নয়নের আশায় দেশপ্রেমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করছেন- অন্ততপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে সশরীরে যোগদান না করলেও শত্রু অধিকৃত আমলে অফিসে কর্মরত থেকেই মুক্তিযুদ্ধকে যেভাবে সমর্থন ও সহায়তা করেছেন, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পুরস্কার হিসেবে যাদের পদোন্নতি হচ্ছে বা যে সব আনকোরা দেশপ্রেমিকদের উচ্চপদে নিয়োগ করা হচ্ছে, তাঁদের জন্যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে অফিসে অফিসে বহুসংখ্যক পদসৃষ্টির। এর জন্যে এবং নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর জন্যেও বটে, বহু অফিসীয় কাঠামোরও পুনর্গর্বনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান অফিসে বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সমাবেশ করার প্রবণতার ফলেও নিয়োগ-বদলি এবং পদসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

যথেষ্ট সময়ক্ষয় করে এভাবে বিভিন্ন অফিসীয় কাঠামো গড়ে তোলার পর আর একটি সম্ভাব্য সমস্যা অচিরেই দেখা দিতে পারে। সেটা হচ্ছে, পাকিস্তানে (পশ্চিম পাকিস্তান?) কর্মরত বাঙালি কর্মচারীদের প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের জন্যে কর্মসংস্থান করা ।

সে যাই হোক, বর্তমানে যে সব বিচার-বিবেচনার আশ্রয়ে কর্মচারীদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে, তা অনেকটা এ রকম :

যে সব কর্মচারী ২৫ মার্চের পর দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে চাকরি করেননি, বরং মুজিবনগরে চলে গিয়েছিলেন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কাজ করেছেন। —পদোন্নতি ।

যে সব কর্মচারী চাকরি না করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রমাণসাপেক্ষ পদোন্নতি ।

যারা চাকরি ছেড়ে গিয়ে বিদেশে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর ফিরে এসেছেন। -পুনর্নিয়োগ ।

যে সব কর্মচারী দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রাণাধীনে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছেন। —নির্দোষ নিরীহ বলে প্রমাণসাপেক্ষ কাজে বহাল ।

যাঁরা চাকরিরত থেকে নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা করেছেন। প্রমাণসাপেক্ষ পদোন্নতি ।

যাঁরা দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে কর্মরত অবস্থায় নির্যাতিত হয়েছেন। প্রমাণসাপেক্ষ পদোন্নতি ।

যাঁরা দলদার বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশ রক্ষা করে জাতিদ্রোহিতা করেছেন । –প্রমাণসাপেক্ষ অপসারণ।

বস্তুত মুজিবনগরে যাঁরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা পূর্বাহ্ণেই তালিকাভুক্ত, যার জন্যে তাঁদের পদোন্নয়ন বা তাঁদের মধ্যে থেকে আনকোরা নিয়োগ নিতান্তই সহজসাধ্য। কিন্তু পদসৃষ্টির প্রয়োজনে তাঁদেরকে প্রথমত ও-এস-ডি হতে হয়েছে —অনেক ক্ষেত্রেই ও-এস-ডি হিসেবে সুনির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব ছাড়াই। অথচ তাঁদের খাতে মাসোহারা বাবদ সরকারের বিপুল টাকা খরচ হচ্ছে।

এ ছাড়া বাদবাকি প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। যার জন্যে হচ্ছে সময় ক্ষয় এবং একদিকে ও-এস-ডি-দের পূর্ণাঙ্গ কর্মশক্তি ও অন্যদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্তদের কর্মশক্তি -দুয়েরই উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হচ্ছে না এ মুহূর্তে । অথচ সময়ক্ষয় হচ্ছেই।

এমনি জটিলাবস্থার সহজ সমাধানও হয়তো-বা ছিল । মুজিবনগরে এক সহকর্মী বন্ধু কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : যোগসাজশকারী বা দালালরা সব

সময়েই ভালো দালাল । আমাদের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে পাকিস্তানিদের দালালি যদি কেউ করে থাকেন, ঢাকায় ফিরে গিয়ে দেখবো, এখন তারা এক-একজন সাংঘাতিক দেশপ্রেমিক-যে রকমটি বরং আমরা নিজেরাই হবো না, যারা চাকরি ছেড়ে মুক্ত অঞ্চলে চলে এসেছি।

আমার সহকর্মী বন্ধুটির বক্তব্যকে সামনে রেখে বলা যায়, একটি বিজয়ীসুলভ উদার নীতি অবলম্বন করে সকল কর্মচারীকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখার সু-সমাচার দেয়া হলেই সবাই কর্মজীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্তবোধ করতেন এবং তখন কারো মধ্যে কোনো দুষ্কৃতকর্মের দুর্বলতা থাকলে, তাঁকে আমরা অতিরিক্ত দায়িত্ব-সচেতন ও কর্মিষ্ঠ দেখতে পেতাম । আর সেটাই হতো জাতির জন্যে কল্যাণকর।

কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। নতুন দেশের সরকারকে বহুমুখি পরিকল্পনার কাজ হাতে নিতে হয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থানের সমস্যাও দেখা দিয়েছে ব্যাপক আকারে। গণমুখী সরকার কাকে ফেলে কাকে রাখবেন? দু'-একটি উদাহরণ সৃষ্টিকারী সাজা ছাড়া কর্মরত কোনো চাকুরেকে দিয়েই নতুন বেকারসৃষ্টির সঙ্গত কারণ নেই ।

সময়ক্ষয়ের ফলে যে সব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মুজিবনগর ফেরত কর্মচারীদের পদোন্নতি, অথচ প্রমাণনির্ভর পদোন্নয়নের বিষয়গুলো বিলম্বিত হবার ফলেই শেষোক্ত অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ক্ষোভ। 'মুজিবনগরের হাজি' বলে আখ্যায়িতদের বেশি বিশ্বস্ত বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় অফিসগুলোতে নিয়োগ এবং তার জন্যে পদসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আগে থেকে কর্মরত কোনো কর্মচারীকে মফস্বল শহরের অফিসে বদলি করার ফলে শেষোক্ত কর্মচারীর দুর্ভোগজনিত অসন্তোষ। এ কথা সত্য যে, 'সময় সর্বশ্রেষ্ঠ আরোগ্যকর্তা'। প্রতিদিনই আমরা সর্বসময় স্বাভাবিকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ যতোই বিলম্বিত হবে, ততোই এমনি নানা অশুভ প্রতিক্রিয়া মাথা-চাড়া দেবে। এ মুহূর্তে তাই আমাদের অফিসীয় পরিবেশ থেকে 'মুজিবনগর' ও 'অ-মুজিবনগর' মনোভঙ্গির বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে হবে । নতুন পদসৃষ্টির ব্যাপারে সম্ভবপক্ষে ঐচ্ছিক বিধানের অনুশীলন করাই হবে অশেষ কল্যাণকর ।

পরে দেখা গিয়েছিল, পদোন্নতি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সুষম নীতি রক্ষিত হয়নি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের পদোন্নতিতেও বিপুল

বৈষম্য। প্রথমে সবাইকে এক ধাপ উচ্চতর পদে আত্মীকরণ বা প্রমোশন দেয়া হয়েছিল। কোনো কোনো নৈমিত্তিক শিল্পী-কর্মীকে নতুন নিযক্তি দেয়া হয়েছিল উচ্চপদে। বিষয়টি পরে 'বানরের পিঠাভাগ' পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল। সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধানের প্রতিকূল। শব্দ সৈনিক কর্মচারীদের নিজেদের মধ্যেই চাকরিগত জ্যেষ্ঠত্ব নির্ণয়ে জটিলতা ।

মুজিবনগরে রেগুলার পোস্টিং ছাড়াও বেশ কয়েকজনকে ত্রৈমাসিক চুক্তিভিত্তিক নিযুক্তি দেয়া হয়েছিল। বেতন নির্ধারিত হয়েছিল তিনটি স্কেল-এ। মাসিক ৫০০ টাকা, ৪০০ টাকা এবং ৩০০ টাকা। মুজিবনগর সরকারের বেতন-কাঠামোতে সকল কর্মচারীকে তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর লোকদের পূর্বতন বেতনের শতকরা ৭৫% ভাগ, তবে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের পূর্বতন বেতনের ৮০% ভাগ, তবে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে ৩০০ টাকা ফিক্সড।

চুক্তিভিত্তিক নিযুক্তদের ক্ষেত্রেও শ্রেণীকরণ করে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল। চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সর্বস্তরের কর্মীদের তালিকা :

অনুষ্ঠান বিভাগীয় : ১। শামসুল হুদা চৌধুরী (সিনিয়ার প্রোগ্রাম অর্গানাইজার), ২। আশফাকুর রহমান খান (প্রোগ্রাম অর্গানাইজার), ৩। মেজবাহ উদ্দীন আহমদ (প্রোগ্রাম আর্গানাইজার), ৪। বেলাল মোহাম্মদ (প্রোগ্রাম অর্গানাইজার), ৫। টি এইচ শিকদার (প্রোগ্রাম প্রডিউসার),। ৬। তাহের সুলতান (ঐ), ৭। মুস্তফা আনোয়ার (ঐ), ৮। আবদুল্লাহ-আল-ফারুক (ঐ),। ৯। মাহমুদ ফারুক (ঐ),। ১০। আশরাফুল আলম (প্রোগ্রাম প্রডিউসার, চুক্তিবদ্ধ), ১১। আলী যাকের (ইংলিশ প্রোগ্রাম প্রডিউসার), ১২। নজরুল ইসলাম অনু (প্রোগ্রাম প্রডিউসার, "জয় বাংলা' পত্রিকায় কর্মরত', ১৩। কাজী হাবিব উদ্দীন আহমদ (সাব এডিটার, সঙ্গীত বিভাগে কর্মরত), ১৪। "শহীদুল ইসলাম (নিউজ রীডার, এনাউন্সার), ১৫। আলী রেজা চৌধুরী (ঐ), ১৬। মনজুর কাদের ওরফে বাবুল আখতার (ঐ), ১৭। আবু ইউনুস (এনাউন্সার), ১৮। মোতাহার হোসেন (ঐ), ১৯। মোহাম্মদ মোহসিন রেজা (ঐ), ২০। এ কে শামসুদ্দীন (প্রেজেন্টেশন সুপারভাইজার), ২১। সমর দাশ (মিউজিক ডাইরেকটর), ২২। সৈয়দ হাসান ইমাম (প্রডিউসার, ড্রামা), ২৩। রণেন কুশারী (ঐ), ২৪ । সাদেকীন (স্ক্রিপট রাইটার), ২৫। আবদুল তোয়াব খান (ঐ), ২৬। মোস্তাফিজুর রহমান (ঐ), ২৭। নাসীম চৌধুরী (ঐ), ২৮। ফয়েজ আহমদ (ঐ), ২৯। বদরুল হাসান

(ঐ), ৩০। সাইফুর রহমান (রেকর্ডিং সুপারভাইজার, মিউজিক)।

এ ছাড়া অনুষ্ঠান প্রযোজক মনতোষ দে এবং নিজস্ব শিল্পী রঙ্গলাল দেব চৌধুরী শেষ পর্যায়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রকৌশল বিভাগীয় : ১। সৈয়দ আবদুস শাকের (রেডিও ইঞ্জিনিয়ার), ২। রাশেদুল হোসেন (টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট), ৩। আমিনুর রহমান (ঐ), ৪। মোমিনুল হক চৌধুরী (ঐ), ৫ । প্রণব দে (টেকনিক্যাল অপারেটর), ৬। রেজাউল করিম চৌধুরী (ঐ), ৭। এ এম শারফুজ্জামান (ঐ), হাবিবউল্লাহ চৌধুরী (ঐ)।

বার্তা বিভাগীয় : ১। কামাল লোহানী (ইন-চার্জ-নিউজ), ২। মনসুর মামুন (সাব- এডিটর), ৩। মোহাম্মদ আবুল কাসেম ওরফে আবুল কাসেম সন্দ্বীপ (ঐ), ৪। সুব্রত বড় য়া (ঐ), ৫ । মৃণাল কুমার রায় (ঐ), ৬। রণজিত পাল চৌধুরী (ঐ), ৭। পারভীন হোসেন (ইংলিশ নিউজ রীডার), ৮। এজাজ হোসেন (মনিটর), ৯। রসূল আশরাফ চৌধুরী (ঐ), ১০। জাহিদ সিদ্দিকী (উর্দু নিউজ সাব-এডিটর), ১১। শহীদুর রহমান (ঐ), ১২। নুরুল ইসলাম সরকার (নিউজ রীডার) ।

প্রশাসন বিভাগীয় : ১। অনিল কুমার মিত্র (একাউন্ট্যান্ট), ২। আশরাফ উদ্দীন (স্টেনোগ্রাফার), ৩। কালীপদ রায় (স্টেনোটাইপিস্ট), ৪। মহীউদ্দীন আহমদ (অফিস এসিস্ট্যান্ট), ৫। আনোয়ারুল আবেদীন (ঐ), ৬। এস এস সাজ্জাদ (স্টুডিও একজেকিউটিভ-কাম-রিসেপশনিস্ট), ৭। দুলাল রায়, (কপিস্ট), ৮। নওয়াব জামান চৌধুরী (ঐ), ৯। বরকত উল্লাহ (ঐ), ১০। একরামুল হক চৌধুরী (ঐ), ১১। বিমল কুমার নিয়োগী (পিয়ন), ১২। সত্য নারায়ণ ঘোষ (ঐ), ১৩ । শামসুল হক (ঐ), ১৪ । শাখাওয়াৎ হোসেন (ঐ), ১৫। মোহাম্মদ দুলাল মিয়া (ঐ) ।

এ ছাড়াও এম-এন-এ-ইন-চার্জ-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন ফজলুল হক ভূঁইয়া। তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতেন ।

নৈমিত্তিক কথক-শিল্পী অংশগ্রহণকারীদের পারিতোষিক নির্ধারিত হয়েছিল ২০ টাকা। যে কোনো রকমের পার্টিসিপেশনের জন্যে একই ফি। কথিকা লেখা বা কণ্ঠ দেয়া। নাটকে অভিনয় করা। সঙ্গীত পরিবেশন করা। ধারাবাহিক কথিকা লেখক- পাঠকদেরকে ২০০ টাকার কন্সোলিডেটেড কন্ট্রাক্ট দেয়া হতো। তাঁদের

মধ্যে ছিলেন এম আর আখতার, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল হাফিজ, ড. মযহারুল ইসলাম, গাজীউল হক প্রমুখ। এম আর আখতারের দাবির প্রেক্ষিতে তাঁর মাসিক পারিতোষিক ২৫০ টাকা করা হয়েছিল। তাঁর 'চরমপত্র' ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ।

সব চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতেন শামসুল হুদা চৌধুরী। এম-ইন-এ-এন-চার্জের সঙ্গে লিয়াজোঁও তিনিই করতেন। সহকর্মীদের এসাইনমেন্টও শামসুল হুদা চৌধুরী দিয়েছিলেন ।

শামসুল হুদা চৌধুরীসহ একদিন সৈয়দ আলী আহসানের বাসায় গিয়েছিলাম। গোবরা এলাকায় । মুজিবনগরে বাংলাদেশ আর্কাইভস (?) প্রজেক্ট-এর পরিচালক ছিলেন তিনি। সপরিবারে বসবাস করতেন কলকাতায় ।

প্রত্যাসন্ন ঈদ উপলক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার করার পরিকল্পনা হয়েছিল । বাণীর খসড়ার জন্যে সৈয়দ আলী আহসানকে অনুরোধ করেছিলাম আমরা। তিনি তৎক্ষণিক ডিকটেশন দিয়েছিলেন। আমি লিখে নিয়েছিলাম ।

সৈয়দ আলী আহসান স্ক্রিপট লিখতেন না। তাৎক্ষণিকভাবে নিটোল বক্তব্য শেষ করতেন। একদিন স্বরচিত কবিতা রেকর্ড করেছিলেন ডায়রি থেকে দেখে দেখে। কবিতাটি পূর্বাহ্নে রচিত। কবিতার শেষ চরণটি ছিল রূপক। ওতে পরাজয়ের আনন্দ বিধৃত ছিল। যুদ্ধকালীন সেই বক্তব্যটি ছিল বিভ্রান্তিকর। আশফাকুর রহমান ও আমি চমকে তাকিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান তাৎক্ষণিক একটি বাক্য রচনা করেছিলেন মুখে মুখে। জুড়ে দিয়েছিলেন পাঠের সঙ্গে। বক্তব্য সময়োপযোগী হয়ে গিয়েছিল ।

সৈয়দ আলী আহসান আমাকে জানিয়েছিলেন, ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ কমিটি (আই-আর-সি) তাঁকে এবং সাদেক খানকে দায়িত্ব দিয়েছিল বাংলাদেশের দুস্থ সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের একটি তালিকা তৈরির জন্যে। সবাইকে ৫০০ টাকা করে সাহায্য দেয়া হবে। তালিকায় আমার এবং বেগম মুশতারী শফীর নাম সংযোজিত । আমি যেন টাকাটা নিয়ে আসি । তিনি ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন।

১২/২, সিনহুয়া স্ট্রিট-এ আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া স্টাডিজ-এর অফিস। পরিচালক তরুণ মিত্র ।

আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল : আচ্ছা, এই টাকাটা আপনারা কেন দিচ্ছেন?— অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন তরুণ মিত্র। পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন : তার মানে?

: না, জানতে চাইছি, স্রেফ দুর্গত সাহিত্যিক-সাংবাদিকদেরকে সাহায্য হিসেবে অথবা কোনো কিছুর বিনিময়ে?

তিনি বলেছিলেন : আমি সত্যি চমৎকৃত হচ্ছি। আপনাদের আর কেউ এ প্রশ্ন আমাকে করেননি। কারো পক্ষে হয়তো তা সম্ভবও নয়। সবাই তো এখন দারুণ অসুবিধাগ্রস্ত । টাকা পয়সার ভীষণ দরকার। আমি আপনার আত্মমর্যাদাবোধকে প্রশংসা করছি। আসলে আমাদের পরিকল্পনা ছিল, প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী নিয়ে তবেই টাকাটা দেয়া। 'দেশ' পত্রিকায় লিখলে আপনি ৫০ টাকা পেতেন, আমরা ৫০০ টাকা দিচ্ছি ।

শুনেই আমি প্রস্থানোদ্যত হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন : কৈ, আপনার টাকাটা নিয়ে যান ।

: ধন্যবাদ। আমি দু'-একদিন পরেই আসবো। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী লিখে নিয়ে আসবো ।

ইতোমধ্যে শুনতে পেয়েছিলাম, আই-আর-সি আসলে সি-আই-এর ক্যামোপ্ল্যাজ। আর সেজন্যেই রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর নামে বরাদ্দ টাকাটা নেননি। রণেশ দাশগুপ্ত-র সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কথাটা জিজ্ঞেস করতেই বলেছিলেন : আরে, বোকা ছেলে, এখন তোমাদের টাকার প্রয়োজন। টাকাটা নিয়ে নাও গিয়ে। আমি যে নিইনি, সেটা অন্য কারণে। আমার তো টাকার দরকার নেই। কলকাতায় এসে আমি আত্মীয়-বাড়িতে উঠেছি । কোনো খরচপত্র লাগে না । আমি টাকাটা না নিলে, সেই ভাগটা তোমরা বাড়তি কেউ একজন পেয়ে যাবে, এজন্যেই আমি নিইনি ।

১৬-৮-৭১ তারিখে লেখা বিবরণীটি উপস্থাপন করেছিলাম তরুণ মিত্র-র কাছে। বিবরণী— নিবন্ধটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। খসড়া কপিটি সংরক্ষণ করেছিলাম । এখানে তুলে দিচ্ছি :

পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় আর ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম থানার মাঝখানের প্রায় মজে-যাওয়া নদীটি পার হয়ে এসেছিলাম গত ৩ এপ্রিল। বন্দর নগরী চট্টগ্রাম আমার কর্মস্থল। শহরে এবং শহরতলিতেই মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহটি

আমার কেটেছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস অসহযোগের ডাকে চট্টগ্রামের মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখতে পাওয়া যায় সারা মার্চ মাস। বিক্ষোভ মিছিল, সভা- সমিতি, মহিলা সমাবেশ ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে সর্বস্তরের মানুষ— ছাত্র- শিক্ষক, শ্রমিক-মজদুর, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী নির্বিশেষে। এ সবই ছিল সম্পূর্ণ অহিংস। এ সময়ে জননেতা মাওলানা ভাসানী চট্টগ্রাম সফর করেন এবং এ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে লালদীঘি ও পলোগ্রাউন্ড ময়দানে জনসভায় ভাষণ দেন ।

২৩ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে ভেড়ে যুদ্ধসরঞ্জামবাহী জাহাজ 'সোয়াত' এবং ২৪ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যবাহী জাহাজ 'বাবর'। এই দুই ঘটনার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় গণমনে । সারা শহরে রটে যায়, অসহযোগ আন্দোলনকে দমন করার জন্যে অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে। এই রটনা দারুণ বিক্ষোভের কারণ হয়। স্বত:স্ফূর্ত জনতা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়— বন্দর থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পথে চার/পাঁচ মাইল দীর্ঘ সড়কে অসংখ্য ব্যারিকেড তৈরি হয় । আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এলাকার একস্থানে কিছু 'পিচ'-এর ড্রাম পড়ে ছিল— সব ড্রাম রাস্তায় তুলে আনা হয় এবং নির্মীয়মাণ বিল্ডিং-এর ইট, ক্যাবল-এর সরঞ্জাম ও কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদি কায়েদে আজম রোডের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলা হয়। সন্ধ্যায় বিক্ষুব্ধ যুবকরা দু'একটি মোড়ে পিচের ড্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এ অবস্থায় ২৫ তারিখ রাতে বন্দর থেকে সেনাবাহিনী মার্চ করে এসে মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে এবং অনেককে পাকড়াও করে বেয়নেটের মুখে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে সাহায্য করতে বাধ্য করে। কোনো রকমে একটু ফাঁক করে নিয়ে রাতারাতি তারা অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যায়। তারা সে-রাতেই ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের প্রথমে নিরস্ত্র ও পরে আক্রমণ করে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মি. মজুমদারকে হেলিকপ্টারযোগে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়— পরে আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি ।

২৬ মার্চ সকালে চট্টগ্রামের জনজীবন সার্বিকভাবে অস্বাভাবিক দেখতে পাওয়া যায় । সরকারি কর্মচারী কেউ সেদিন অফিসে যাননি । চট্টগ্রাম বেতারের প্রাদেশিক 'হুক আপ' অনুষ্ঠানে টিক্কা খানের নির্দেশের প্রারম্ভিক ঘোষণা

প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বেতার বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ বেতারের কর্মচারীরাও অনুষ্ঠানটি রিলে না করে অফিস ছেড়ে চলে যান।

ওদিকে ২৬ মার্চ সকালবেলা বিপুল সংখ্যক জনতা লাঠিসোঁটা হাতে ক্যান্টনমেন্টের গেটে অবরোধ সৃষ্টি করে। হঠাৎ শুনতে পাওয়া যায়, শহরের কোনো একটি অস্ত্রাগার লুট করা হয়েছে এবং যুবকদের মধ্যে রাইফেল কার্তুজ বিতরণ করা হচ্ছে। দলে দলে যুবকরা রাইফেলের জন্যে আওয়ামী লীগের শহর শাখা অফিস স্টেশন রোডে গিয়ে ভিড় করে । স্টেশন রোডের সার্কিট হাউসের একটি কামরা তখন কন্ট্রোল রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয় । সেখান থেকে টেলিফোনে সর্বত্র অবরোধের বিভিন্ন নির্দেশ কর্মীদের উদ্দেশে দেয়া হতে থাকে। এছাড়া রেলওয়ে বিল্ডিং-এর পাহাড়ে অবস্থিত ইপিআর হেড কোয়াটার্স থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ অবরোধ সৃষ্টির বিভিন্ন নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেয়া হয়।

২৬ মার্চ রাত পৌনে আটটায় হঠাৎ চট্টগ্রাম বেতারের মিটারে ঘোষণা করা হয় : “স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি'। -বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা করেন, তা ব্যর্থ হয়েছে- পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের হঠকারিতার ফলেই এই ব্যর্থতা। বিশেষ করে, গত রাতে বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্টে বাঙালী সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে, এছাড়া সর্বত্র নিরীহ জনসাধারণের ওপর অতর্কিত হামলা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন ইত্যাদি ।

চট্টগ্রাম শহরে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার একটি সাইক্লোস্টাইল-করা ছড়াপত্র বিলি করা হয় ।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে বলা হয়, “আপনারা আগামীকাল (২৭ তারিখ) সকালে, দুপুরে বা বিকেলে যে-কোনো সময়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে পাবেন'। ইত্যাদি। শ্রোতারা প্রায় সারাক্ষণই রেডিও-র স্যুইচ অন করে অধীর প্রতীক্ষায় থাকেন - ২৭ মার্চ সন্ধ্যার পরে অনুষ্ঠান আবার শোনা যায়। এদিন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে মেজর জিয়ার বেতার ভাষণ প্রচার করা হয় । তিনি বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানান ।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতারই ছিল প্রথম দিকে বাংলাদেশব্যাপী সংগ্রামীদের

যোগাযোগের একমাত্র সূত্র বা মাধ্যম। বেতার কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাটস্থ ট্রান্সমিটিং সেন্টারে। ২৮ মার্চ থেকে প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে এ কেন্দ্র থেকে সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করা হয়। এ সময়ে পাকিস্তান বেতার থেকে দাবি করা হয়, 'হুগলী নদীর মোহনায় একটি নোঙর-করা জাহাজ থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তথাকথিত বাংলা বেতার চালু করেছে'। তারা ঠিকই জানতো, শুধু ভারতকে দায়ী করার জন্যেই এ মিথ্যা প্রচার করে । কেননা ৩০ মার্চ বেলা ২.১০ মি: -এ পাকিস্তানি বিমান থেকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের ওপর সাফল্যজনভাবে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এতে বেতার সাময়িকাভাবে বিকল হয়ে পড়ে ।

ইতোমধ্যে ২৮ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দর ও ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ গড়ে ওঠে । সামরিক বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তারা প্রথমে এনায়েত বাজার গোয়ালটুলি বস্তি এলাকায় নরহত্যা ও অগ্নিকাণ্ড ঘটায় এবং পরে লাল খাঁ বাজার এলাকায় নিরস্ত্র জনগণের ওপর আক্রমণ চালায় ।

মেজর জিয়ার নেতৃত্বে একদল বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য ষোলশহর এলাকার উপকণ্ঠে প্রবর্তক পাহাড়ে সমাবিষ্ট থেকে ক্যান্টনমেন্টের গেট দিয়ে পাক সৈন্যের বেরিয়ে আসার পথরোধ করে থাকে। এ অবস্থায় কোনো পরিল্পনায় মেজর প্রবর্তক পাহাড় থেকে সৈন্য সরিয়ে নেন, কেউ বলতে পারে না। আর তাতেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে হানাদাররা বেরিয়ে পড়ে। ৩০ তারিখে চট্টগ্রাম শহরের পতন হয় ।

বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই-পি-আর, পুলিশ বাহিনী ও আনসাদের সমন্বয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা মুক্তিবাহিনী তখন কালুরঘাটের ফুলতলিতে ও পটিয়ায় ছাউনি গাড়ে। ওসব এলাকায় তখন ছদ্মবেশে পাকবাহিনীর কমান্ডোরা প্রবেশ করতে থাকে। তারা প্রথমে শহরের সব বাড়ি থেকে বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে নেয় এবং লোকজনদের ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকে। তাদেরকে সব রকমে সাহায্য করতে থাকে স্থানীয় অবাঙালিরা । অবাঙালি বাসিন্দাদের পরামর্শেই তারা রাতে-বিরেতে বাঙালিদের বাড়িতে হানা দেয় এবং সোনা ও টাকাকড়ি লুট এবং যুবতী মেয়েদের অপহরণ করতে থাকে । বাধা পেলেই হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে ।

১ এপ্রিল দুর্বৃত্তরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে প্রবেশ করে ডাক্তারদের মারধর করে এবং কয়েকজন যুবতী নার্সকে ধর্ষণ করে।

হাসপাতালে বহু রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। দুর্বৃত্তরা হাসপাতালের ছাদে অবস্থান করে রাস্তায় পথচারীদের দিকে গুলি ছুড়ে মারতে থাকে ।

চট্টগ্রামের একজন মসজিদের ইমামকে একজন সৈন্য প্রশ্ন করে : 'তুমি মুসলমান না বাঙালি'? বৃদ্ধ ইমাম জবাব দেন : 'আমি বাঙালি মুসলমান' । সৈন্যটি বলে : ‘‘বাঙালি কখনো মুসলমান হয়? বাঙালি মানেই তো কাফের'। এই বলে বৃদ্ধ ইমামকে গুলি করে মারে ।

২৯ মার্চ আমি কয়েকজন সঙ্গীসহ শহরের বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। পরিবারের লোকদের সাথে যোগাযোগ ছাড়াই ৩ এপ্রিল চট্টগ্রামের গ্রামীণ এলাকা পটিয়া থেকে রামগড়ের দিকে যাত্রা করি । খবর নিয়ে জানতে পারি, চট্টগ্রাম-ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডটি নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা ফটিকছড়ি-রাংগুনিয়া-রাউজান ইত্যাদি গ্রামীণ এলাকার ভেতর দিয়ে প্রায় দেড়শ' মাইল পথ অতিক্রম করি। (পরে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে পটিয়ায়ও বোম্বিং হয়। ওতে শতাধিক পথচারী মারা যায়। ৩০ মার্চ কালুরঘাটের বোম্বিংই চট্টগ্রামে প্রথম বোমা নিক্ষেপ)। রামগড়ে তখন মুক্তিসংগ্রামীদের বিরাট ক্যাম্প গড়ে উঠেছে-নব্য যুবকদের সংক্ষিপ্ত কোর্সে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, দেখে এসেছি ।

(১৬-৮-৭১ কলকাতা)

‘তরুণ মিত্রস্ একাউন্ট' মুদ্রিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেক। কাউন্টারে দাঁড়াতেই এক মিনিটের মধ্যে নগদ টাকাটা হাতে পাওয়া গিয়েছিল। বেগম মুশতারী শফীর টাকাটাও আমি প্রাপকের পক্ষে নিয়েছিলাম। এছাড়া জুন-জুলাই মাসের বকেয়া বেতন একযোগে পেয়েছিলাম। ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক গড়িয়াহাটা শাখায় একাউন্টস খুলে টাকাটা জমা রেখেছিলাম ।

এখন আর্থিক সামর্থ এসে গিয়েছিল। বাসা ঠিক করা এবং আগরতলা থেকে বেগম মুশতারী শফীর পরিবারকে তুলে আনা। শরণাপন্ন হয়েছিলাম সাংবাদিক-অধ্যাপক অজিত দাশের । চৌরংগিতে তেতলার একটি কক্ষে অফিস। একটি সংবাদ সংস্থার ব্যুরো চিফ। অন্যদিকে কলকাতা সিটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, এম আর আখতার সবারই আনাগোনা অজিত দাশের অফিসে। সন্ধ্যার পর ঐ অফিস কক্ষের জানালায় আলো ঝলমলে কলকাতা দেখতে পাওয়া যায়। অজিত দাশ বলেছিলেন : দেখছ কি? শঙ্কর এখানে বসেই তো ‘চৌরংগি' লিখেছেন ।

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ বলেছিলেন : আমাদের বেলাল সাহেবও কবি। তিনি নিশ্চয়ই কবিতা লিখবেন ।

বলেছিলাম : এখন তো, স্যার, ‘পূর্ণিমা চাঁদ ঝলসানো রুটি'। এখন আমার একটা বাসা দরকার ।

এম আর আখতার ছিলেন অজিত দাশের একই সংবাদ সংস্থার ঢাকা প্রতিনিধি। সেই সূত্রে তাঁকে সপরিবারে থাকার জন্যে অজিত দাশ সাময়িক ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ত্রিভলি কোর্টে। ভুটান রাজার বাড়ি। ভুটানের রাজা অজিত দাশের ব্যক্তিগত বন্ধু। বাড়ির একটি ফ্ল্যাট বন্ধুকে দানপত্র করে দিয়েছিলেন রাজা— সেই ফ্ল্যাটে ।

অজিত দাশ জানতে চেয়েছিলেন আমরা ক'জন থাকবো, মাসিক রোজগার কতো? আমার রোজগার এবং বেগম মুশতারী শফী, মাসুদা নবি ও এয়ার মাহমুদের সম্ভাব্য রোজগারের টাকার সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন ১০০ টাকা। প্রতি মাসে ভুটানের রাজার রিলিফ ফান্ড থেকে পাইয়ে দেবেন। বেগম মুশতারী শফীর নামে। অন্যূন এক হাজার টাকা দাঁড়িয়েছিল হিসাব। বাসিন্দা-সংখ্যা হবে ছেলেমেয়েসহ ১০/১২ জন ।

একটু ভেবে নিয়ে অজিত দাশ বলেছিলেন : এরা সবাই ‘বড়োটা’ খায় তো?— আমি বুঝতে পারিনি দেখে আবার বলেছিলেন : ‘বড়োটা’ বুঝলে না? বড়ো মাংসের কথা বলছি ।

: তা খায়। সবাই তো মুসলিম পরিবারের লোক, কিন্তু সে-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

: কারণ ওটাই তোমাদের খেতে হবে। চৌদ্দ বেলার মধ্যে কমপক্ষে দশ বেলা। নইলে খরচ পোষাবে না। এক কে-জি মাত্র পৌনে তিন টাকা দাম। প্রোটিনও আছে। আর, ওটা খেতে হলে কোনো ভদ্রপাড়ায় থাকা চলবে না । থাকতে হবে কোনো মুসলিম বস্তিতে। ঠিক আছে, আমাকে দু'দিন সময় দাও ।

অজিত দাশ ছিলেন কলকাতায় আমাদের সর্বজনীন ‘দাদা’। চুল পাকা খাটো গোলগাল চেহারার চটপটে স্বভাব লোক । একবার আমাদের বেতনের টাকা পেতে দেরি হয়েছিল। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ও অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের মাধ্যমে আমাদের সবাইকে পর্যাপ্ত টাকা ধার দিয়েছিলেন। সে টাকা হয়তো

আর ফেরত পাননি সম্পূর্ণটা । পুজোর সময় বেগম মুশতারী শফী ও মাসুদা নবিকে কাপড় উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে একবার চট্টগ্রাম এসেছিলেন। মুশতারী লজ-এ গিয়েই খোঁজ করেছিলেন 'মাসিক বান্ধবী'র অফিস কোনো ঘরে ছিল, 'মেয়েদের প্রেস' কোনো ঘরে ছিল! প্রেসের ধ্বংসাবশেষ তখনো অটুট ছিল। সরেজমিনে দেখে তিনি বলেছিলেন : সত্যি, তখন যে তোমরা বলেছিলে, মেয়েরা প্রেসে কাজ করে, আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন বিশ্বাস করলাম। কিছু মনে করো না ।

কলকাতা ত্যাগের পূর্বাহ্নে আমাদের টাকার ঘাটতি পড়েছিল। অজিত দাশের মাধ্যমে আই-আর-সি থেকে দ্বিতীয় দফায় টাকা পেয়েছিলাম। প্রত্যেক ২৫০ টাকা করে। আমি ও বেগম মুশতারী শফী ।

ইন্টালি এলাকায় বাসা ঠিক হয়েছিল। ১৮, কুমেদান বাগান লেন-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে দু'টি কক্ষ। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। ওপরের তলায় বাড়িওয়ালি থাকতেন । বিবি রুশিয়া খাতুন। মাসিক ১২৫ টাকা ভাড়া। এ ছাড়া রসিদ ছাড়া ২০০ টাকা 'সেলামি' দিতে হয়েছিল । প্রথম কক্ষটি মোটামুটি প্রশস্ত। ভেতরের কক্ষটি ১০×১৫ ফুট । পেছনে এক চিলতে উঠোন । উঠোনের এক ধারে রান্নাঘর, অন্য ধারে বাথরুম। বাথরুমে পানির ট্যাপ । ঘরের মেঝেতে ছিল ফাটল এবং ছোট গর্ত। বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল না। পূর্বতন ভাড়াটে পৌনে দু'শ টাকার বিল পরিশোধ করেননি। সে টাকাটা আদায় করলে সংযোগ পাওয়া যেতো, সেটা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল । আমরা হারিকেন কিনে নিয়েছিলাম । এ ছাড়া এক চিলতে উঠোনে চন্দ্রোদয় হতো ।

কলকাতা থেকে আমি এক হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম। আগরতলায় এইচ টি ইমামের কাছ থেকে ওঁরা পেয়েছিলেন বিমানের তিনটি টিকিট। এছাড়া লন্ডন থেকে মাসুদা নবির জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন তৈয়বর রহমান। চট্টগ্রামের আজিজ ভাই- এর বড়ো ভাই। আমাদের ছাত্রজীবনে চট্টগ্রামে ছিলেন। আমরা সবাই 'বড়দা' ডাকতাম। হাওড়ার উলুবেরিয়াতে আদি নিবাস ছিল। লণ্ডন থেকে ৩০-৫-৭১ তারিখে লেখা এক চিঠিতে আমাকে তাঁর ভারতীয় আত্মীয়স্বজনের নাম-ঠিকানা দিয়েছিলেন । প্রয়োজনে যেন সাহায্যপ্রার্থী হতে পারি। জানতে চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের খুঁটিনাটি পরিস্থিতি। লিখেছিলেন: 'এখানে ২/৩টা বাংলা পত্রিকা বার হয় । তুমি বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু লিখে পাঠাতে পারো।'

৩১ আগস্ট ১৯৭১ বেগম মুশতারী শফীরা কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। ফ্লোরে

খবরের কাগজ পেতে মামুলি চাদর কম্বল দিয়ে তৈরি হয়েছিল বিছানা। সামনের ঘরে ছেলেরা। পেছনের ঘরে সব মেয়েরা কলকাতায় এসেই ওঁরা রেডক্রশের কম্বল ইত্যাদি রিলিফ সংগ্রহ করেছিলেন।

অক্টোবরের দিকে রাতে শীত পড়তে শুরু করেছিল। তখন মেঝেতে শোয়া সম্ভব ছিল না। বেগম মুশতারী শফীর শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছিল। এডভোকেট গাজীউল হক বাতলে দিয়েছিলেন প্রতিকারের পথ। নিজেই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ফার্নিচারের দোকানে। কিনতে নয়-সে সাধ্য আমাদের ছিলই না। বরং ফার্নিচার ভাড়া করতে। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। মাসিক ভাড়ায় খাটপালঙ্ক। তিনজনের শোবার উপযোগী বিশাল খাট ৫ টাকায়, টেবিল দু'টাকায় এবং প্রতিটি চেয়ার এক এক টাকায়। সর্বমোট মাসিক ২৫ টাকায় আসবাবপত্র ভাড়ায় নিয়েছিলাম। দোকানিরাই ঠেলাগাড়িতে করে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন ।

একজন ডাক্তারের নাম-ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন গাজীউল হক। ডাক্তার পি সি রায়। ইউরোপীয়ান এসাইলাম এলাকাতেই চেম্বার। বেগম মুশতারী শফীকে দেখে গিয়েছিলেন । ভিজিট দিয়েছিলাম ১০ টাকা। দু'দিন পরে আবারও ডাকতে যেতেই তিনি কাতরোক্তি করেছিলেন : দাদা, আপনি সেদিন আমাকে পাতকী করেছেন। আপনি তো বলেননি যে ঐ দিদিটির স্বামী একজন ডাক্তার। গাজীউল হক সাহেব আমাকে বললেন গতকাল । কাকের মাংস তো কাকে খেতে পারে না, দাদা ।

পরে একদিন নিজের জ্বর-জ্বর ভাবের জন্যে ওষুধ নিতে গিয়েছিলাম চেম্বারে। ভিজিট নেবেনই না। কেননা, আমিও নিশ্চয় ডাক্তার পরিবারের লোক। অনেক অনুরোধের পরে আমার দেয়া ৫ টাকার নোটটি রেখে ৩ টাকা ফেরত দিয়েছিলেন।

কাছেই কমরেড আবদুল হালিম রোডের ওপরে মনোহারি দোকান। চাল-ডাল- তেল-নুন ঐ দোকান থেকেই কেনা হতো। দোকানির আদি নিবাস ছিল কুমিল্লা। নাম রমেশ। আমাদের কেনাকাটার পরিমাণ দেখে দ্বিতীয় দিনেই আঁচ করেছিলেন আমরা পূর্ববঙ্গীয়। বলেছিলেন : আমি আপনাদের পরিচয় ঠিকই বুঝেছি, দাদা! এখানকার কোনো খদ্দের এতো বেশি মসলাপাতি কেনে না একসঙ্গে ।

নভেম্বরের দিকে প্রকোপ দেখা দিয়েছিল চোখের ভাইরাসের। একে একে সবাইকে ভুগতে হয়েছিল ।

কুমেদান বাগান লেনের বাড়িতে এসে উঠেছিল মিনি মর্জিনা। ছদ্মনাম ব্যবহার করতো চন্দনা শতদ্রু । মেজর জিয়াউর রহমানের বোন সম্পর্কিতা। আগরতলাতে ছিল। ওখান থেকে এসেছিল কলকাতায়। মস্কোতে একটি শিক্ষা-সফরের বৃত্তি পেয়েছিল মিনি মর্জিনা। সে ব্যাপারে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে বিদেশ-যাত্রা করেছিল। আমরা তাকে বিদায়-সংবর্ধনা জানিয়েছিলাম। বড়ো কক্ষটিতে সমবেত হয়েছিলেন অনেকেই। বক্তৃতা করেছিলেন শিক্ষিকা সেলিনা বানু, ন্যাপ-এর মোহাম্মদ শাহজাহান, মৌলানা আহমদর রহমান আজমী প্রমুখ। আমি কিছু বলতে গিয়ে, কেন জানি-না, কড়া কড়া কথা বলে ফেলেছিলাম। দেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে ওর বিদেশ-যাত্রায় উৎসাহবোধ করিনি বলেই হয়তো। মৌলানা আহমদর রহমান আজমী বলেছিলেন : আপনার আশ্রয়ে কিছুদিন থেকেছে মিনি মর্জিনা। আপনি ওকে আশীর্বাদ করুন।

মিনি মর্জিনার সঙ্গে এ বাড়িতে এসে দেখা করে গিয়েছিলেন পাইলট ক্যাপ্টেন খালেক। স্বাধীনতার পর এয়ার ক্র্যাশ-এ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ।

আগরতলা থেকে এসেছিলেন বুলা মাহমুদ। বেগম মুশতারী শফীর কাছে লেখা পরিচিতি-পত্র নিয়ে। বাসায় উঠেছিলেন। বাসায় আনাগোনা শুরু হয়েছিল তপন ভট্টাচার্যের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নৈমিত্তিক কণ্ঠশিল্পী। বুলা ও তপনের মধ্যে সম্পর্ক যাচাই-এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। জানা গিয়েছিল, ঢাকাতেই গোপনে ওদের বিয়ে হয়েছিল। ভেতরের কক্ষে খাটের পাশে মেঝেতে ক্ষীণ পরিসরে ওদেরকে থাকতে দেয়া হয়েছিল ।

সেপ্টেম্বর ৭১ থেকে ২ জানুয়ারি ৭২ পর্যন্ত আমরা কুমেদান বাগান লেনের বাড়িতে ছিলাম। ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত ভাড়া আদায় করেছিলাম ।

এ বাড়িতে সৈয়দ আলতাফ হোসেন এসেছিলেন কয়েকবার সপরিবারে। আমরাও কলকাতায় তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করেছিলাম। নাসিরুদ্দীন রোড-এ।

আর এসেছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের সহধর্মিণী কমর মুশতারী । ছেলেমেয়েদের নিয়ে ।

কুমেদান বাগান লেন থেকে এক মিনিটের পথ। 'গণশক্তি' অফিস। তালতলা ইউরোপীয়ান এসাইলাম এলাকার জোড়া গির্জার উল্টোদিকের গলি আলীমুদ্দীন স্ট্রিট। সেটি অন্যতর প্রবেশ পথ। বাড়িটি প্রয়াত কমরেড আবদুল হালিমের। অদুরেই তাঁর নামে কমরেড আবদুল হালিম রোড। সে বাড়ির একতলায় পত্রিকার অফিসে গিয়েছিলাম বিশেষ উদ্দেশ্যে।

একই উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন আরেকজন। বাংলাদেশের কমরেড দেবেন শিকদার। আমাকে নিজের নাম-পরিচয় দিয়েছিলেন ধীরেন রায়। কলকাতায় তিনি ঐ ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে দেখা করা ।

কমরেড দেবেন শিকদার ৬ এপ্রিল রাজশাহী জেল ভেঙে বেরিয়েছিলেন। সীমান্ত পেরিয়ে আসার উদ্দেশ্য বলেছিলেন, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের একটি ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলা । মীর্জাপুর স্ট্রিটের টাওয়ার হোটেলে বৈঠক করেছিলেন মশিউর রহমান, আবু নাসের ভাসানী, অমূল্য লাহিড়ী ও মীজানুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে। কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন : আমাদের ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তোলা হয়নি। অমূল্য লাহিড়ীকে পাঠানো হয়েছিল মণি সিংহের কাছে। মীজানুর রহমান চৌধুরীকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের কাছে। মশিউর রহমান (জাদু মিয়া) ও আবু নাসের ভাসানীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগের । আমার ওপর দায়িত্ব ছিল আগরতলায় আবুল বাশার, কাজী জাফর আহমদের সঙ্গে আলোচনা করার। এছাড়া যদি সম্ভব হয়, আতাউর রহমান খান এবং মোহাম্মদ তোয়াহার সঙ্গেও যোগাযোগের। ১৮ এপ্রিল সবাই পুনর্বার সম্মিলিত হয়েছিলাম টাওয়ার হোটেলে । অমূল্য লাহিড়ী জানালেন, মণি সিং চীনপন্থীদের সঙ্গে ঐক্যফ্রন্ট করতে রাজি নন । কারণ তাতে 'দেবী'র সায় নেই ।

দু'তিন দিন আনাগোনা করেও উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কিন্তু আকস্মিকভাবে কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল অচিরেই।

কামাল লোহানীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম ঝাউতলা রোডের ১৪নং বাড়িতে। কামাল আমেদের আস্তানা। আদি নিবাস ছিল কলকাতায়। ঢাকার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। তখন ছিলেন শরণার্থী। ঝাউতলা রোডের এ বাড়িটির উল্টোদিকের বাড়িতে থাকতেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। এলাকাটির নতুন নাম ফজলুল হক সরণি। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে শেরে

বাংলা এ কে ফজলুল হক ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে গণমুখী অবদান রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সি-পি-এম সরকার সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে তাঁর আবক্ষমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। বিধান সভার চত্বরে। গভর্নর হাউসের বাঁ দিকে। হাইকোর্ট ও 'আকাশবাণী' ভবনের মাঝামাঝি স্থানে।

কামাল লোহানী ও কামাল আমেদের মধ্যে সি. পি. এম-এর কথা আলোচিত হয়েছিল । আমি যোগ দিয়েছিলাম। আগরতলায় সি-পি-এম-এর জনপ্রিয়তা আমি দেখে এসেছিলাম। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিধা বিভক্ত হবার পর কমরেড মুজফফর আহমদের আশিসপ্রাপ্ত অংশ সি-পি-এম ।

কমরেড মুজফফর আহমদ আমার আবাল্যের কিংবদন্তীর নায়ক। তিনি ছিলেন আমাদের গৌরব। আম্মাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতাম তাঁর কথা। আম্মা বলতেন : মুজফফর কাকা নাস্তিক । খোদা বিশ্বাস করে না ।

খন্তার হাটখোলা মাইনর স্কুলে আমার ক্লাশমেট ছিল দুই সহোদর। হুমায়ুন কবীর ও শামসুল কবীর। ওরা পিতৃমাতৃহীন ছিল। ওদের আম্মা ছিলেন মুজজফর আহমদের ভাইঝি। অর্থাৎ মুজফফর আহমদ ওদের নানা। নিকট সম্পর্কিত। আমার আম্মা দূর সম্পর্কিতা। শামসুল কবীরের কাছে দেখেছিলাম একটি চিঠি। মুজফফর আহমদের গোটাগোটা হস্তাক্ষর ।

সাউথ সন্দ্বীপ হাইস্কুলে পড়ার সময় আমরা সমমনারা একসাথে জুটেছিলাম। এক ক্লাশ ওপরের ছাত্র ছিলেন শামসুল হুদা। তাঁর কাছে মার্কসবাদের গ্রন্থ ছিল ।

সহপাঠী মগধরা গ্রামের নূর ইসলাম। আর ছিল কর্মকার পাড়ার অনিল । প্রবীণ হরিশচন্দ্র কর্মকার আমাদেরকে উৎসাহ দিতেন । মাইটভাঙ্গা গ্রামের ডাক্তার নূর আহমদ হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন বরিশালে। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতেন। আর একজন উপদেশক ছিলেন মৌলবি আতিকুল্লাহ্। আনিল কর্মকার এবং নূর ইসলামসহ আমি গড়েছিলাম 'লাঙল পার্টি'। বাল্যের চাঞ্চল্য হাতে-লেখা একটি সঙ্কলন বের করেছিলাম 'লাঙল'। সেটা ১৯৫০ সালের কথা।

শামসুল হুদা ছিলেন ভালো বক্তা। মিটিং-এ বক্তৃতা করতেন। আমি ভালো গুছিয়ে বলতে পারতাম না । কিন্তু কড়া কড়া কথা বলতাম । জোতদারদের বিরুদ্ধে । বিত্তবানদের বিরুদ্ধে।

একবার কালীর চরে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। রটে গিয়েছিল, আমরা পিস্তল ছোঁড়ার ট্রেনিং নিতে গিয়েছি। হরিশচন্দ্র কর্মকারের কাছে এক সময় পিস্তল থাকতো। সেটাই তিনি নাকি আমাদের দিয়েছিলেন। জেলা সদরে চলে গিয়েছিল অভিযোগ । ইনকোয়ারি এসেছিল । তখন আমি ছিলাম আনসার বাহিনীর রাইফেল ট্রেনিং-এ। সন্দ্বীপ টাউনের কার্গিল হাইস্কুলের ক্যাম্পে। আমি ছিলাম প্লাটুন কমান্ডার । বিরূপ রিপোর্ট যাবার কারণ ছিল না।

১৯৫২ সালে আমার স্কুলের পড়া শেষ হয়েছিল। তখনই এসেছিল দ্বিতীয়বার ইনকোয়ারি। সন্দ্বীপের এন্টি করাপশনের দারোগা ছিলেন চট্টগ্রাম নিবাসী আসিয়র রহমান । আমার আব্বার বন্ধু ছিলেন তিনি। আব্বা আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী আমাকে আদর করে খাইয়েছিলেন। স্বামীকে বলেছিলেন : দেখ-দেখি, কতো লক্ষ্মী লক্ষ্মী ছেলেটা। এর নামে যে অভিযোগ, সবই মিথ্যা। তুমি ভালো রিপোর্ট লিখে দাও ।

চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম দিনের বাংলা ক্লাশ নিয়েছিলেন অধ্যাপক মোতাহের হোসেন চৌধুরী। ছেলেদের নাম-গ্রাম জানতে চেয়েছিলেন । আমার বাড়ি সন্দ্বীপের মুসাপুর গ্রামে শুনেই উৎফুল্ল হয়েছিলেন। বলেছিলেন : তাহলে তুমি মুজফফর আহমদের গ্রামের ছেলে?

নিদারুণ গৌরববোধ করেছিলাম ।

কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন কামাল আমেদ। সে বিষয়ে আমি একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলাম ১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ। কমরেড মুজফফর আহমদ তখন জীবিত। নিবন্ধনটি পরের বছর ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর পরে ঢাকার ‘বঙ্গবার্তা'য় পত্রস্থ হয়েছিল। পরে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমার সম্পাদিত ‘কমরেড মুজফফর আহমদ' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছিল। সম্পাদনা সহযোগী ছিলেন হাসান মোহাম্মদ। 'কমরেড মুজফফর আহমদ : দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা' শীর্ষক নিবন্ধটিতে মুজিবনগর ও কলকাতাকে অভিন্ন দেখানো হয়নি। হুবহু নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

কমরেড মুজফফর আহমদের দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার অভিব্যক্তি হিসেবে ‘বিপ্লবী লালমোহন' গ্রন্থে সংকলিত তাঁর ‘পাছে না ভুলে যাই' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

লালমোহনের মৃত্যু ব্যক্তিগতভাবেও আমার প্রাণে বেজেছে এই জন্যে যে, তাঁর

জন্মস্থান সন্দ্বীপ আমারও জন্মস্থান। শুধু কি তা-ই? তাঁর গ্রাম মুসাপুর আমারও গ্রাম। ....মীরাটের কারাগারে বসে চাটগাঁর মোকদ্দমার বিবরণ পড়তে পড়তে যেদিন প্রথম আমি জানতে পারলেম যে লালমোহন নামীয় সন্দ্বীপের একটি ছেলে সে-মোকদ্দমায় আসামি রয়েছেন,— আমি কমিউনিস্ট, আর লালমোহনরা সন্ত্রাসবাদী হওয়া সত্ত্বেও— আমার বুক সেদিন গর্বে ফুলে উঠেছিল। সেদিন আমি শুধু একথাই ভেবেছিলাম, হোক না লালমোহন সন্ত্রাসবাদী, তবু তো সে সন্দ্বীপের ছেলে, একটা কিছু বিপ্লবী কাজে তো জড়িত হয়েছে সে। সেদিনকার আমার এই অনুভূতিকে অনেকে আমার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা মনে করতে পারেন, কিন্তু সত্যই আমি এইভাবে অনুভব করেছিলাম' ইত্যাদি ।

মানুষমাত্রই বিচিত্রতর জাগতিক সঙ্কীর্ণতায় আক্রান্ত। আঞ্চলিক, গ্রামীণ, ধর্মীয়, ভাষাগত, বর্ণগত এমনি নানান পর্যায়ের সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতা আদৌ কিছু দোষণীয় বা মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় নয়। বরং পর্যায়ভেদে নিজ নিজ ঠিকানা ও পরিচিতির আশ্রয়ে কর্মকুশলী হয়েই মানুষ মহত্ত্ব অর্জন করে। সাধে কি, আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতারই গণমুখী স্লোগান ইতিপূর্বেকার ‘জয় হিন্দ' এবং সাম্প্রতিককালের 'জয় বাংলা।'

সন্দ্বীপের সন্তান মুজফফর আহমদ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (একক, তদানীন্তন প্রতিষ্ঠাতা হয়েও কলকাতার 'সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের' সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট। এটাই নিয়ম। জন্ম ও লালনভূমির প্রতি মানুষের অনুরূপ যোগাযোগ রক্ষার প্রবণতা নিতান্তই সঙ্কীর্ণতা হলেও তা তার বিরাটত্বকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না।

(খ)

দেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শেষ ছ'মাস আমার মুজিবনগরে কেটেছে । স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে। তখন মুজিবনগর থেকে মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়েছি। বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সহকর্মী শামসুল হুদা চৌধুরী কোনো এক অবকাশে কলকাতায় কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, কমরেড শুধু সন্দ্বীপের এ-গ্রাম এ-বাড়ি সে-বাড়ির লোকজনের খোঁজখবর জানবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। কমরেড মুজফফর আহমদের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আমি তাঁর দলের মুখপত্র ‘গণশক্তি' অফিসে শ্রীযুক্ত সুবোধবাবুর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। শুনেছিলাম, দলের অনুমতি নিতে হয়। কথায় কথায় সুবোধবাবুকে বলেছিলাম

: তিনি (কমরেড) আমাকে দেখলে খুশি হবেন। দেশের মানুষ পেলে তিনি বিশেষ অভিভূত হন । আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন— তিনি কথা বলতে বলতে কেঁদেছেন ।

: অসম্ভব!— সুবোধবাবু বলেছিলেন, কমরেড সে রকম দুর্বলমনা লোকই নন। তাহলে শুনুন, তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুখবর নিয়ে যে টেলিগ্রাম এসেছিল— যখন এসেছিল, তখন পার্টির একটা জরুরি বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে। সে সময়েই টেলিগ্রামটি কমরেড পাঠ করেন। একটুও ভাবান্তর নেই, টেলিগ্রামটির ওপর চোখ বুলিয়ে সেটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখেন। বৈঠকের আলাপ-আলোচনা শেষ হবার পরই তিনি স্ত্রীর আজীবনের ধৈর্য এবং স্বামীর পরিত্যক্ত ভিটি আঁকড়ে ধরে একলা জীবন কাটাবার কথা উল্লেখ করে সাধারণ একটু শোক সন্তাপ প্রকাশ করেন।— সুবোধ বাবুর মতামত আমি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেননি। বরং বলেছিলেন : দেখুন, তিনি এখন একটা বই লেখা নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া শারীরিক অসুস্থও। এ সময়ে তাঁকে যেন কোনোরকম বিরক্ত করা না হয়, আমরা তা-ই লক্ষ্য রাখছি ।

পরে আগস্ট মাসের (১৯৭১) শেষভাগে আমি কমরেড মুজজফর আহমদের সঙ্গে একরকম আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়ে যাই । কলকাতার একজন নতুন বন্ধু কামাল আমেদ এই সুযোগ করে দেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কামাল আমেদ কথায় কথায় আমার বাড়ি সন্দ্বীপে বলে জানতে পেরেই প্রশ্ন করেছিলেন : কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন? দেখা করতে চান? তাহলে আসুন । দেখি, টেলিফোনে পাওয়া যায় কিনা।— টেলিফোনে জানা গেলো, কমরেড তখন বাথরুমে । কামাল আমেদ অন্যপ্রান্তে মেসেজ রেখেছিলেন : বলবেন, আমি কামাল টেলিফোন করেছিলাম।— তারপর আমাকে বললেন : দেখবেন, মিনিট পাঁচ-দশেকের মধ্যেই কাকাবাবুর ফোন আসবে।— হয়েছিলও তাই । রিসিভারটি কামাল আমেদ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন । কমরেড মুজফফর আহমদ এক নি:শ্বাসে প্রশ্ন করেছিলেন : তোমার নাম কি? বাপের নাম কি? তোমাদের কোনো গ্রাম, কোনো বাড়ি? ইত্যাদি ।

এবং বলেছিলেন : এখনই এসে যাও। আমি অবসর আছি।

লেক প্লেসের একটি বাড়ি— তারই দোতলায় কমরেড মুজফফর আহমদ থাকেন। বাড়িটিতে এ-কামরায় সে-কামারায় আরো অনেকেই থাকেন। বাড়িটি পার্টির । অন্যান্যদের মতো কমরেড মুজফফর আহমদের জন্যেও একটি কামরা— বাথরুম, কিচেন, এক চিলতে বারান্দাসহযোগে মোটামুটি মধ্যবিত্তসুলভ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কামাল আমেদই তাঁর 'কাকাবাবু'র কাছে আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । কমরেড মুজফফর আহমদ সে প্রসঙ্গে আদৌ গুরুত্ব দিলেন না। অথচ আমার হয়তো-বা বেশ খানিকটা লোভ ছিল, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণের কৃতিত্ব তাঁর কাছে প্রকাশিত হবার পর তিনি এই আমাকে নিয়েও দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা অনুভব করবেন— তাঁর মনে হবে এই ছেলেটিও তাঁর জন্মস্থানের। শুধু কি তা-ই? তাঁরই গ্রামের। তা না হোক, তবে কমরেড মুজফফর আহমদ অন্ততপক্ষে দু'ঘণ্টা সন্দ্বীপের সেকালের নানা কথা বলেই কাটালেন । সে সব কথাবার্তায়, বিশেষ করে, স্মৃতি রোমন্থনে তাঁর জন্মভূমির প্রতি দুর্বলতার রেশ অসম্ভবরকম প্রকাশ পেয়েছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, কমরেড মুজফফর আহমদ আমার সঙ্গে সমকালীন রাজনীতি নিয়ে একটিও কোনো কথা বলেননি। শুধু কেবল আমার অথবা কামাল আমেদের একটি প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন : এবারে পূর্ব বাংলা ছেড়ে দখলদারদের চলে যেতে হবেই ।

কমরেড মুজফফর আহমদ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। পার্টি কার্যনির্বাহক কমিটিতে তিনি নেই— কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া পার্টির কোনো সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় না। কামাল আমেদই একথা আমাকে বলেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম : আচ্ছা, যতোই হোক, তিনি তো এখন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ— তাঁর পক্ষে সমকালীন রাজনীতির নিরিখে যে-কোনো বিষয়ে সঠিক ধারণা করা কি এখন সম্ভব?

: কি যে বলেন! আমরা তো মনে করি, সমাজচরিত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুরও রাজনৈতিক জীবনবোধের অনবরত বিকাশ ঘটছে। কোনো বিষয়েই তিনি সেকেলে ভাবধারায় প্রভাবিত নন। বিভিন্ন সময়ের এবং এমনকি, সাম্প্রতিক গণভোটের ফলাফল যা-ই হোক, কমরেড মুজফফর আহমদের আশীর্বাদপুষ্ট পার্টিকেই আমি পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী

প্রত্যক্ষ করেছি।

দু'ঘণ্টা কালের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে নম্রভাষী মুজফফর আহমদের ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য পরিচয় আমার চোখে পরিস্ফুট হয়েছিল একটি ছোট বিষয় থেকে। আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন সেখানে একজন অপরিচিত যুবক ছিলেন— হয়তো-বা সি-পি- এম-এর কোনো কর্মী হবেন। তিনি হঠাৎ আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন : আচ্ছা, আপনাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি কোথায়?

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই কমরেড মুজফফর আহমদ সেই কর্মীটির দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলে ফিরে তাকিয়েছিলেন। অত্যন্ত ধীরস্থির অথচ কাটা-কাটা উচ্চারণে তিনি বলে উঠেছিলেন : ওটা তো আন্ডারগ্রাউন্ড রেডিও!— ঐ একটি কথাতেই কর্মীটির কৌতূহলের পূর্ণ নিবৃত্তি হয়েছিল। তিনি আর কোনো কথা বলতে পারেননি— তারপর যতোক্ষণ ছিলেন, একেবারেই চুপ করে ছিলেন ।

কমরেড মুজফফর আহমদ আমাকে বিদায় দেবার সময় আর একবার বা আবার বার-বার যাবার জন্যে আদৌ আমন্ত্রণ জানাননি। তবে বলেছিলেন : যে পণ দিয়ে এসেছিলে এবং এখন ফিরে যাচ্ছো, পথটা ভালো করে চিনে রাখবে, যেন আবার আসতে অসুবিধে না হয়।— কামাল আমেদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : তুমি একটু ওকে পথটা ভালো করে চিনিয়ে দেবে। কোনো মোড় ফেরার সময় কোনো দোকানের সাইনবোর্ড রয়েছে, দেখে গেলে মনে রাখতে পারলে পরে একাই ও আসতে পারবে।

একা কিংবা কোনোদিনই আর কমরেড মুজফফর আহমদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেজন্যে কিছু আসে যায় না। এখন ভাবছি, রাজনৈতিক মতাদর্শ যার যাই হোক, বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবার পর কমরেড মুজফফর আহমদ নিজেই যদি একবার আসতেন এ দেশে! যদি তিনি তাঁর জন্ম ও লালনভূমি সন্দ্বীপে একবারটি আসতেন ।

জীবন ও সমাজ-সচেতন কমরেড মুজফফর আহমদের কাছে তাঁর ধৈর্যবতী স্ত্রীর কবর বা বিদেহী আত্মার অহেতুক স্বীকৃতি কিছুমাত্র না থাকুক, কিন্তু মুজফফর আহমদের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিসমাপ্তি যদি তাঁর মাতৃভূমিতেই হয়, তবে বিশ্বের অগণিত সমাজকর্মীদের জন্যে সন্দ্বীপ নি:সন্দেহে তীর্থস্থানের মর্যাদা পাবে ।

১নং সৈয়দ ইসমাইল লেন। ঠিকানাটি আমার স্মরণ ছিল। আমরা একজন খালা। তাঁকে কোনোদিন দেখিনি। স্থায়ীভাবে কলকাতার বাসিন্দা। তাঁর গল্প শুনতাম আম্মার কাছে। খালুর নাম জানা ছিল না। কেবল একজন খালাত ভাই-এর ডাকনাম জানতাম পাঁচু ।

মুস্তফা আনোয়ারকে বলেছিলাম ঠিকানাটা। বলেছিলেন : আরে, ঐ এলাকাতেই তো আমার আব্বা প্র্যাকটিস করতেন। ছেলেবেলায় আমরা ওখানেই ছিলাম ।

বিরাট উচু পাকা বাড়িটি। আংশিক দ্বিতল। শতবর্ষের পুরাতন। দেয়ালের প্লাস্টার খসে-যাওয়া । ভেঙেই পড়বে নাকি, তা-ই মনে হয়েছিল । রেলিং-ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ভয়ে ভয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিলাম। কদমবুসি করতেই খালা বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন।

: আমার বোন মাহমুদার ছেলে তুই? তোদের নামই শুধু শুনেছি। চোখে দেখিনি।— মাথায় মুখে হাত বুলিয়েছিলেন খালা। একে একে আমার ভাইবোনদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন।

মুস্তফা আনোয়ারের বাবার নাম শুনেই উৎফুল্ল হয়েছিলেন ।

: এ্যা! তুমি আওলাদ ডাক্তারের ছেলে? তোমাকে খুব ছোট দেখেছিলাম । তোমার বাবা তো সবসময় আসতেন আমাদের ঘরে।

সেদিন সময় ছিল না। আরেকদিন যাবো বলে বিদায় নিয়েছিলাম ।

একাই গিয়েছিলাম পরে একদিন। খালাত ভাই পাঁচুর ঘরে বসিয়ে ভাত খেতে দিয়েছিলেন খালা। পাঁচুর স্ত্রী জানতে চেয়েছিলেন, আমি দেবর অথবা ভাসুর। খালা বলেছিলেন : কত ছোট ও! চেহারা দেখে বুঝতে পারো না?

তিনি ছিলেন বিহারি মেয়ে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। চোখে আগুন।

: তোমরা তো জয় বাংলার গুন্ডা। আমি সব শুনেছি। এখানে কেন এসেছ। কি করছ । তোমরা ঢাকার মোহাম্মদপুরে সবাইকে খুন করেছ । আমার মামা-মামিকে তোমরা মেরেছ।

উচ্চস্বরে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি । খালা অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। আমার কিন্তু একটুও খারাপ লাগেনি । বরং বিদায় নেবার আগে বলেছিলাম : ভাবী, জয় বাংলার গুন্ডাকে আজ তো ঘটা করে খাওয়ালেন। আর একদিন এলে বিষ

দেবেন না তো?

মনে মনে সত্যি ভয় পেয়েছিলাম হয়তো-বা । সৈয়দ ইসমাইল লেনে আর যাওয়া হয়নি ।

একজন কাকা ছিলেন আমেরিকা প্রবাসী। দাদার চাচাত ভাই-এর ছেলে । জাহাজি হিসেবে বহির্দেশে গিয়েছিলেন। নেমে পড়েছিলেন মার্কিন দেশে। সেটা আমার জন্মের আগের কথা।

ভারত বিভাগের পর একবার এসেছিলেন দেশে। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। নিউইয়র্ক শহরে একটা হোটেলের মালিক । পাকিস্তানের রাজধানী শহরের নামে ‘করাচি রেস্টুরেন্ট' ।

দেশে তাঁর নিজ পরিবারে টাকাকড়ি পাঠাতেন। চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতাম। একবার পাঠিয়েছিলেন বেশ মোটা টাকা। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। এক চিঠিতে ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁর বন্ধু হিসেবে।

কাকা আহমদ মিয়া অষ্টম মান পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। ঐ সময়ে সন্দ্বীপ টাউনে আমার আব্বার বাসায় থাকতেন । তাঁর হাতের রেখায় ছিল একটা স্পষ্ট 'ব' চিহ্ন । একজন জ্যোতিষী বলেছিলেন, তিনি একদিন খুব বড় লোক হবেন। কিছু কীর্তি রেখে যাবেন। অবসরজীবনে আমার আব্বা তাঁকে চিঠিতে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির সামনের প্রাইমারি স্কুলটাকে উচ্চতর স্কুল করে দিতে বলেছিলেন । সে-বাবদে কিন্তু তিনি টাকা খরচ করেননি ।

নাম, রেস্টুরেন্টের নাম এবং শহরের নামই শুধু আমার জানা ছিল । কলকাতা থেকে একটা এরোগ্রামে আমি চিঠি লিখেছিলাম কাকার কাছে। ঐ অসম্পূর্ণ ঠিকানায় নয়। অন্য কায়দায় খামের ওপরে নাম লিখেছিলাম আবুল হাসান মাহমুদ আলীর । আর নিউইয়র্কের পাকিস্তান মিশনের ঠিকানা। আবুল হাসান মাহমুদ আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। সে খবর আমরা জেনেছিলাম। ভেতরে তাঁকে সম্বোধন করেও চিঠি লিখেছিলাম। কাকার অসমাপ্ত ঠিকানা এবং নিজের পরিচয়। ঐটুকু তথ্যের সাহায্যে সম্ভব হলে আহমদ মিয়াকে চিঠিটি যেন পৌঁছিয়ে দেয়া হয়— এই অনুরোধ করেছিলাম ।

কাকাকে লিখেছিলাম সন্দ্বীপের খবর এবং ইসলামাদের খবর নেবার জন্যে। জেনে নিয়ে আমাকে জানাবার জন্যে। ইসলামাবাদে ছিলেন আমরা বড়দা এ এ এম ইউসুফ । সচিবালয়ে উচ্চপদে কাজ করতেন। থাকতেন সপরিবারে।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রামে এসেছিলেন সিরাজুর রহমান। বিবিসি-র বাংলা অনুষ্ঠানের ভাষ্যকার। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের আত্মীয়স্বজনদের কণ্ঠস্বর বাণীবদ্ধ করেছিলেন তিনি। আমি বড়দাদের খোঁজখবর নিয়েছিলাম। বিবিসির অনুষ্ঠানে আমার কণ্ঠস্বর তাঁরা শুনেছিলেন।

ভাবী লেখিকা সফিনাজ নুরুন্নাহার। তাঁর ১৯৮১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'এলেম আপন দেশে'। পাকিস্তানে ৭ বছর অবস্থানের স্মৃতিকথা। বাঙালিদের বন্দি জীবনের আলেখ্য ।

'এলেম আপন দেশে' গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি : '....কিছুদিনের মধ্যে লন্ডন হয়ে ডাকযোগে দেবর বেলালের চিঠি পেলাম। জানতে চেয়েছে আমাদের খবরাখবর। কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ইকনমিক কনসালট্যান্ট ড. এস এ আতাহার এই গণ্ডগোলের সময় হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে দেশে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এলে শুনলাম, তাঁর বড় ভাই জাহেদ মোক্তারকে মিলিটারিরা টাউনের বাসা থেকে ডেকে নিয়ে রাস্তার উপর গুলি করে মেরেছে। তিনি আরো জানালেন, ছাব্বিশে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতারের স্ক্রিপ্ট রাইটার আমার দেবর বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। পরে বেলাল তার দলবল আর বেতার যন্ত্রপাতিসহ ইন্ডিয়া চলে গিয়েছে। সেই বেতার থেকে স্বাধীন বাংলার ঘোষণা ও অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছে। আরও জানলাম সেই কালুরঘাট ট্রান্সমিটারেই সাতাশে মার্চ রাতে বেলাল মোহাম্মদ বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমানকে ডেকে এনে তাঁর কণ্ঠে একটা ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। মেজর জিয়া শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেছেন বাংলার স্বাধীনতা' (এলেম আপন দেশে, পৃ: ৮৪)

কলকাতা থেকে সরাসরি চিঠি লেখার উপায় ছিল না। সেজন্যেই কাকা আহমদ মিয়াকে চিঠিটি লিখেছিলাম ।

সেই চিঠি আবুল হাসান মাহমুদ আলীর মাধ্যমে প্রাপকের কাছে পৌঁছেছিল। ৫-৭- ৭১ তারিখে আহমদ মিয়া লিখেছিলেন উত্তর। আমরা দেয়া ঠিকানাটি

ছিল : 'প্রযত্নে মাহবুবুল আলম (চাষী), ফরেন সেক্রেটারি, বাংলাদেশ মিশন, ৯ সার্কাস এভেন্যু, কলিকাতা।' চিঠিতে তিনি আমার কলকাতা আসার কারণ জানতে চেয়েছিলেন । টাকার প্রয়োজন হলে লিখতে বলেছিলেন। স্বভাবত প্রলুব্ধ হয়েছিলাম। পরপর তিনটি চিঠি লিখেছিলাম। প্রধানত বাড়ির ও ইসলামাবাদের খবরের জন্যে এবং ঋণ হিসেবে কিছু টাকার জন্যেও। আর উত্তর আসেনি ।

আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন ড. আমিনুল ইসলাম। ওহিও- র রাইট স্টেট ইউনিভার্সিটির (ডেটন) অধ্যাপক। আমেরিকা প্রবাসী বাঙালিদের সমিতি "বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনফরমেশন'। সেই সমিতির পক্ষ থেকে তিনি এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে। নিয়ে এসেছিলেন সাহায্য তহবিল ।

তাঁকেই বলেছিলাম আহমদ মিয়ার কথা। আমার চিঠি নিশ্চয় তাঁর কাছে পৌঁছেনি। নইলে উত্তর না লেখার কারণ ছিল না। আগের চিঠিগুলোর কথা উল্লেখ করে নতুন করে চিঠি লিখেছিলাম। ড. আমিনুল ইসলামের হাতে হাতে।

২৯-১১-৭১ তারিখে আমিনুল ইসলাম আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ঠিকানায়। চিঠিটি পেয়েছিলাম ৯-১২-৭১ এ। চিঠির অংশবিশেষ :

'গত ১৮ নভেম্বর (১৯৭১) আমি নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম ও ছিলাম। আপনার কাকার চিঠিটি ও টেলিফোন নাম্বার আমার কাছে ছিল। কাজেই আমার সঙ্গে তার যোগাযোগও হয়েছে।

আমি তাকে আপনার কথা বললাম। তিনি আপনার চিঠি পেয়েছেন। কিন্তু আপনি যে কাজ করছেন, তাতে তিনি বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট নন, বরং খুবই অসন্তুষ্ট। 'আমি তাকে বলেছি যে, "বেলাল মোহাম্মদ যে কাজ করছে তা যদি আমার কোনো ভাইয়ের ছেলে করতো, তাহলে গর্বে আমি বুক ফুলিয়ে সবাইকে বলতাম।"— আপনার কাকা আহমদ মিঞা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, তা ক্ষমার যোগ্য । তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে আমাদের মুক্তি সংগ্রামে তিনি সহায়তা করবেন না, তা নিজের ভাইয়ের ছেলের জন্যও নয় ।

যাক আপনি দু:খ করবেন না। আত্মীয়-স্বজনরা এখন না বুঝলেও একদিন

তাদেব ভুল ভাংবে । ....

শুভেচ্ছা রইল। জয় বাংলা। ইতি

ড: আমিনুল ইসলাম আর্মহাস্ট স্ট্রিটের রতন বসুর ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন। ১১-১২-৭১ তারিখে রতন বসুর সাথে দেখা করেছিলাম। তাঁকে তিনি লিখেছিলেন : ‘পত্রবাহক বেলাল মোহাম্মদকে তুই একশত টাকা দিয়ে দিস। ভদ্রলোক স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করে— তাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

আমাকে লিখেছিলেন, ঐ টাকায় শীতের কাপড় বানিয়ে নিতে ।

একজন জাপানি প্রকৌশলী তাকাশি ওয়াদা। চট্টগ্রামে একটি ফার্মে চাকরিরত ছিলেন। তখন পরিচয় হয়েছিল ড. মোহাম্মদ শফীর পরিবারের সঙ্গে। দেশে ফেরার পর পত্র যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কাছে বেগম মুশতারী শফী চিঠি লিখেছিলেন। স্রেফ নিজের সীমান্ত অতিক্রম করার কথা। এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি। উত্তরে নিজে থেকেই তাকাশি ওয়াদা কিছু অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ডাকযোগে জাপান থেকে ভারতে টাকা পাঠাবার উপায় ছিল না। নিজের বুদ্ধিতেই তিনি পাঠিয়েছিলেন কিছু আন্তর্জাতিক ডাক টিকিট। সেটা বিক্রয় করার ব্যবস্থা আছে কি না, পরীক্ষা করে যেন ওঁকে জানানো হয় ।

অজিত দাশকে দেয়া হয়েছিল ডাক টিকিটগুলো। তিনি ২৫ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন ।

তাকাশি ওয়াদাকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। তাঁর সমর্মিতার জন্যে । জানিয়েছিলাম, আমাদের টাকার প্রয়োজন নেই ।

‘প্রতিনিধির কণ্ঠ' অনুষ্ঠানের জন্যে এম-এন-এদের ভাষণ রেকর্ড করা হতো। এ পর্যায়ে ভাষণ দান করেছিলেন সর্বজনাব আবদুল মান্নান, জিল্লুর রহমান, আবদুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ইউসুফ আলী, সৈয়দ আবদুস সুলতান, মোহাম্মদ খালেদ, হুমায়ুন খালেদ, নূরুল হক, শামসুর রহমান (শাহজাহান), আবু সাঈদ, শামসুদ্দীন মোল্লা, মোস্তাফিজুর রহমান (চুনু মিয়া), মনসুর আহমদ, সাখাওয়াৎ উল্লাহ, সায়িদুর রহমান, নাজিমুদ্দীন, বেগম বদরুন্নেসা আহমদ প্রমুখ ।

ছাত্রনেতাদের মধ্যে ভাষণ প্রচার করেছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, শাহজাহান সিরাজ, এম এ রেজা প্রমুখ ।

২৪ জুন তারিখে প্রচারিত হয়েছিল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর লিখিত ভাষণ। কর্নেল আতাউল গণি ওসমানী একটি সুদীর্ঘ ইংরেজি ভাষণ প্রচার করেছিলেন ২৫ সেপ্টেম্বর ।

১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সিলেটে ছিলাম। প্রায়ই দেখা পেতাম জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর। একবার এক স্পোর্টিং ক্লাবের সভায় ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম । আমি সভাপতি ছিলাম । তিনি প্রধান অতিথি । একান্তে কথা বলবার সুযোগ হয়েছিল অর্থাৎ তাঁর কথা শুনবার ।

উদ্যোক্তারা সভাপতি ও প্রধান অতিথির জন্যে যে দুটি চেয়ার রেখেছিলেন, তার একটি ছিল সুদৃশ্য ও গদিআঁটা। স্বভাবত আমি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে সেটায় বসতে অনুরোধ করেছিলাম। করমর্দনের ধরা হাতেই তাঁকে টেনে আনতে চেয়েছিলাম চেয়ারটির দিকে। তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন : না, ওটা সভাপতির আসন। ওতে আপনিই বসবেন। এ হচ্ছে শৃঙ্খলার ব্যাপার। এই শৃঙ্খলা নিয়ে আসতে হবে সারাদেশে সর্বক্ষেত্রে। এটা একমাত্র সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের ঘরে-ঘরে প্রত্যেক নাগরিককে দিতে হবে সামরিক শিক্ষা । বাধ্যতামূলকভাবে। সবাই জীবিকার জন্যে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকবে। দেশের ডাক এলে অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। প্রতিটি বসতঘর হবে সেনানিবাস। সমগ্র জাতিকে পরিণত করতে হবে যোদ্ধা জাতিতে। ইত্যাদি।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজুরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী জাতির উদ্দেশ্য ভাষণ প্রচার করেছিলেন। একবার সৈয়দ নজরুল ইসলামের একটি রেকর্ডকৃত বক্তৃতা বাইরে থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল । তিনি টেবিল চাপড়ে বক্তৃতা করেছিলেন। সেই শব্দ ইরেজ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।

এম মনসুর আলী টেপ-এ নিজের কণ্ঠ শুনে আনন্দ পেতেন। রেকর্ডিং-এর পর একাধিকবার শুনতে চাইতেন ।

তাজউদ্দিন আহমেদের কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট। বক্তৃতার সময় কণ্ঠের ওঠানামা ছিল না। দু'বার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। স্বভাবত আমরা স্ট্যান্ড-

বাই থাকতাম প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ডিং-এর সময়।

একদিন নিজের কণ্ঠস্বর শুনে হতাশ হয়েছিলেন। বিনয়ের সাথে বলেছিলেন : আপনাদের হয়তো কষ্ট হবে। আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারছি না আমার ডেলিভারির ওপর। আর একবার কি রেকর্ড করতে পারেন? আমি তাজুদ্দীনের অযোগ্যতার জন্যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর যেন দুর্নাম না হয় ।

নিজের হাতের লেখায় বক্তৃতার পাণ্ডুলিপিটি ছিল। রেকর্ডিং-এর পর আমি কাগজগুলো গুছিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলাম। তাজউদ্দিন আহমেদ হাত বাড়িয়ে নিজেই কাগজগুলো নিয়েছিলেন।

: আমাকে দিন, আমাকে দিন। আপনি পারবেন না। আপনারা অফিসার মানুষ। এটা হচ্ছে দপ্তরির কাজ। এ কাজে আমিই পটু। লিডার আমাকে দিয়ে দপ্তরির কাজই করিয়েছিলেন সব সময় ।

বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ তুলেই তাজউদ্দিন আহমেদ কেঁদে ফেলেছিলেন।

একদিন বলেছিলেন : কিছু মনে করবেন না। একটা শব্দ Annihilation আপনারা খবর পড়ার সময় শব্দটির উচ্চারণ করেন ‘এনহিলেশন'। উচ্চারণটা আসলে 'অ্যানাইহিলেশন' হবে, আমি যতোদূর জানি ।

ডকুমেন্টারি ফিল্ম ডাইরেক্টর ধর্মরাজ। এসেছিলেন দিল্লি থেকে। জুলাই/আগস্টের দিকে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করা। সে ব্যাপারে প্রাথমিক উদ্যোগ নেয়া। রণাঙ্গনের চিত্র, মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, বাংলাদেশের নেতাদের কার্যক্রম ইত্যাদি। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা ছিল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১০ জন প্রতিষ্ঠাতা কর্মীর ওপরে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরির।

বালিগঞ্জের বাড়ির গেটে ধর্মরাজ ট্যাকসিতে বসেছিলেন। চিত্রনায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। বাইরে তখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি । ট্যাকসির ভেতরে গিয়ে বসেছিলাম আমি ও সৈয়দ হাসান ইমাম । ধর্মরাজ বলছিলেন : আপনাদের ওপরে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম করতে চাই। আপনারা সবাই এখানেই তো আছেন?

বলেছিলাম : হ্যাঁ, আমরা ১০ জনই আছি। কিন্তু ডকুমেন্টারি ফিল্মের পর্দায় দাঁড়াবার প্রস্তুতি আমাদের নেই। অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্তে। ২৬ মার্চ থেকে শুরু

হয়েছিল আমাদের কর্মযাত্রা। চট্টগ্রাম থেকে। মাঝখানে ছিলাম আগরতলায়। এই ক্ষুদে টিম নিয়ে। প্রতিদিনই বেতারের অনুষ্ঠানে আমরা ভয়েস থ্রো করেছি। কিন্তু নিজেদের নাম প্রচার করিনি। ভারতীয় পত্রিকায়ও আমরা নাম প্রকাশ করতে দিইনি। এমনকি, আমাদের একজন আইনজীবী গাজীউল হক সাহেব একটি বই লিখেছেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ওতে আমাদের কার্যক্রমের কাহিনী আছে, নাম নেই । আমরা নাম প্রকাশ করতে চাইনি । আগরতলায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আমাদের গ্রুপ ফটো তুলতে চেয়েছিলেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। আমরা দিইনি ।

ধর্মরাজ বলেছিলেন : কিন্তু কেন? এই প্রচারবিমুখতা কেন?

: প্রচারবিমুখতা কি না, জানি না । তবে আত্মপ্রচারের সময় এখন নয় । আর তাছাড়া মুজিবনগরে এখন আমরা আমাদের নির্বাসিত সরকারের পলিসির অধীন। আপনি বরং এ বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন ।

এ কথায় সৈয়দ হাসান ইমামও সায় দিয়েছিলেন। এবারে ধর্মরাজ ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছিলেন। সৈয়দ হাসান ইমাম সঙ্গ দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। আমি সেই ট্যাক্সিতেই ওঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম । ৯-সি, নাসিরুদ্দীন রোডের অফিসে। তখন বেলা ১২টা এক গাদা দৈনিক পত্রিকা নিয়ে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ একা অফিসে ছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম দুই নবাগতকে । দু'জনই চিত্রজগতের লোক। একজন ভারতীয়, অন্যজন ঢাকার বাসিন্দা।

নাসিরুদ্দীন রোডের অফিসে আমি আগে কয়েকবার এসেছিলাম । ন্যাপ নেতাদের মধ্যে আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধব ছিলেন। মৌলানা আহমদর রহমান আজমী ছিলেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে চট্টগ্রামে গঠিত ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম কমিটির সম্পাদক । ঐ কমিটিতে আমি সদস্য ছিলাম।

সৈয়দ আলতাফ হোসেন ঐ বাড়িরই পেছনের অংশে থাকতেন। স্ত্রী-কন্যাসহ। ওখানে আনাগোনা ছিল চট্টগ্রামের চেনাজানা কর্মীদের। তাঁদের কাছ থেকে চট্টগ্রামের খবরাখবর জানা যেতো ।

একদিন মৌলানা আহমদর রহমান আজমী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সঙ্গে। আমার সমকালীন দায়দায়িত্বের কথাও বলেছিলেন। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন : আপনারা তো আগে আগরতলা ছিলেন । আপনারা কিন্তু খুব ভাইটাল কাজ করছেন । খুব ব্যস্ত থাকতে হয় নিশ্চয় ।

: জি। আমাদের এখন আগরতলার তুলনায় কর্মীসংখ্যাও অনেক বেড়েছে। অনুষ্ঠানের কলেবরও বেড়েছে।

: অবসর পেলেই আসবেন। কথাবার্তা হবে। ভালো কথা, আপনি একটু এদিকে আসুন—

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন কক্ষের এক কোণে। জনান্তিকে নিম্নকণ্ঠে বলেছিলেন : আপনি তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে কাজ করছেন। ওদের নিজেদের ভেতরে ঐক্য নেই। মোস্তাক হলো আমেরিকাপন্থী, আর তাজউদ্দিন আমাদের পন্থী। দুইজনের মধ্যে দারুণ ক্ল্যাশ ।

আমি নীরব ছিলাম । অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় প্রশ্ন করেছিলেন : দুইজনের মধ্যে যে ক্ল্যাশ, সেটা খেয়াল কইচ্ছেন নি?

:জি না ।

পরে আরেকদিন একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। আমাকে কক্ষের এক কোণে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের আত্ম-কোন্দলের কথা । স্বভাবত আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু কোনো কথা বলিনি।

সেই দুই দিনই ছিল অফিস-কক্ষে কর্মীদের সমাবেশ। আজ একা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং আমরা তিনজন অভ্যাগত। এর মধ্যে দু'জন নবাগত। সদ্য সদ্য পরিচিত। আজ ছিল আকস্মিক উপস্থিতি। এই পরিবেশেও সহসা আসন ছেড়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ । আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন একান্তে । : জানেন তো নিশ্চয়, এই তো সেদিন মোস্তাক আর তাজুদ্দীনের মধ্যে এক চোট হয়ে গেছে।

: জি না, স্যার। আমি কিছুই জানি না ।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ অনুযোগ দিয়ে বলেছিলেন : দূর, মিয়া! ওদের

ভেতরে থাকেন। কিচ্ছু খেয়াল করেন না। সব জেনে আমাদের জানাবেন তো!

উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম : আমি কি আপনার এজেন্ট, স্যার?

সব কথা পরে সৈয়দ আলতাফ হোসেনকে বলেছিলাম । তিনি হেসেছিলেন। কোনো মন্তব্য করেননি।

কমরেড খোকা রায় ও কমরেড আবদুস সালামের (বারীন দত্ত) নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী বজলুর রহমান। একদিন দেখা হয়েছিল পথ-উড়ো। বলেছিলেন : হাতে সময় থাকলে চলুন । কাছেই প্রেস, আমাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ছাপা হচ্ছে । এখনই হবে লাস্ট ইমপ্রেশন ।

সাপ্তাহিক 'মুক্তিযুদ্ধ'। লক্ষ্য করেছিলাম, পত্রিকার লাল-রঙা শিরোনামের নিচে ব্র্যাকেটে 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র' কথাটি মুদ্রিত। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম বজলুর রহমানের। বলেছিলেন : এটা তো আমাদের পার্টির আন্তর্জাতিক রেজিস্টার্ড নাম । তাই যখন-তখন পাল্টানো যায় না।

বলেছিলাম : বলেন কি! টেলিগ্রাফিক ইন্টিমেশন দিয়েই পাল্টানো দরকার ছিল। অথবা, 'পূর্ব পাকিস্তানের' কথাটা ক্রশ করে নিচে 'বাংলাদেশের' লিখে ব্লক করে ছাপাতে পারেন।

: না। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

পরের দিন আকস্মিক যোগাযোগ। গিয়েছিলাম বালু হাককাক লেন-এ। ঐ সময়ই পত্রিকার কপি নিয়ে গিয়েছিলেন বজলুর রহমান। শুভেচ্ছা কপিটি উৎসাহের সঙ্গে হাতে নিয়েছিলেন 'জয় বাংলা' সম্পাদক আহমদ রফিক (আবদুল মান্নান, এ-এন-এ)। এমন চটতে দেখা যায়নি তাঁকে কোনোদিন। যাচ্ছে তাই বকাঝকা করেছিলেন বজলুর রহমানকে।

পরের সংখ্যা 'মুক্তিযুদ্ধ'-এ পূর্ব পাকিস্তান নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। স্বীকৃত হয়েছিল বাস্তবতা। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'মুক্তিযুদ্ধ'।

১৮ ডিসেম্বরের ১৯৭১ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় আমাদের একটি গ্রুপ ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। দশজনের মধ্যে একজন ছবিতে অনুপস্থিত। ছবিটি ডিসেম্বরেরই প্রথম সপ্তাহে তোলা হয়েছিল। কলকাতার একটি বাড়ির ড্রয়িং

রুমে। আমরা আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমন্ত্রিতদের মধ্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর এবং অজিত দাশ ছিলেন। 'যুগান্তর'কে আমাদের গ্রুপ ছবিটি হয়তো বা অজিত দাশই সরবরাহ করেছিলেন। ছবির নিচে আমাদের নাম ছিল না। এই কথাগুলো মুদ্রিত ছিল : 'বাংলাদেশের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোক্তাদের দেখা যাচ্ছে। গত ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এঁরাই এঁরা কাজ শুরু করেছিলেন। দু'একদিনের মধ্যে বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।— ফটো : যুগান্তর।'

গাজীউল হকের Bangladesh Unchained গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ডিসেম্বর ১৯৭১-এর শেষ সপ্তাহে। প্রকাশক ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। এটি লেখকের 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বাংলা গ্রন্থের পুনরাবৃত্তি বিশেষ । গ্রন্থের শেষাংশে Addenda : A chronology of Main Events পর্যায়ে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর ঘরে লেখা হয়েছিল : Ten freedom fighters occupied Chittagong Radio Station, Tikka Khan's broadcast was stopped, Sheikh Mujib's declaration was broadcast.

১৫৩ পৃষ্ঠার মুদ্রিত বিবরণীটি ছিল : On the 26th of March Balal Muhammad, Md. Abul Quasem Sandwip. Rashidul Hossain, Aminur Rahman, Abdullah Al-Faruk, A. H. M. Sharfuzzaman, Syed Abdus Shaker, Mustafa Anwar, Rezaul Karim Chowdhury and Kazi Habibuddin Ahmed- ten valiant youths of Chittagong, the home of Surya Sen, Sen, occupied the Radio Station Chittagong. Broadcast of general Tikka's speech was withheld. The receiving and transmission centre at Kalurghat (Chandgaon) and broadcasting station at Agrabad, nine miles away. were under control of Mukti Fouj. Swadhin Bangla Betar Kendra (Free Bangladesh Radio) started functioning at 1,00 P. M. on the same day. the directives of Sheikh Mujib were broadcast over and over again. But the Swadhin Bangla Betar Kendra had to be saved. The valiant fighters rushed to Fultali under Boalkhali, P. S. to meet Major Ziaur Rahman. They requested him to save radio station. Major Zia

hugged the brave youths at the news, and then he rushed to Kalurghat and put a strong guard around the transmission centre. Major Zia is a name to be remembered in the history of Bangladesh. On the 27th March 11.00 P. M. Major Zia addressed the people of Bangladesh on behalf of Sheikh Mujib. On the 30th March at 2.10 P. M. the Swadhin Bangla Betar Kendra was bombed and straffed by the bombers and fighters of the Pakistan Air Force. Knowing that again they would be attacked very soon, the ten youths dismentled one transmitter of one K. w. and shifted the same to a safer place, 24 miles away and again from there to a deep jungle in the liberated area. From the 3rd April these ten valiant fighters of Chittagong started the functioning of the Swadhin Bangla Radio from a deep Jungle.

শেখ কামালকে নিয়ে এসেছিলেন আমিনুল হক বাদশা। চোখে-মুখে অসহায় ভাব । ছিপছিপে গড়ন। সুদর্শন যুবক। প্রথম আলাপেই আমাকে ‘কাকা' সম্বোধন করেছিল। 'তুমি' করে কথা বলতে অনুরোধ করেছিল। কয়েকদিন সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছিল ।

১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন ঝটিকা বেগে এসেছিল ঢাকা বেতার ভবনে । সাথে দু'তিনজন সঙ্গী-সাথী ছিল। দেখতে পেয়েই আমি বসতে বলেছিলাম। বলেছিল : না, বসবো না। আপনাদের সবাইকে বলতে এসেছি, আপনাদের প্রোগ্রাম একেবারেই ভালো হচ্ছে না। বুঝেছেন?

মার্চ (১৯৭২)-এর মাঝামাঝি সময়ে আমি ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেই প্রথম এবং হয়তো শেষবার। গিয়েছিলাম বেগম মুশতারী শফীর সঙ্গে। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে লেখা আবুল ফজলের পত্র নিয়ে ।

বেগম মুশতারী শফী ভেতরে মেয়েদের বসবার ঘরে গিয়েছিলেন। আমি বাইরের দিকের বড়ো ঘরটিতে বসেছিলাম। দেয়ালে পিঠ লাগানো অনেকগুলো চেয়ার। সামনে ছোট টেবিলে দৈনিক পত্রিকা। ঘরের একধারে কয়েকটি টেলিফোন সেট। লোকজন ছিলেন অনেক । আসা-যাওয়ায় এবং কেউ কেউ

আমার মতো চুপচাপ বসে থাকা । আমি খবরের কাগজ রেখেছিলাম চোখের সামনে। দোতলার সিঁড়িটা সহসা চোখে পড়েছিল। শেখ কামালকে নামতে দেখেছিলাম। স্বভাবত সেদিকে তাকিয়েছিলাম। চোখে চোখ পড়েছিল। শেখ কামাল চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তবু তাকিয়েছিলাম। পুরু কাচের চশমা, হয়তো এক নজরে আমাকে চিনতে পারেনি। আবারও চোখ পড়েছিল চোখে। শেখ কামাল চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ভেবেছিলাম, অনেকেই নিশ্চয় বাড়িতে আসে অবাঞ্ছিত দাবি নিয়ে। যুদ্ধকালীন আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে। শেখ কামাল তাই বিরক্ত। আমার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না আজ। পত্রিকায় মুখ ঢেকেছিলাম আমি।

হঠাৎ কানে এসেছিল বাজখাঁই কণ্ঠস্বর। শেখ কামালের ।

: এই যে, কি কর তোমরা সব? ঐ এনায়েতুল্লাহ— কতো বড়ো দু:সাহস, আমাকে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপে পত্রিকায়! ইচ্ছে করলে আজই তাকে আমি দালাল বানিয়ে দিতে পারি। পারো না তোমরা ঐ সাংবাদিক ব্যাটাকে সামাল দিতে? সব ক'টার চাকরি খাবো আমি তোমাদের। এই বলে গেলাম ।

চকিতে পত্রিকা সরিয়ে দেখেছিলাম। টেলিফোনের কাছে বসে-থাকা কর্মচারীরা নতমুখি ছিলেন। শেখ কামাল কথাগুলো বলেই দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিল ।

'হলিডে'-তে বেরিয়েছিল একটি কার্টুন। একজন পিতা ও কিশোর পুত্র। পুত্রের হাতে একটি পত্রিকা, পত্রিকার ব্যানার হেডিংটি উৎকীর্ণ । ‘জ্যেষ্ঠপুত্র ও সরকারি সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে রাষ্ট্রীয় সফরে বঙ্গবন্ধুর দিল্লি যাত্রা' । কার্টুনের নিচে কিশোর পুত্রের সংলাপ : Papa, Join politics, let's go abroad.

রাশিয়া এবং ভারত। এই দুই দেশে শেখ কামাল পিতার সফরসঙ্গী হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তির পরে ঐ দুই মাসের মধ্যেই ।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরের কথা। আবুল ফজল ব্যক্তিগত নিবন্ধ লিখেছিলেন। শোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়নও করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর নিহত পরিজনদের। শেখ কামাল সম্পর্কেও নিজের সু-ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। সেই গ্রন্থের ওপরে মুক্তবোধ আলোচনা করেছিলাম আবুল ফজলের সঙ্গে। চট্টগ্রামের সাহিত্য নিকেতনে তাঁর বাসভবনে। ওখানে ছিলেন শ্রদ্ধেয়া উমরতুল ফজল। আবুল মনজুর ও আবুল মোমেন। বলেছিলাম : স্যার, আপনাকে আমরা বাংলার বিবেক বলে থাকি । আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র

ক্ষমতার কালে তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। শেখ কামাল একজন নব্য যুবক। তার মধ্যে দোষগুণ থাকবেই । আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করলেই তা একজন যুবকের সততা-সাধুতার প্রমাণ হতে পারে না । আপনার মতো সৌম্যদর্শন প্রবীণকে দেখে যে-কেউ শ্রদ্ধা করবে।

: কিন্তু তুমি এখন কি বলতে চাও?

: বলতে চাই, আপনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। বাংলার বিবেক সুলভ অকপট বাকভঙ্গি আপনার গ্রন্থে নেই ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছিলেন আবুল ফজল । দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নিচের দিকে । সহসা অশ্রুছলছল চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। ভাঙা গলায় বলেছিলেন : আমি কিভাবে কি লিখেছি, তোমরা তা-ই দেখলে? অথচ দেখলে না, ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাকাণ্ড ! শিশুপুত্র, নববধূ সবাইকে হত্যা করা হলো। কারবালার ঘটনাও এতোটা ভয়াবহ নয়। সেটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। আর এটা ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবুল ফজলের চিঠি হাতে নিতে নিতেই বলেছিলেন : আপনি চট্টগ্রামের বান্ধবী তো! আপনার পত্রিকা কি এখন বের হয়? আমি জেলখানায় বসে পড়তাম। আমার ওয়াইফ পাঠিয়ে দিতেন। আপনি তো ডাকে পাঠাতেন নিয়মিত ।

মাসিক বান্ধবীতে শেখ মুজিবুর রহমান আলফালফা ইনস্যুরেন্স-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কয়েক সংখ্যায়। নিজের টেলিফোনে বেগম মুশতারী শফীকে চট্টগ্রামের বাসায় লাইন মিলিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ সালের কথা। তারপর এতো বিপর্যয়ের পরেও ঠিকই তিনি চিনেছিলেন বান্ধবী-সম্পাদিকাকে। চিঠিতে আবুল ফজল একটি প্রেসের জন্যে লিখেছিলেন। একটি প্রেসের ব্যবস্থা হলে 'বান্ধবী' আবার পুন:প্রকাশের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিঠিটি পড়েছিলেন বঙ্গবন্ধু । বলেছিলেন : স্যারকে আমার সালাম বলবেন। আমি চিঠির উত্তর লিখবো। আর দেখি, কি করতে পারি!

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বেগম মুশতারী শফীর বাসায় এসেছিলেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি। তাঁকে বলা হয়েছিল মহিলা আওয়ামী লীগে যোগ দিতে । তাহলেই তাঁর বিধ্বস্ত প্রেসের বদলে প্রেস পাবেন তিনি। পাবেন যাবতীয় সুযোগ- সুবিধা ।

উত্তরে বেগম মুশতারী শফী বলেছিলেন : আমার স্বামী আমাকে রাজনীতি করার উপদেশ কোনো দিন দেননি। উৎসাহ দিতেন কিছু সাহিত্যচর্চায়। আর এখন তো আমাকে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। ইত্যাদি ।

পরে আর কেউ যোগাযোগ করেননি ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূতিকাগার 'মুশতারী লজ'। দেশে ফেরার পর দ্বিতল ঘরটির শুধু চারদেয়ালের কাঠামো দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। দরজা-জানালা সব ভাঙা । বৈদ্যুতিক ফিটিংস ছিন্নভিন্ন। বাথরুমের কমোড বেসিন উপড়ানো। মেঝেতে কৃত্রিম ফাটল । লোহা দিয়ে ঠুকে ঠুকে প্লাস্টার খসানো হয়েছিল যেন।

থানার লোকেরা এসেছিলেন জানতে, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে কি না। বলা হয়েছিল : অভিযোগ কার বিরুদ্ধে করা হবে ? অভিযোগ করে কি আমার স্বামী আর ভাইকে ফিরে পাবো? শুধু বলতে পারি, যাদেরকে একদিন আমার স্বামী দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁরাই আমাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন সামরিক বাহিনীর কাছে ।

: বেশ তো, তাঁদের নামগুলো বলুন ।

: সব নাম তো পড়তে পারিনি। প্রথম নামটি ছিল ডাক্তার মালাম-এ-গফুরের। ঐ তো আমাদের সামনেই বাটালি রোডে চেম্বার । মকবুল সদাগর সাহেবের ঘরের ভাড়াটে। ওঁর সঙ্গে আমাদের ভালো পরিচয়ই হয়নি। নতুন এসেছিলেন এখানে ।

ঐটুকু জবানিতেই অ্যারেস্ট করা হয়েছিল ড. মালাম-এ-গফুরকে। প্রতিক্রিয়া হয়েছিল চমৎকার। বিবিধ মহল থেকে অনুরোধ এসেছিল অভিযোগটুকু প্রত্যাহারের জন্যে। বিনিময়ে ড. মালাম-এ-গফুর ক্ষতিপূরণ দেবেন। অভিযোগ কিসের? যেচে তো কোনো অভিযোগ করা হয়নি। আর, কী ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে? হারিয়ে-যাওয়া মানুষগুলোকে ফিরে যাওয়া যাবে?

সুপারিশ করেছিলেন মন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরীও। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আমার উপস্থিতিতেই বলেছিলেন বেগম মুশতারী শফীকে : ভাবী, আপনি একটু লিখে দিন যে ডাক্তার মালাম-এ-গফুরের ব্যাপরে আপনার কোনো অভিযোগ নেই। আপনাকে এক লক্ষ টাকা দেয়া হবে ।

এবারে সত্যি সত্যি ক্ষেপেছিলেন বেগম মুশতারী শফী। বলেছিলেন : আমি তো মাত্র এক লক্ষ টাকা পাবো। আর আপনি কতো লক্ষ টাকা পাবেন এ জন্যে? আপনার মাধ্যমেই বলে দিচ্ছি, এ বিষয়ে আর যদি কেউ আমাকে বলতে চায়, আমার কাছে ভদ্র ব্যবহার পাবে না।

পরে মালাম-এ-গফুরকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। মুক্তি পেয়েই তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মুশতারী লজ-এ আস্তানা গেড়েছিল বদর বাহিনীর যুবকরা। তাদেরই নেতৃস্থানীয় একজন ছিল আমার নিকটাত্মীয় একজন কলেজের ছাত্র। এক পর্যায়ে নিজেকে সে ড. মোহাম্মদ শফীর একমাত্র ওয়ারিশ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। মকবুল আহমদ সওদাগরের কাছ থেকে জরিপের দাগ নম্বর জেনে নিয়েছিল। বাড়িটি নিজের নামে রেজিস্ট্রি করার উদ্যোগ নিয়েছিল । ১৬ ডিসেম্বরের পর পালিয়েছিল । তারই এক সহোদর ছিল মুক্তিযোদ্ধা। জসীমউদ্দীন হায়দার। তার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। অচিরেই যোগদান করেছিল শেখ ফজলুল হক মণির যুবলীগে ।

বেগম মুশতারী শফীকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ছোট বোন ইসমত করিমের বাসায় । সাতজন ছেলে মেয়ে নিয়ে। সঞ্চিত কোনো টাকাকড়ি ছিল না। আনুকূল্য দিয়েছিলেন মন্ত্রী এম আর সিদ্দিকী। তাঁরই সুপারিশে চট্টগ্রামের পূবালী ব্যাংক থেকে বিশেষ ঋণ পাওয়া গিয়েছিল ১৫ হাজার টাকা। আমি গ্যারান্টার হয়েছিলাম। সেই টাকায় ঘর মেরামত করা হয়েছিল। নিজের ঘরে উঠে এসেছিলেন বেগম মুশতারী শফী ।

১৯৭৩ সালে মুশতারী লজে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল মনোজ বসুকে। কলকাতা থেকে এসেছিলেন বেড়াতে ।

ডিসেম্বর '৭১-এর শেষ সপ্তাহে দেখা হয়েছিল মনোজ বসুর সঙ্গে। কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন অফিসে। দেখেই পকেট হাতড়ে একটি চিঠি বের করেছিলেন। বলেছিলেন : এই যে, দেখ দেখি, তোমাদের জসীম আমাকে চিঠি লিখেছে। আজই পেলাম। ওর কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লেখাটা একটু পড়ে দাও দেখি । আমি চেষ্টা করে কিছুটুকু পড়েছি ।

কবি জসীমউদ্দীনের পত্রের প্রথম বাক্যটি ছিল : ‘দেশ রাহুমুক্ত হবার পর এই প্রথম চিঠি তোমাকেই লিখছি।'

সেদিন মনোজ বসু বলেছিলেন : আচ্ছা, তোমাদের একটি মেয়ে রোশেনারা বুকে মাইন বেঁধে পাকিস্তানি ট্যাঙ্কের তলায় আত্মাহুতি দিয়ে ট্যাঙ্কটি উড়িয়ে দিয়েছিল। তা-ই নিয়ে এখানে 'রোশেনারা দিবস' উদযাপন হলো পর্যন্ত । ওটা নাকি নিতান্তই 'মিথ্'? তবে ঐ গপ্পোটা যে-ই রটাক, খুব কাজ দিয়েছে। কি বলো হে!

রোশেনারার কাহিনীটি প্রচার করেছিলেন এম আর আখতার ।

কলকাতা কৃষ্টি কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রীতি সম্মেলন। এপার বাংলা ও ওপর বাংলার সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের। স্থান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল । তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্যতম বক্তা ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। পাঁচ মিনিট সময় বরাদ্দ ছিল। সুন্দর স্বচ্ছন্দ বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের দর্শক- শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কে এই বক্তা?

অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামের লালদীঘির ময়দানেও বক্তৃতা দিতে উঠেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। বুদ্ধিজীবীদের আহূত গণসমাবেশে ১৯৭১-এর ১৫ মার্চ তারিখে । সৈয়দ আলী আহসান একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন : 'আমরা ফুল চেয়েছিলাম, ফুল পাইনি ।'

অমনি দশদিক থেকে আপত্তি উঠেছিল। আইউব খানের বই 'Friends Not Masters'-এর অনুবাদককে বসে পড়তে হয়েছিল । শতকণ্ঠে স্বত:স্ফূর্ত বিরূপ মন্তব্যের তোড়ে।

কলকাতা কৃষ্টি কেন্দ্রের প্রীতি-সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বক্তারা সমস্বরে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চাকে। সম্মেলনের অনুপ্রেরণায় আমি একটি প্রবন্ধ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলাম। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। শিরোনামও দেয়া হয়নি। প্রবন্ধে কলকাতা ও মুজিবনগর ভিন্নস্থান হিসেবে নির্দেশিত। অসমাপ্ত প্রবন্ধটি ছিল:

বাংলাদেশের রক্তবীজ মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জোয়ানরা যখন বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার সর্বাত্মক যুদ্ধে নিয়োজিত এবং প্রতিদিনই এলাকার পর এলাকায় চূড়ান্ত বিজয় সূচিত করে চলেছে, ঠিক এ সময়ে অহরহ আমাদের মুক্তাঞ্চলগুলোর স্বঙ্গে সহজ সচ্ছন্দ

যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের । দীর্ঘ দুই যুগ পরে দুই বাংলার মানুষের মধ্যে নতুন করে শুরু হয়েছে ভাবের আদান-প্রদান । আর এই সুযোগে আমরা উভয় বাংলার মানুষ সবার আগে যা উপলব্ধি করছি, তা হচ্ছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বা রাষ্ট্রীয় কারণে একটি একই ভাষাভাষী মানবসমাজ বা একই জলবায়ুর ভূ-খণ্ডকে যতোই দ্বিখণ্ডিত করা যাক-না-কেন, এক মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে নাড়ির টান চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকে। যদিও তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাবে একদা আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে একটি পরিকল্পিত শোষণযন্ত্রের হাতির খোরাক হতে হয়েছিল, তবু সে দীর্ঘসূত্রী বন্দিত্বদশা বাংলার মানুষের জাতিসত্তাকে কিছুমাত্র পারেনি বিকৃত করতে। বরং বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি থেকে বাংলাদেশের মানুষ অনবরত আপন অস্তিত্বকে আবিষ্কার এবং নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ও আদর্শের অনুশীলন করার অবকাশ নির্মাণ করেছে। এটা অনেকটা জলপ্রপাতের সৃষ্টির মতো— জলস্রোত গতিপথে বাধা পেয়ে ফুলে ফুলে উঠলো এবং বাধা ডিঙিয়ে খরস্রোতা হলো। আমরা বেশি বাধা পেয়েছি এবং বেশি আন্দোলন করেছি। আর এভাবেই আমাদের ভাষাকে, সঙ্গীতকে, সংস্কৃতিকে বিকাশোন্মুখ করেছি।

এই বক্তব্যের স্বপক্ষে মুজিবনগর সফরে আগত একজন কলিকাতার সাহিত্যিকের উক্তি হচ্ছে : সত্যি, আপনারা ভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্যে কারাবরণ করেছেন । ভাষা-শিল্প-সংস্কৃতি-তথা জাতীয়তার জন্যে এতোটা করার সুযোগ সত্যি আমাদের হয়নি। (২০-৯-৭১)

একদিন পদ্মপুকুর লেন-এ গিয়েছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামের বাসভবনে। কিছু সন্দেশ এবং সবাই হাতে হাতে ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম। কবি হাত বাড়িয়ে ফুল নিয়েছিলেন। নিয়ে পাশে বিছানার ওপর রেখে দিয়েছিলেন। মালা পরাবার জন্যে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। বড়ো বড়ো চোখ। অনবরত কথা বলতে চাওয়ার মতো ঠোঁটের কম্পন ।

বেরিয়ে আসার সময় পেছন ফিরেছিলাম। নিজের হাতেই কবিকে গলা থেকে ফুলের মালাটি খুলে নিতে দেখেছিলাম।

জয়ন্তী সেনের ঠিকানা জানা ছিল। 'বসুমতী'র মহিলা প্রকাশনার সম্পাদিকা, ডাকযোগে মাসিক 'বান্ধবী'-তে কবিতা পাঠাতেন। আমরা মর্যাদা সহকারে পত্রস্থ করতাম। জয়ন্তী সেনের খোঁজ করতে গিয়ে পাশের বাড়ির ঠিকানাটি জানা গিয়েছিল। তাঁর বিধমা মা শ্রীমতি গৌরী সেনের। গৃহভৃত্যের হাতে

একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন তিনি। বেগম মুশতারী শফীসহ তাঁর বাড়িতে যাবার জন্যে। অক্টোবর '৭১-এর প্রথম সপ্তাহে। লিখেছিলেন : 'আশা করি আপনাদের আমার বাড়ি আসতে অসুবিধা হবে না । আপনাদের ওখান থেকে দুইটা বাড়ির পরই আমাদের বাড়ি।'

জয়ন্তী সেনও ছিলেন মায়ের বাড়িতে। শ্রীমতি গৌরী সেনকে আমরা 'মাসীমা' ডাকতে শুরু করেছিলাম। তাঁর পুত্রবধূকে 'নন্দা বৌদি'। তাঁরা আমাদেরকে দু'বেলা নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন ।

১৯৭২ সালের শেষভাগে শ্রীমতি গৌরী সেন বাংলাদেশে এসেছিলেন। চট্টগ্রামে এসেছিলেন ৬ ঘণ্টার জন্যে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চট্টগ্রাম বেতার ভবনে। বলেছিলেন : মুশতারীর বাসা কোথায়? দুপুরে ওর ওখানে আমি খাবো। তুমিও থেকো ।

যতোটা সম্ভব চট্টগ্রাম শহরের এদিক-ওদিক দেখে বেড়িয়েছিলেন তিনি। শেষ দু'ঘণ্টা মুশতারী লজে কাটিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিমানবন্দরে চলে গিয়েছিলেন ।

মুখোমুখি বাড়িটি লেখিকা বিভা সরকারের। মধ্যম বয়সী সুদর্শনা ভদ্রমহিলা । দেখা হয়ে গেলেই ডেকে নিতেন ঘরে। খেতে দিতেন এটা-সেটা । আমাদের নাসীম চৌধুরীকে স্নেহ করতেন পুত্রবৎ। ডেকে পাঠাতেন যখন-তখন। স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীদের মধ্যে নাসীম চৌধুরী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

নভেম্বর '৭১-এর প্রথম সপ্তাহের কথা। এম-এন-এ ইনচার্জ আবদুল মান্নান প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। অধিবেশনের সমাপ্তিতে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি না বাজানোর জন্যে। তার বদলে জাতীয় সঙ্গীত সংযোজনের জন্যে। 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রসঙ্গীতটি বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয় গান। আবদুল মান্নান বলেছিলেন : বঙ্গবন্ধু এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

সহকর্মী শামসুল হুদা চৌধুরী ও আশফাকুর রহমান খানের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হয়নি। আমার একটা ব্যক্তিগত মতামত ছিল। অধিবেশনের সমাপ্তিতে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি প্রচারই অব্যাহত রাখা। সমাপ্তিতে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো বিশ্বজনীন কোনো ব্যাপার নয়। একমাত্র রেডিও পাকিস্তানে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। আকাশবাণীও আগে তাদের জাতীয় সঙ্গীত

প্রচার করতো। সম্প্রতি অনুরূপ প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল ।

আবদুল মান্নানের কথায় একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল। জাতীয় সঙ্গীতের প্রচার প্রবর্তনের জন্যে বন্ধু ও প্রভাবশীল মহল থেকে চাপ এসেছিল। এ ছাড়া তিনি বলেই ফেলেছিলেন : 'জয় বাংলা' গানটির শেষ অংশে একটা কথা আছে, 'ভুখা আর বেকারের মিছিল'— এটা এখন প্রচার না করাই ভালো ।

সে গানটির প্রচার সম্পূর্ণ রহিত হয়েছিল। এবং স্বভাবত 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে বাজানোও বন্ধ হয়েছিল নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সঙ্গীতের ওপর আমি কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। সিলেটের সাপ্তাহিক 'দেশ-বার্তা'য় প্রকাশিত হয়েছিল আমার নিবন্ধটি। পরে 'ঢাকা ডাইজেস্ট'-এ সঙ্কলিত হয়েছিল। শিরোনাম 'অনুষঙ্গ : জাতীয় সঙ্গীত'। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে সভা ডেকেছিলেন কবি দিলওয়ার। আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন । সিলেট শহরের ভার্থখলার একটি হোটেলের হলঘর। সীমিত বোদ্ধা ব্যক্তিদের সমাবেশ। তখন জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত পাল্টানো হবে বলে রটনা ছিল। তারই সূত্র ধরে বক্তারা বিষোদ্গার করেছিলেন। 'পতাকা' ও 'সঙ্গীত'কে বর্ণনা করেছিলেন 'আমাদের ঐতিহ্য' বলে। আমার ভাষণে আমি ঐতিহ্যের অন্যতর ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম । আমাদের আদিবৃত্তি হচ্ছে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি। হা-ভাতের দেশে এক টুকরো কাপড়ের সদ্ব্যবহার হয়, রাস্তার উলঙ্গ বালকটির লেংগুট হিসেবে কাজে লাগলেই। সেই মুহূর্তে ভাবাবেগের কারণেই বিপ্লবী অভ্যাগতরা কেউ কেউ কানাকানি করেছিলেন : সরকারি কর্মচারী তো! তাই এমন প্রতিক্রিয়াশীল কথা বলেছেন।— সভাশেষে একজন তরুণ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন : আপনি যে সব কথা বললেন, মনে হয়, আপনি জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীত যারা বদলাতে চায়, তাদের দলে ।

উত্তরে আমি বলেছিলাম : আপনি যা বলছেন, তা নিশ্চয় নয়। তবে আমি কোনো ভাবাবেগের বশীভূত নই। হ্যাঁ, জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য হয়তো আছে। পত্রিকাতে দেখতে পাবেন।

সেই রাতে আমি নিবন্ধটি লিখেছিলাম। নিবন্ধটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা

হচ্ছে : বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত আপন মনে দীর্ঘদিন ধরে আমি লালন করে আসছি। আমার বক্তব্যটি রাজধানী শহরের কোনো জনসংযোগ বা প্রচার মাধ্যমকে আশ্রয় করলেই ভালো ছিল। তবু সূচনায় আমি আমার কর্মব্যপদেশে অধিষ্ঠানলব্ধ নিজের শহর সিলেট থেকেই কথাগুলো উচ্চারণ করছি, অর্থাৎ একটু অনুচ্চ কণ্ঠে ।

কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কার্যত গৃহীত হয় **১৯৭১** সালের নভেম্বরের কোনো এক সময় । এর প্রামাণিকতা এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐ সময়কার প্রোগ্রাম ম্যাটেরিয়েলস্ ফাইলে (দৈনন্দিন অনুষ্ঠান সম্ভার) সন্ধান করা হলে পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করা যাবে, ঐ বেতার কেন্দ্রের প্রতিদিনের অধিবেশনগুলোতে সূচনাকাল থেকে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তিক সিগনেচার টিউন (প্রতীক সুর) হিসেবে যথাক্রমে যে 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গ্রামোফোন রেকর্ডের গানটির 'প্রথম পিঠ' ও 'দ্বিতীয় পিঠ' বাজানো হয়ে আসছিল, নভেম্বর মাসের কোনো একদিন থেকে সহসা তার ব্যতিক্রম সাধিত হয়। তখন থেকে অধিবেশনের সমাপ্তিক প্রতীক সুর হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' জাতীয় সঙ্গীত প্রচার প্রবর্তন করা হয়। বস্তুত গানটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বারবারই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অধিবেশনে সে যাবৎ বেজে আসছিল এবং ঐ দিনটি থেকে এর যত্রতত্র ব্যবহার স্বভাবত সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনার জন্যে কবিগুরু শিলাইদহের গগন হরকরার প্রতি অকপট ঋণ স্বীকার করেছেন যথাস্থানে। গগন হরকরা পাড়ার অন্য সব পত্র-প্রাপকের বাড়ি ঘুরে-ফিরে শেষ করে এসে কবিগুরুর পায়ের কাছে বসতেন এবং এই অনন্য কর্তাঠাকুরকে স্বরচিত বাউল গান শোনাতেন। তাঁর রচিত বা মুখোচ্চারিত একটিমাত্র গান সংরক্ষিত বা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষিত পাওয়া যায় । সেটির কথা এবং সুরের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ঋণী তাঁর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনার জন্য।— উল্লেখ্য, গগন হরকরার বাউল গানটির কথায় 'মরি হায় হায়রে কথাটিও রয়েছে।

কবিগুরুর গানটি মূলত একক কণ্ঠের উপযোগী। গানের ভাষাভঙ্গিতেই তা বুঝতে পারা যায় । বাংলাদেশের গণআন্দোলনের বিকাশলগ্নে গানটির আবেদন

ব্যাপকতর বোধ হওয়ায় এটি সভা-মন্ডপে বা মিছিলে সমবেত কণ্ঠে গীত হতে থাকে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এটি ছিল খুব প্রিয় গান। বস্তুত 'ঢাকা রেকর্ড'-এর পরিবেশনায় সমবেত কণ্ঠে গীত এই গানটিই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার করা হতো। এ কথা যে কোনো সচেতন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সিংহভাগ অনুপ্রেরণা এই গানটিই সেদিন যুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'— গানটি আমাদের মাতৃসঙ্গীত। এই গানের কথাগুলো আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের নির্মল সঞ্জীবনী-রস।

মূলত এই গানটির সুর আর্দ্ররসাত্মক, যার ফলে এটির মানবিক আবেদন দেশ-কাল- পাত্রের অনেক ঊর্ধ্বে। যে-পরিস্থিতিতে আমাদের তদানীন্তন নির্বাসিত সরকারকে (একসাইল গভ:) প্রাথমিকভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বেতার কেন্দ্রের অধিবেশন সমাপ্তিতে প্রচার প্রবর্তনের মাধ্যমে এ গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে অভিহিত করতে হয়, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা টাঙ্গাইলের জনাব আবদুল মান্নানের রয়েছে। তিনি ছিলেন ঐ সময়ে সংগ্রামী সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের এম-এন-এ-ইনচার্জ । উল্লেখ্য, উপমহাদেশের অপর দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় বেতার কেন্দ্রসমূহে প্রাত্যহিক শেষ অধিবেশনের সমাপ্তিতে নিজ নিজ জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করা হয়, আধুনা 'আকাশবাণী' থেকে এই নিয়ম প্রত্যাহৃত। এদিকে এ উপলক্ষে বিকল্পিত (সাবস্টিটিউটেড) 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানের 'দ্বিতীয় পিঠ'-এর কয়েকটি কথা ছিল নিম্নরূপ :

'ভুখা আর বেকারের মিছিলটা যেন ঐ

দিন দিন শুধু বেড়ে যাচ্ছে,

রোদে পুড়ে জলে ভিজে অসহায় হয়ে আজ

ফুটপাথে তারা ঠাঁই পাচ্ছে ।

এই বক্তব্যটি কালক্রমে আত্মদ্রোহের নামান্তর হতে পারে, এ বিষয়েও তৎকালীন নেতৃত্বের মধ্যে বৈদগ্ধ সংক্রমিত হওয়া বিচিত্র ছিল না। অনুরূপ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমলে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন একটি প্রাণস্পর্শী দ্বি-ভাষিক সঙ্গীত ছিল 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ'।

গানটির সুললিত বক্তব্য হচ্ছে :

"জয় বাংলা বলতে মন রে আমার

এখনো কেন ভাবো

আমার হারানো বাংলাকে

আবার তো ফিরে পাবো।'

লক্ষণীয়, কণ্ঠস্বরটি ছিল একজন ভারতীয়ের। ভাবাবেগবশত তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধৃত কথাগুলোর তাৎপর্য সংগ্রামী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিভাত না হলেও, পরবর্তীকালে তা ধরা পড়ে।

নিকট অতীতে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কবিগুরুর 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' সঙ্গীতাংশ-বিশেষ গৃহীত হয়। ঘটনাচক্রে নির্বাচিত কথাগুলোতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নামোল্লেখ ছাড়াও জাতীয়তাবোধের ওপর আলোকপাত বিধৃত। তা সত্ত্বেও ভাষা ও স্বরাঘাতমূলক (অ্যাকসেন্ট) সর্বভারতীয় সাম্য (ইউনিফর্মিটি) বিধানের জন্যে খাঁটি বাংলা ভাষার কথাগুলোকে হিন্দির মতো উচ্চারণ করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে প্রচলিত রবীন্দ্র সঙ্গীতটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ অন্যতরো সামঞ্জস্য বিধানের অবকাশ দেখা দেয়। সেটা হচ্ছে, মূল রাবীন্দ্রিক (বাউল গগন হরকরা প্রভাবিত) সুরের মধ্য বীর-রস সঞ্চারণ, যা মি: সমর দাশ সরকার কর্তৃক লন্ডনে প্রেরিত হয়ে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশনের মাধ্যমে সূচিত করেন। কিন্তু একথা সত্য যে গানটির কথায় দেশাত্মবোধের বিপুল অনুপ্রেরণা থাকলেও রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও জনজীবনের কর্ম পরিচিতি এতে অনুপস্থিত এবং সুরের দিক থেকে এটি বাংলা ভাষার অপর একটি চিরায়ত সঙ্গীত ডি-এল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'র চেয়েও স্বল্পতর ব্যঞ্জনাময় । বস্তুত কবিগুরু তো আর গানটি একটা দেশের জাতীয় সঙ্গীত ভেবে নির্মাণ করেননি চমৎকৃত হতে হয় যে, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত স্তবকগুলোও যুবরাজ পঞ্চম জর্জকে ভারত সফরকালে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে রচিত কবিতারই অংশ বিশেষ ।

পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হাফিজ জলন্ধরি রচিত 'পাক সার জমিন সাদবাদ'। এটি প্রবর্তনকালে তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনসমষ্টির বৃহদাংশ বাংলা ভাষী নাগরিকদের মানসিকতার প্রতি ন্যূনতম সম্মানও প্রদর্শন করা হয়নি।

সমকালীন বাঙালি গীতিকারগণও জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচন সম্ভাবনাময় গীতিকথা রচনা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ/পূরব বাংলার শ্যামলিমায়/পঞ্চনদীর তীরে অরুণিমায়/ধূসর সিন্ধু মরুসাহারায় /ঝাণ্ডা জাগে যে আজাদ।' কিংবা 'সকল দেশের চেয়ে পেয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোনো স্থান/পাকিস্তান। দুনিয়াতে আজ জুলমাত ভারী নাইকো ইনসাফ নাই ইমান/কে শোনাবে প্রেমের বাণী করবে কে মুশকিল আসান/ কে মিলাবে আরব আজম হিন্দু শিখ আর মুসলমান/এক কথায় তার সাফ জবাব দাও/পাকিস্তান'।— শেষোক্ত গানটি কবি গোলাম মোস্তফা বিরচিত। প্রথমোক্ত গানটিই কথা ও সুরের নিরিখে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বরিত হবার জন্যে যথোপযুক্ত ছিল বলে আমার ধারণা। যাই হোক, সে প্রসঙ্গ এখন গৌণ। সেদিনের নির্বিচার ও হীনমন্যতার প্রতিবিধান ইতোমধ্যে হয়ে গেছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে ।

জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা হবে দেশের অধিক সংখ্যক জনসাধারণের সহজবোধ্য ভাষা, সুর হবে কণ্ঠশিল্পী নির্বিশেষে সর্বজনীন সহজ কণ্ঠদানের উপযোগী এবং সবার ওপরে সৃষ্টিশীল উদাত্ত বীর-রসাত্মক বক্তব্য বাণীবাহক। এর বাকভঙ্গিহবে আত্মসমর্পণের নয়, বরং আত্মবিকাশের। এই আলোকে যে-কোনো ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে মনোসংযোগ করে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পুন:নির্বাচনের কথাটি বিবেচনা করার অবকাশ দেখা দিয়েছে বলে আমি মনে করি ।

আমার মন্তব্যের স্বপক্ষে সর্বশেষ বক্তব্য তথা একটি স্বাভাবিক সত্য এই যে, বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে দেশের নামটিই পূর্ণাঙ্গরূপে নেই, এবং অধিকন্তু এটি বহুশ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিধায় বাংলা ভাষী বৈদেশিক অঞ্চলে স্রেফ 'একটি গান' হিসেবে এর যত্রতত্র ব্যবহার রোধ করা অসম্ভব। নিজে আমি একজন অপকট রবীন্দ্র-ভক্ত এবং নগণ্য মুক্তিযোদ্ধা হয়েও একান্তভাবে জাতির স্বার্থে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করলাম এবং পুনরোল্লেখ্য যে, এই অভিমত সম্পূর্ণরূপে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে প্রকাশ করা হলো ।

ঐ সময়ে ছুটি উপলক্ষে আমি সিলেট থেকে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম। প্রকাশিত নিবন্ধটি আবুল ফজলকে পড়ে শুনিয়েছিলাম । শুনে আবুল ফজল বলেছিলেন : কিন্তু এর বদলে কোনো গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত করা হবে?

বলেছিলাম : বদলানো তো চাট্টিখানি কথা নয়, স্যার। এখন যারা রবীন্দ্র-বিদ্বেষ থেকে জাতীয় সঙ্গীত বদলাবার কথা ভাবছেন, তাঁরা বরং ভাবনায় পড়বেন আমার প্রবন্ধটি পাঠ করে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন আবুল ফজলের পরিবারের সদস্যরা। আবুল মোমেন বলেছিলেন : আমি ভাবছি, আপনার কাছ থেকে সমর্থনমূলক বক্তব্য পেয়ে ওরা হয়তো জোর পাবে।

সত্যি তাই হয়েছিল। অ-মুক্তিযোদ্ধা মহল থেকে এসেছিল বিপুল সাধুবাদ। শুধু কেবল একজন— সিলেটের সাংবাদিক ইসহাক কাজল আমাকে কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে ভাবাবেগ থাকলেও তা ছিল অকপট। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। নিজের আগ্রহে ইসহাক কাজলের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম ।

১৯৮১ সালে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা নিয়ে পত্রপত্রিকায় অবাঞ্ছিত ও অভিনব লেখালেখি শুরু হয়েছিল। তখন ইসহাক কাজল মফস্বল শহর সিলেটে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সাপ্তাহিক খবর-এর জন্যে তিনি আমার সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালের ৯ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

('সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমরা স্বাধীনতা বলতে বুঝতাম বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু বলতে স্বাধীনতা'। একাত্তরের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্যোক্তা-সংগঠক কবি বেলাল মোহাম্মদ এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকালে তিনি বলেন, নতুন কথা কিছুই তো বলার নেই । কেননা বিভিন্ন নিবন্ধে গত দশ বছর যাবত তিনি নিজের বক্তব্য প্রকাশ করে এসেছেন। এ ছাড়া তিনি একাধিকবার বলেছেন, তিনি নিরপেক্ষ লোক । কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ বা দুর্বলতা নেই। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সত্য প্রকাশে তাঁর কোনোরূপ দ্বিধা নেই। বেলাল মোহাম্মদ একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থসহ ১০/১২টি বই প্রকাশিত হয়েছে। 'সামনে আছে মুক্তিযুদ্ধ' নামে পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় প্রচারবিমুখ এই কবি সিলেটের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে জড়িত। অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী কবি বেলাল মোহাম্মদ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি অকুতোভয় ও স্পষ্টভাষী বলেও সমধিক পরিচিত। তিনি বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশ সিলেট কেন্দ্রে সহকারী আঞ্চলিক

পরিচালকরূপে কর্মরত আছেন। বর্তমানে স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং যেসব বক্তব্য রাখা হচ্ছে, তা পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, ইতিহাসে যার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। দশ বৎসর পর এ ব্যাপারে তাঁর খোঁজ নিয়ে সাক্ষাৎকার নেবার আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি এই প্রতিনিধি ও খবর কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানান। সর্বশেষ তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নগণ্য কর্মী হয়ে যা দেখেছি তাই বলেছি, কোনো ছলচাতুরির আশ্রয় নিইনি।'— ইসহাক কাজল)

প্রশ্ন : স্বাধীনতার ঘোষক কে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মেজর জিয়া, না এম এ হান্নান?

উত্তর : ঘোষক বলতে যদি বেতারের ঘোষণকারী বোঝায়, তাহলে অবশ্যই প্রথম ঘোষক জনাব এম এ হান্নান এবং দ্বিতীয় ঘোষকও তিনি। মেজর জিয়ার ঘোষণাটি ছিল তৃতীয়। এ ছাড়া সর্বক্ষেত্রেই এসব ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ও কথায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। অন্য সবাই ছিলাম আমরা কর্মী ।

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলা বেতারের সংগঠকদের নাম বলুন ।

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই, বরাবরই আমি যা বলে থাকি— মুক্তিযুদ্ধের যে-কোনো কর্মকাণ্ডে একক কৃতিত্বের দাবিদার আমরা কেউ নই। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর প্রভাবেই। পরবর্তী সময়ে সেই চেতনাকে সম্বল করে আমরা স্বত:স্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ভূমিকায় ব্রতী হয়েছিলাম। বেতার কেন্দ্রকে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারকাজে নিয়োজিত করার চিন্তা-ভাবনা হয়তো অনেকের মনেই আসতে পারে । তবে ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রে আমি অগ্রণী হতে পেরেছিলাম, আমার হাতেই সংগঠিত হয়েছিল দশজনের একটি ক্ষুদ্রে টিম। ....

প্রশ্ন : তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে কাদের সাথে আপনার পরিচয় ছিল?

উত্তর : আগেই বলেছি, মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী ও জনাব এম আর সিদ্দিকীর আমি বিশেষ স্নেহভাজন। এ ছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের অধীনে আমি দৈনিক আজাদে কিছুকাল চাকরি করেছিলাম। ১৯৬৪ সালের

গোড়ার দিকে। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী (প্রাক্তন মন্ত্রী) আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ।

প্রশ্ন : মেজর জিয়া কখন কিভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আসেন? উত্তর: পটিয়া থেকে আমি তাঁকে কালুরঘাটে ডেকে এনেছিলাম ।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন, মেজর জিয়ার চট্টগ্রামের ঘোষণা না হলে দেশ স্বাধীন হতো না। এ ব্যাপারে মন্তব্য করুন।

উত্তর : এই বক্তব্য নিত্যন্তই উদ্ভট। বরং বলতে পারেন, মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হলে জাতির ভাগ্যস্রোত কোনো দিকে প্রবাহিত হতো, কেউ বলতে পারেন না। কোনোাাা হানাদার বাহিনী দ্বারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে জনগণ সেদিন দারুণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মেজর জিয়ার ঘোষণার গুরুত্ব এইটুকু যে, একজন সামরিক অফিসারের কণ্ঠে ঘোষণা শুনতে পেয়ে জনগণের মধ্যে মনোবল সঞ্চারিত হয়েছিল। এছাড়া ঐ ঘোষণা না হলেও স্বাধীনতা যুদ্ধ ঠিকই চলতো— দেশও স্বাধীন হতো ।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাই বলবো— সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমরা ‘স্বাধীনতা' বলতে বুঝতাম ‘বঙ্গবন্ধু' এবং ‘বঙ্গবন্ধু' বলতে ‘স্বাধীনতা'। প্রশাসক শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যেভাবেই হোক, মুক্তিযুদ্ধকালীন ভাবমূর্তির নিরিখে সত্যের খাতিতে বলতেই হবে, ১৯৭১-এর প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সন্তান ।

গোড়া থেকেই পি কে কাউল ছিলেন আমাদের সঙ্গে। বালিগঞ্জের বাড়িতে কর্তব্যরত ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর মাধ্যমে সরাসরি আমাদের দাপ্তরিক সুযোগ- সুবিধার কথা বলা যেতো। তিনি ছিলেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর লোক। এম-এন-এ ইনচার্জের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন অহরহ।

নভেম্বর মাসে এসেছিলেন আর এন আচারিয়া। অল ইন্ডিয়া রেডিও-র অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেকটর। সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন আমাদের উপদেশক হিসেবে। হঠাৎ হঠাৎ আমাদের প্রোগ্রাম ম্যাটেরিয়েলস দেখতে চাইতেন। বলতেন : আপনাদের কোনো বক্তব্যের ওপর ইন্টারফিয়ার করছি না। এমনি একটু দেখছি। আমি তো আপনাদেরই একই পেশার লোক ।

একদিন বলেছিলেন : আচ্ছা, মি: বেলাল, আপনারা উদ্বোধনী ঘোষণায় আরবি ভাষায় সালাম কেন বলেন? সমাপ্তিতে 'খোদা হাফেজ' কেন বলেন? শুধু 'জয় বাংলা' বললেই কি চলতে পারে না? আমি কোনো অপত্তি তুলছি না । এমনি শুধু জানতে চাইছি।

উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম : আপনারা, স্যার, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নামের সঙ্গে আজকাল ‘শ্রী' না বলে সচেতনভাবে 'জনাব' বলেন কেন? বরাবরই আকাশবাণী থেকে মুসলিম নামগুলোর উচ্চারণে বিকৃতি লক্ষ্য করতাম আমরা। আজকাল আমাদের নেতাদের নামগুলো বেশ যত্নের সাথে শুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা করা হয় । এই সদিচ্ছা কেন ?

: ভুল উচ্চারণ করা তো ঠিক নয়। সত্যিই ভুল উচ্চারণ শুনতেন নাকি?

: হ্যাঁ, এবং মনে হতো, ইচ্ছে করেই মুসলিম নামগুলোকে বিকৃত করা হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতাদের জন্যে সেটা নি:সন্দেহে অসন্তুষ্টিকর। আর এখন আমাদের জনগণের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

: বেশ বেশ, হয়েছে। আপনাদের 'সালাম' আর ‘খোদা হাফেজ' বলাও ঠিকই আছে।

আর এন আচারিয়া আর একদিন একান্তে একটা বিষয়ে আলাপ করেছিলেন। বলেছিলেন : আচ্ছা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো এখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। কি অবস্থায় আছেন, কি পরিণতি হবে, কিছু তো বলা যায় না ।

চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম : তার মানে? আপনি কি বলতে চান, স্যার!

: না না, ব্যস্ত হবেন না । বলতে চাই, সব সময় খারাপটা ভেবে রাখতে হয় এবং পরবর্তী পরিকল্পনা করতে হয়। নইলে হঠাৎ করে কোনো ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হলে তা পূরণ করা দু:সাধ্য হয় ।

: বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে তেমন কিছু আমরা ভাবতেই চাই না। আমাদের দুর্ভাগ্য, যদি কোনো অঘটন ঘটেই, তাহলে বঙ্গবন্ধুর শূন্যস্থান আর পূরণ হবে না ।

: তবু দেশ তো চালাতে হবে ।

বলেছিলাম : দেশ চালাবেন তাঁর সহকর্মীরা। এখন যেমন নির্বাসিত সরকার

চালাচ্ছেন ।

আর এন আচারিয়া এবার কথার খেই পেয়েছিলেন : আমি সে কথাই বলতে চাইছি। আপনাদের নেতারা অনেকেই তো আছেন । মানে, বঙ্গবন্ধুর সহকর্মীরা। তাঁদের মধ্যে একজনকে তো বেছে নিতে হবে নেতা হিসেবে ।

: তাঁরা তো যাঁর যাঁর দায়িত্বে আছেনই। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী—

: প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কথাই বলছি। নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পরে নিশ্চয়ই যোগ্যতম। আপনারা এখন থেকে তাঁর ইমেজ গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। এটা অবশ্য আমার একটা নগণ্য পরামর্শ ।

আর এন আচারিয়া একদিন সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্প করেছিলেন । সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্য-খ্যাতি তখন তুঙ্গে। হঠাৎ তিনি গৃহীত হয়েছিলেন সরকারি চাকরিতে । তাঁকে স্টেশন ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হয়েছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কার্সিয়ং (Kurseong) কেন্দ্রের। স্বভাবত সৈয়দ মুজতবা আলীর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন আর এন আচারিয়া। ৭ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স । স্টেশন ডাইরেক্টরের দাপ্তরিক দায়দায়িত্ব, আর্থিক ক্ষমতা, অধীনস্তদের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি ছিল প্রশিক্ষণের বিষয়। আর এন আচারিয়া প্রতীক্ষায় ছিলেন। যথাসময়ে এসেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী । বলেছিলেন : এই যে, তুমিই তো আচারিয়া। আমার প্রশিক্ষক। ভালোই জমবে তোমার সঙ্গে, তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি। এসো, গল্প করা যাক।

আর এন আচারিয়া বলেছিলেন : জানেন, সেই ৭ দিন শুধু সৈয়দ সাহেবের গপ্পো শুনেছি। তিনিই ছিলেন বক্তা। আমি মুগ্ধ শ্রোতা ।

১৯৭১ সালে আর এন আচারিয়া ঢাকায় এসেছিলেন। উপদেশর হিসেবে আসীন ছিলেন কিছুদিন । ঢাকা বেতার ভবনের একটি কক্ষে ।

আমাদের মধ্যেও কিছু ব্যক্তিত্বের লড়াই সূচিত হয়েছিল। সেটা আভ্যন্তরিক। সার্বক্ষণিক কর্মীদের নিরাপত্তা-কার্ডে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী। আপত্তি তুলেছিলেন আমিনুর রহমান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্মী তিনি আমাকেই সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন এজন্যে। বলেছিলেন : আপনি কি জানতেন না, নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রকৌশল বিভাগের?

অনুষ্ঠান বিভাগের অফিসার কেন কার্ডে স্বাক্ষর করবেন?

পরে সব কার্ড সৈয়দ আবদুস শাকেরের স্বাক্ষরযোগে ইস্যু করা হয়েছিল।

একদিন সৈয়দ আবদুশ শাকের রেকর্ডিং সরঞ্জামের ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন তথ্য সচিব আনোয়ারুল হক খানের সঙ্গে। সচিব বলেছিলেন : আপনি লিখিত প্রস্তাব দিন। চৌধুরী সাহেবের (শামসুল হুদা চৌধুরী) মাধ্যমে নোটটা দেবেন আমাকে ।

: তা কেন, স্যার? আমি হচ্ছি রেডিও ইঞ্জিনিয়ার। প্রোগ্রাম অর্গানাইজারের মাধ্যমে কেন আমাকে আপনার কাছে যেতে হবে?

সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারুল হক খান বলেছিলেন : বেশ তো, আপনি সরাসরি নোটটি আমাকে দেবেন ।

সেই বৈঠক থেকে উঠে গিয়ে আমি ও সৈয়দ আবদুশ শাকের একান্তে আলাপ করেছিলাম । সৈয়দ আবদুশ শাকের বলেছিলেন : আপনি বেতারে দীর্ঘদিন ধরে আছেন । অফিসার র‍্যাঙ্কে চাকরি না করলেও প্রোগ্রাম, ইঞ্জিনিয়ারিং আর নিউজ সেকশনের মধ্যে ক্ল্যাশ সম্পর্কে নিশ্চয় জানেন ।

বলেছিলাম : এখন এসব প্রসঙ্গ কেন তুলছেন? এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা টিম ওয়ার্ক করছি।

: টিম ওয়ার্কের স্পিরিট নিয়েই বলবো, একজন পি-ও কে ইনচার্জ হিসেবে মেনে নেয়া সম্ভব নয় । হ্যাঁ, আপনি যদি ইনচার্জ হন, আমার কোনো মর্মপীড়া হবে না । তবে পি-ও হিসেবে নয়, আমাদের ‘বেলাল ভাই' হিসেবে।

অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছিল সেট-আপ নিয়েও। কর্মীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং দায়-দায়িত্ব সবার মধ্যে বণ্টনের ফলে কাজের চাপ কমেছিল কারো কারো। নিযুক্তি হিসেবে শামসুল হুদা চৌধুরী ছিলেন সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার। তিনি প্রশাসনের দায়িত্বেও ছিলেন গোড়া থেকেই। তবু পদের নাম সহযোগে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল । দুটি প্যানেলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল । অতি উৎসাহী সহকর্মীরা তৈরি করেছিলেন। একটিতে টিম-এর প্রধান হিসেবে আমার নাম ছিল। অন্যটিতে আশফাকুর রহমান খানের ।

আমিনুর রহমান উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : কিসের স্ট্রাকচার? আমরা কি

এসবের জন্যে এখানে আছি? এখানে টীম ওয়ার্ক চলবে। যেমন চলে আসছে প্রথম থেকেই ।

জল্পনা-কল্পনাটি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

কলকাতা শহরে বসবাসের পক্ষে আমাদের বেতন ছিল অত্যন্ত সীমিত । পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যয়ের বহর চোখে পড়তো। আমরা ছিলাম সার্বক্ষণিক কর্মী । বাড়তি আয়ের কোনো সংস্থান ছিল না। বেতনবৃদ্ধির জন্যে একটা স্বত:স্ফূর্ত দাবি উঠেছিল। অত্যন্ত নম্রভাবে। ফলোদয় হয়নি। সেজন্যে কেউ অসন্তুষ্টও হননি। কেননা বেতারকর্মীরা সবাই ছিলেন স্থান-কাল-পাত্র সচেতন। নিজেদের দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান। প্রায় প্রত্যেকেই সীমান্ত পারাপারের সময় কায়ক্লেশ ও উপবাসের দীক্ষা নিয়েছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কর্মচারীদেরকে দেশে ফেরার পর ৯ মাসের বকেয়া বেতন দেয়া হয়েছিল। সবাইকে একটি ছক পূরণ করতে হয়েছিল। ওতে মুজিবনগরের প্রাপ্ত টাকাকড়ির পরিমাণ উল্লেখের জন্যে একটা ‘ঘর’ ছিল। সে টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বকেয়া হিসেবে দেয়া হবে। প্রতিষ্ঠাতা-দলের দশজনের মধ্যে আমরা আটজন ছিলাম সরকারি কর্মচারী । আমাদের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ১ জুন ১৯৭১- এ নিয়মতান্ত্রিক নিযুক্তির আগেও আমরা আগরতলায় কাপড় ক্রয়ের জন্যে যে-টাকা পেয়েছিলাম, হিসাবে তা-ও ধরে দেয়া হয়েছিল। ফলে বকেয়া প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল যৎসামান্য। শুধু আমাদের দু'জনের— আমার ও সৈয়দ আবদুশ শাকেরের। অন্যান্যদের কোনো পাওনাই দাঁড়ায়নি ।

ঢাকা থেকে রেজাউল করিম চৌধুরী গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। বলেছিলেন : সবাই ৯ মাসের বেতন ড্র করে নিলেন । আর আপনার কথায় আমরা মুজিবনগরের টাকা মাইনাস করে কিছুই পেলাম না। এদিকে আমার আর শারফুজ্জামানের উল্টো দেনা হয়েছে সরকারের কাছে কয়েকশ' টাকা করে ।

আগ্রাবাদ বেতার ভবনে আমার কক্ষে একজন অভ্যাগত ছিলেন। সমস্ত বিষয়টি তিনি শুনেছিলেন। বলেছিলেন : ওতে কিছু অসুবিধা হবে না, ভাই! সরকার আপনাদের কাছ থেকে ও-টাকা আদায় করবে না। ওটা মাফ হয়ে যাবে ।

: মাফ? কি অপরাধ করেছি যে মাফ পেতে হবে?— রেজাউল করিম চৌধুরী উত্যক্ত হয়েছিলেন ।

আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলমের পরামর্শে আমরা অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কাছে আবেদন করেছিলাম পুনর্বিবেচনা করে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বকেয়া টাকাটা প্রদানের জন্যে। মুজিবনগরে পাওয়া যে টাকার হিসাব আমরা দিয়েছিলাম, তা না কাটার জন্যে । অর্থ-মন্ত্রণালয় থেকে দু:খ প্রকাশ করা হয়েছিল।

'খোমার মা'-কে উদ্দেশ্য করে স্বরচিত কবিতা প্রচার করেছিলেন সহকর্মীটি এইচ শিকদার। সীমান্ত অতিক্রম করার পর জীবনের ভয় কেটেছিল। তখন উদ্বেগ জন্মেছিল দখলদার কবলিত এলাকায় অবস্থানরত আত্মজনদের জন্যে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞের খবর শোনা যাচ্ছিল। টি এইচ শিকদার ও শহীদুল ইসলাম একটি ব্যক্তিগত পরিকল্পনা নিয়েছিলেন । একবার ঢাকায় ফিরে গিয়ে পরিবার-পরিজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসার। পারাপারের সময় ধরা পড়েছিলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে । ২৫ দিন অকথ্য নির্যাতন ভুগতে হয়েছিল। তাঁদের চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছিল অনেককে। সে সব লাশ সরাবার কাজ করতে হয়েছিল তাঁদেরকে। একসময় ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভাগ্যগুণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় ।

তখন এক অবাঞ্ছিত প্রশ্ন উঠেছিল কর্তৃপক্ষীয় মহলে। দু'জন নিবেদিতপ্রাণ বেতারকর্মী। মে মাসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছিলেন মুজিবনগরে। নিয়ে এসেছিলেন দুর্লভ প্রচারসম্ভার। আর নিত্যান্ত মানবিক ভাবাবেগের কারণেই তাঁরা ঢাকা থেকে ঘুরে আসার চেষ্টা করেছিলেন। পড়েছিলেন বিপাকে। তাও ফিরে আসার পর হয়েছিলেন সন্দেহের পাত্র । প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্সের । অথচ তাঁদের চেহারাতেই বিধৃত ছিল দুর্ভোগের চিহ্ন। স্বভাবত সহকর্মীদের অনেকেই এতে দমে গিয়েছিলেন। সাময়িকভাবে কাজের উৎসাহ হারিয়েছিলেন। সে অবস্থায় একদিন ১১ নভেম্বর অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন মোস্তাফিজুর রহমান ও আমার কাজ বেড়ে গিয়েছিল। লেখা এবং কণ্ঠদান উভয় ভূমিকায় ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বেতার ভাষণ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অথচ প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল গভীর রাত পর্যন্ত। সেদিন অল ইন্ডিয়া রেডিও-র অধিবেশনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। দেশাত্মবোধক গানের মাঝে মাঝে পূর্ব-ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল । কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ

ভাষণ দেবেন । প্রতীক্ষা করুন ।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন : পাকিস্তানকা জনগণকা সাথ হামলোগকা কোই দুশমনি নেহি হ্যায়। আভ জংগকা জবা মে ও- লোগ হামকো গালি দেতে হোঙ্গে । মগর ও-ভি এক দাবে-হুয়ে জনগণ হ্যায় ।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত। সেদিন থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছিল, ‘বাংলাদেশ বেতার ।

এই সময়ে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশ : কয়েকটি তথ্য': নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ, ভারত সরকার সোমবার যেটিকে স্বীকৃতি দিলেন— জনসংখ্যার দিক থেকে তার স্থান বিশ্বে অষ্টম ।

কেবলমাত্র চীন, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রেজিলের জনসংখ্যা ৮ মাসের এই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের (যার ভৌগোলিক সীমা আগে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল) চেয়ে বেশি।

সীমা : উত্তরে ভারত, পশ্চিমে ভারত, পূর্বে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা : সাড়ে সাত কোটি আয়তন : ৫৫১২৬ বর্গমাইল ।

জেলার সংখ্যা : ১৯

মহকুমা : ৫৭

থানা : ৪১৭

গ্রাম : ৬০ হাজার ।

সর্বঋতুতে ব্যবহারের উপযোগী সড়ক : ২৫০০ মাইল । প্রধান নদী : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ইছামতী ইত্যাদি ।

নদীপথ : শীতকালে ৩৫০০ মাইল, বর্ষাকালে ৪৫০০ মাইল । রেললাইন : ১৮০০ মাইল ।

নগর : ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ।

ছোট শহর : ৮০টি (জনসংখ্যা আনুমানিক ৫০ হাজার)।

শহরবাসী : শতকরা ১২.৫। গ্রামে বসবাসকারীর সংখ্যা শতকরা ৮৭.৫ ভাগ। রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদি : কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্যাদি এবং চামড়া

পাটকলের সংখ্যা : ৪২টি, এছাড়া ২০টি নতুন পাটকল নির্মিত হচ্ছে। সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা : শতকরা ২০ ভাগ ।

ভাষা : বাংলা ।

২২ ডিসেম্বর অপরাহ্ণে কলকাতা থেকে নির্বাসিত সরকার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। স্বাগত জানানো হয়েছিল ঢাকা কেন্দ্র থেকে ধারাবিবরণীর মাধ্যমে । ১৬ ডিসেম্বরের পর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শত্রুমুক্ত ঢাকা কেন্দ্র। তারপর পুনরায় চালু করার জন্যে ট্রান্সমিটারের অবস্থা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । অগ্রগামী পর্যবেক্ষক হিসেবে কলকাতা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন সৈয়দ আবদুশ শাকের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দশজন প্রতিষ্ঠাতা কর্মীর একজন ।

ঢাকা কেন্দ্র চালু হবার পরও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা যায়নি কলকাতার কার্যক্রম। ২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত ৫০-কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচার করতে হয়েছিল অনুষ্ঠান। মান ছিল ক্রমনিষ্প্রভ। সেই দশদিন নাম ঘোষণা করা হয়েছিল ‘বাংলাদেশ বেতার, মুজিবনগর।'

ঘটনাচক্রে শেষের দিনগুলোর দায়িত্বে মুজিবনগরে আমাকেই থাকতে হয়েছিল। ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ প্রতিষ্ঠা এবং ২ জানুয়ারি ১৯৭২-এ সমাপ্তি। আমার আদ্যোপান্ত কার্যকাল ।

১৯৭৩-এর বিজয় দিবস সংখ্যা ‘বঙ্গবার্তায় (ঢাকা) আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্মৃতিচারণ। প্রবন্ধের শেষ বাক্য ছিল :

আমার জন্যে আত্মতৃপ্তির প্রচুর অবকাশ রয়েছে এজন্যে যে, স্বত:স্ফূর্ততার মধ্যদিয়ে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আমার উদ্যোগেই হয়েছিল এবং দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া অবধি এই কেন্দ্রের সঙ্গে একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

তথ্য সচিব আনোয়ারুল হক আমাদের জানিয়েছিলেন সামগ্রিক পরিকল্পনা । মন্ত্রিসভাকে ঢাকায় স্বাগত জানানোর মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্র চালু হয়ে যাবে। সে

মুহূর্ত থেকে মুজিবনগরে বেতারের কার্যক্রম শেষ হবে। এটা ছিল প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত/নির্দেশ ।

১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে শরণার্থীদের কলকাতা ত্যাগের হিড়িক পড়েছিল। তখন সকলের দেশে ফেরার পালা। যার যার সুবিধা মতো। বিমানে রেলগাড়িতে বাসে স্টিমারে। আমাদের নৈমিত্তিক কথক শিল্পীরাও একে একে বিদায় নিচ্ছিলেন। শুধু সার্বক্ষণিক বেতারকর্মীরা ২২ ডিসেম্বরের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

সবাইকে দু'মাসের বেতনের সমান টাকা দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তানি দশ টাকার নোট-এ। নোটগুলো পুরাতন ছিল। স্যাঁতসেঁতে পূতিগন্ধি ।

সকালবেলা বিদায় নিয়েছিলেন আশফাকুর রহমান খান, কামাল লোহানী, মুস্তফা আনোয়ার, শহীদুল ইসলাম, শারফুজ্জামান প্রমুখ। অপরাহ্নে ঢাকা কেন্দ্রে কাজে আত্মনিয়োগের জন্যে। বেছে বেছে কিছু পাণ্ডুলিপি এবং গানের টেপ তাঁরা সঙ্গে করে নিয়েছিলেন। প্রয়োজনে প্রচারের জন্যে ।

আশফাকুর রহমান খান আমাকে একটি তারিখওয়ারি তালিকা দিয়েছিলেন। ২৩ ও ২৪ তারিখে ঢাকা প্রত্যাবর্তনকারীদের । প্রতিদিন ৫ জন করে ১০ জনের নাম তালিকা ওতে দমদম বিমান বন্দরে সকাল ৯ টায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল। আর উল্লেখ ছিল, রিজার্ভেশনের জন্যে যেন প্রশাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি কামালউদ্দীন আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ১নং শরৎ চ্যাটার্জী এভেন্যুতে ।

২২ ডিসেম্বর দুপুরের অধিবেশনের টেপ সরবরাহ করা হয়েছিল সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে । তারপর আর আমাদের কোনো কাজ ছিল না । শুধু বেলা ৩ টায় ঢাকা কেন্দ্র টিউন করার জন্যে প্রতীক্ষা। আমরা টেবিলের কাগজপত্র সরিয়ে নিয়েছিলাম। ডেকে পাঠিয়েছিলেন আর এন আচারিয়া। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পি কে কাউলও। পি কে কাউল আমাকে একটি লিখিত নোট দিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (জনাব কামরুজ্জামান?) এবং নাথবাবুর বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল, ২৩ ও ২৪ তারিখে যে সব অফিসার ঢাকা যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, পরবর্তী নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন যাত্রা স্থগিত রাখেন। আর এন আচারিযা বলেছিলেন : কি ব্যাপার, মি. বেলাল! আপনারা, দেখতে পাচ্ছি, হাত গুটিয়ে বসে আছেন। কেউ কিছু কাজ করছেন না। মি. কাউল বলছেন, রেকর্ডিং স্টুডিতেও নাকি কেউ নেই। ব্যাপার কি? রাতের

অধিবেশনের ম্যাটিরিয়েলস তৈরি করবেন না?

: কেন, আপনারা জানেন না, রাতের অধিবেশন তো ঢাকা থেকে প্রচার করা হবে । আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ।

অনুযোগের ভঙ্গিতে বলেছিলেন পি কে কাউল : একতরফা নির্দেশ দিলেই হলো? ৫০-কিলোওয়াট চালু করার জন্যে কতো আবেদন নিবেদন করতে হয়েছিল । আর এখন আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ ছাড়াই—

অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরেছিলাম। তখনই ওখানে এসেছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী ও টি এইচ শিকদার। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সকালের ফ্লাইটে ঢাকায় চলে যাবার কথা। বাদবাকি মন্ত্রীরা তখনো কলকাতাতেই ছিলেন। টেলিফোন সেটের কাছে গিয়ে বসেছিলাম। ৪৪৭৯৪৭ নাম্বারে পেয়ে গিয়েছিলাম মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে ।

: স্যার, একটা জরুরি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই ।

ঘুম জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন : কি ব্যাপার, বলুন!

: বিষয়টি গোপনীয়। এজন্যে সাক্ষাতে বলতে চেয়েছিলাম ।

: বলুন-না সংক্ষেপে ।

আমার কথাগুলো শুনেই মন্ত্রী বলেছিলেন : আনোয়ারুল হক উজবুকের মতো নির্দেশ দিয়ে গেছে। বেতার চালাতে হবে ।

: কিন্তু কিছু বাস্তব অসুবিধা আছে। আপনাকে সামানসামনি বলতে চাই। আপনি কতোক্ষণ আছেন ?

: বেশ, আসুন।

শামসুল হুদা চৌধুরী বলেছিলেন : আপনি ও শিকদার সাহেব সি আই টি বিল্ডিং- এ যান। আমি দেখি, প্রধানমন্ত্রী যদি সকালের ফ্লাইটে না গিয়ে থাকেন, দেখে গিয়ে আপনাদের সাথে মিলিত হবো। আসলে কামরুজ্জামান সাহেব হয়তো কিছুই সঠিক নির্দেশ দেবেন না । তাজউদ্দিন সাহেবের নির্দেশই চূড়ান্ত।

সিআইটি বিল্ডিং-এর রিসেপশনে লোকজনের ভিড় ছিল । আমি ও টি এইচ শিকদার ভিজিটিং কার্ড পূরণ করে দিয়েছিলাম। শামসুল হুদা চৌধুরীর নামও যোগ করে দিয়েছিলাম । সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসেবে । তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা। কখন মন্ত্রীর কাছ থেকে ডাক আসে। তখন সকার ১১টা ।

দুপুর ১২টায় এসেছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী। চোখে-মুখে বিরক্তি। বলেছিলেন : তাজউদ্দিন সাহেব এখনো আছেন। সবাই একই ফ্লাইটে যাবেন।

: কথা হয়েছে আপনার সাথে?

: না। দেখা করতে দেয়া হলো না। এতো করে বললাম, অত্যন্ত জরুরি বিষয়। প্রাইভেট সেক্রেটারির সেই এক কথা, প্রধানমন্ত্রী বারণ করে দিয়েছেন। কারো সাথে দেখা করবেন না। বললাম, আমাকে সেভাবে দেখবেন না। আমি সরকারের বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত একজন অফিসার। আপনি দয়া করে আমার কার্ডটা প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছিয়ে দিন। কোনো লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে দেখা না করেই ফিরে এলাম । চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?

সেই মুহূর্তে বাইরে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন দুই মন্ত্রী। খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এম মনসুর আলী। সোজা লিফটের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন তাঁরা। আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম ।

: স্যার।

লিফটের পাটাতনে উঠে গিয়েই থেমেছিলেন দুই মন্ত্রী। খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেছিলেন : দেখি, এঁরা যেন কি বলতে চান? কি ব্যাপার, বলুন ।

তিনজনেই সংক্ষেপে পরিস্থিতিটি বর্ণনা করেছিলাম। মন্ত্রীদের মুখভাব দেখে মনে হয়েছিল, আমরা তাঁদের সম্পূর্ণ অচেনা । সব শুনে বলেছিলেন : রেডিওর ব্যাপারে আমরা কি বলবো? আমরা কিছু বলতে পারবো না । — বলেই লিফটম্যানকে ইঙ্গিত করেছিলেন লিফ্ট চালু করতে।

লিফট-এর সামনে থেকে সরে এসে আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন একজন সেন্ট্রি এসে আমাদের শাসিয়ে দিয়েছিলেন।

: আপনারা মন্ত্রীদের পথ আগলে বিরক্ত করেন । মন্ত্রীরা আপত্তি করেছেন । এ রকম

আর করবেন না ।

ধৈর্য হারিয়েছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী। বলেছিলেন : আর কি? এবার চলুন। এখানে তো কোনো কাজ নেই ।

বলেছিলাম : আমরা তো কামরুজ্জামান সাহেবকে কার্ড পাঠিয়েছি । শুনে যাই, তিনি কি বলেন ।

: আপনারা থাকুন। আমি চলে যাচ্ছি। কাজ তো করতে হবে গিয়ে। কাউল আর আচারিয়া বাবুর নির্দেশেই আমাদের চলতে হবে। উপায় নেই ।

বাইরের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী। আমি ও টি এইচ শিকদার তাঁকে ধরে রেখেছিলাম । আর তখনই দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে । বাইরে থেকে আগত। লিফটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমাদেরকে দেখেছিলেন । তিনি ঠিকই চিনেছিলেন আমাদের।

: কি ব্যাপার? রেডিওর অফিসাররা এখানে কেন? কিছু বলবেন?

বিরক্ত হয়েই ছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী। বক্তব্য বিষয়ের গোপনীয়তার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। উচ্চকণ্ঠে সমস্ত পরিস্থিতিটি বর্ণনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে । অশেপাশে ছিল সর্বস্তরের লোকজনের ভিড়।

হয়তোবা এই বাকভঙ্গি পছন্দ করেননি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। বলেছিলেন : শেষ মুহূর্তে এই সমস্যার কি সমাধান দেবো আমি? আপনারা সকাল থেকে এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন?

: আপনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। আগে আমরা শুনেছিলাম, আপনি সকালের ফ্লাইটে ঢাকা চলে গেছেন ।

: বাহ্! আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর মুভমেন্টের খবর আপনারা রাখবেন না, সেটা কি আমার দোষ? যা ইচ্ছে, তাই করুন গিয়ে আপনারা। আমি কিছু জানি না।— বলেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ লিফটে উঠে গিয়েছিলেন।

শামসুল হুদা চৌধুরী বলেছিলেন : এবার কি করবেন?

টি এইচ শিকদার উত্তরে বলেছিলেন : কামরুজ্জামান সাহেবের সাথে দেখা করে যাবো। শেষ দেখে যাওয়াই ভালো ।

: প্রধানমন্ত্রীর দায়সারা বক্তব্যের পর আর শেষ দেখার কি আছে? বলেছিলাম : আছে । এবং আপনিও যেতে পারবেন না । তিনজনের নামেই ভিজিটিং কার্ড পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রী অন্তত ডাকেন কিনা, সেটুকু দেখে যেতে দোষ কি?

ডেকেছিলেন, মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান। ঘুম-ঘুম ঘোর-লাগা চোখ-মুখ। ব্রিফকেসটি টেবিলের ওপর রাখা। হাতলে মন্ত্রীর হাত। তিনি তখন বাইরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত । টেলিফোনের আলাপের রেশ ধরে বলেছিলাম : আমাদের অনেকেই চলে গেছেন। বাইরের লেখক শিল্পী কথকরা কেউই এখন থাকবেন না। কেবল কয়েকজন বেতারকর্মী । এছাড়া এখানে আর প্রোগ্রাম করতে হবে না মনে করে আমরা ভালো ভালো গানের টেপ এবং লেখার ফাইল ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

: তবু আপনাদের প্রোগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ।

আমাদের আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে তিনি অপেক্ষমাণ লিফটের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন ।

করিডোরে দাঁড়িয়ে আমরা কয়েকবার লিফটের ওঠা-নামা দেখেছিলাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে নামতে দেখে সালাম বিনিময় করেছিলাম । আমরা যখন সুযোগ পেয়েছিলাম নামবার, নেমে নিচে আশু ঘোষের বাড়ির চত্বরে কোনো লোকজনের ভিড় দেখতে পাইনি । ততোক্ষণে এ বাড়ি মন্ত্রীশূন্য, দর্শকশূন্য ।

“বাংলাদেশ বেতার, মুজিবনগরের দশ দিনের অনুষ্ঠান। এ ছিল অনেকটা আগরতলা শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের অনুষ্ঠানের মতো। সর্ব বিষয় বিশারদের মতো নিজে লিখে নিজে পাঠ করা। এই সময়ে আমি স্বকণ্ঠে কোরান পাঠ করেছিলাম। গীতা ও ত্রিপিটকের রেকর্ডিং সংরক্ষিত ছিল। এছাড়া পাণ্ডুলিপি দেখে স্বকণ্ঠে বাইবেল পাঠ করেছিলাম।

আন্তর্জাতিক ট্রাঙ্ক বুকিং নাম্বার ১৮৬। মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল নাম্বারটি। বারবার ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ‘বাংলাদেশ বেতার, মুজিবনগর কেন্দ্র' বন্ধ করার সরকারি আদেশের জন্যে । আমাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিহিতাদেশের জন্যে । ঢাকার সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা তখন সাধ্যাতীত ।

জলপথে ‘এস এস সাভ্রা' যোগে ট্রাঙ্কভর্তি ফাইলপত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল

ঢাকায় । সেই তিনটি ট্রাঙ্ক ঢাকা বেতার ভবনে রাখা হয়েছিল। শহীদুল ইসলাম "শব্দ সৈনিক (১৯৭২) গ্রন্থের জন্যে লেখা সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে। পরবর্তী সময়ে ট্রান্সক্রিপশন ভবন নির্মাণের পর সেই ভবনে রক্ষিত হয়েছিল ট্রাঙ্ক তিনটি। পরিচালক শহীদুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে ।

১৯৮২ সালে ঢাকায় বদলি হয়ে আসার পর আমাকে নিজস্ব শিল্পী মলয়কুমার গাঙ্গুলী ট্রাঙ্কগুলো দেখিয়েছিলেন। স্টোররূমে রক্ষিত। মলয়কুমার গাঙ্গুলী স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রের একজন কণ্ঠশিল্পী। চোখের সামনে ট্রাঙ্কগুলো দেখে দেখে স্মৃতি- ভারাক্রান্ত ।

বেতারকর্মীদের দ্বিতীয় দলটি স্থলপথে মুর্শিদাবাদ হয়ে রাজশাহী ফিরে এসেছিলেন। সেই দলে ছিলেন শামসুল হুদা চৌধুরী, ম. মামুন, মেজবাহউদ্দীন আহমদ, টি এইচ শিকদার, নজরুল ইসলাম ও আশরাফুল আলমসহ প্রায় ২৫ জন ।

শেষতম দলটি বালিগঞ্জ থেকে যাত্রা করেছিল ২ জানুয়ারি ১৯৭২ রাত ৯ টায়। একটি বাস রিজার্ভ করা হয়েছিল। সেই দলে আমি ছিলাম। ছিলেন বেগম মুশতারী শফী, মাসুদা নবি ও ছেলেমেয়েরা এবং রণেন কুশারী, হরলাল রায় ও কামাল লোহানীর পরিবার। মাধুরী চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অন্যান্যরা ছিলেন। যশোর সীমান্ত (বেনাপোল) পেরিয়ে ফরিদপুর হয়ে গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছেছিল বাস। কথা ছিল স্থানীয় থানার ও-সি বড়ো গোদারা দিয়ে বাসটি পার করে দেবেন। কিন্তু সম্ভব হয়নি। এদিকে বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ ওখান থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন। সমস্যা হয়েছিল নারী ও শিশুদের জন্যে। বাস পিছন ফিরিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফরিদপুর শহরে । জেলা প্রশাসক থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সার্কিট হাউসের তিনটি কক্ষ। কলকাতার বাসটি ওখান থেকে ফেরত গিয়েছিল।

৪ জানুয়ারি সকালবেলা রামকৃষ্ণপুর লঞ্চঘাট দিয়ে আমরা আরিচা পৌঁছেছিলাম সময় দুপুর ১২টা।

দেশে ফেরার পর সংগ্রামী কর্মীগণ নিয়োজিত হয়েছিলেন যার যার কাজে। বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। প্রদর্শন করেছিলেন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। আঞ্চলিক প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুশ শাকের। কবীরপুরে নির্মীয়মান উচ্চশক্তির ট্রান্সমিটারে তাঁর নিরলস ভূমিকা। আঞ্চলিক পরিচালক আশফাকুর

রহমান খান। তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়েছিল খুলনায় নতুন করে নির্মিত বেতার কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় যে-কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। খুলনায় প্রথমদিকে ব্যবহার করা হয়েছিল সেই ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে যেটি আমরা তুলে নিয়েছিলাম। পরিচালক শহীদুল ইসলাম। তাঁর হাতে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস । নির্মিত হয়েছিল ট্রান্সক্রিপশন ভবন । সহকারী পরিচালক শামসুল হুদা চৌধুরী গড়ে তুলেছিলেন বাংলাদেশ বেতারের জনসংখ্যা কার্যক্রম দপ্তর। শূন্য থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম। কামাল লোহানী বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের প্রথম ভারপ্রাপ্ত ও-এস-ডি নিযুক্ত হয়েছিলেন ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওপর আমার স্মৃতিচারণমূলক প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বেতার মুক্তিসংগ্রামে (১)'। ওতে শুধু কালুরঘাট পর্যায়ের কার্যক্রম বিধৃত হয়েছিল । রচিত হয়েছিল ১১-১২-৭২ তারিখে । প্রবন্ধটি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের একটি সঙ্কলনে মুদ্রিত হয়েছিল । এস এম আখতার আলী সম্পাদিত 'সাদা শাপলার গাঁথা' । সেই প্রবন্ধের অংশ বিশেষ মাহবুব-উল-আলম সম্পাদিত 'রক্ত আগুন অশ্রুজল' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল । প্রবন্ধের গৌড়চন্দ্রিকায় লিখেছিলাম :

ইতিহাস দুই কারণে বিকৃত হতে পারে। এক. প্রণেতার স্মৃতি-বিপত্তি— যার কারণ কালবিলম্ব না করে লিপিবদ্ধকরণের পরিবেশের অপ্রতুলতা। দুই. অবস্থাগতিকে বা ব্যক্তিগত দলগত স্বার্থে কোনো তথ্য গোপন বা অব্যক্ত রাখার আবশ্যকতা। এই শেষোক্ত কারণটি অনেক সময় কোনো বক্তব্য বিষয়কে বিকৃত না করলেও সীমাবদ্ধতা দিয়ে ক্ষুণ্ণ করতে পারে বেশ খানিকটা। অনেক কথাই স্মৃতিতে অম্লান হওয়া সত্ত্বেও সর্বমুহূর্তে প্রকাশ করা যায় না। এছাড়া একথা সত্য যে উদ্দেশ্যমূলক তথ্য সমাবেশ বা ইতিকথা নির্মাণের দায়িত্ব কারো ওপর অর্পিত না হলে তার পক্ষে ইতিহাসের রাজনীতি করতে যাওয়ার কোনো কারণই নেই ।

গোড়াতেই সবিনয়ে একটি কথা বলে রাখতে চাই, যে বিষয়ের আমি প্রত্যক্ষ কর্ম- বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে বসেছি, আমার সহকর্মীরা অনেকেই বর্তমান আছেন— যাঁরা এটি পাঠ করবেন এবং আমার ভ্রমের জন্যে বা দৃষ্টি বৈচিত্র্য ও উপলব্ধির বিভ্রম ও অনৈক্যের জন্যে কারো কাছে এখানে বর্ণিত কোনো তথ্যকে

অস্বস্তিকর আপত্তিকর বিবেচিত হলে তা যেন ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির বা অসন্তুষ্টির কারণ না হয়ে দাঁড়ায় । ইত্যাদি ।

১০ জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধু ফিরেছিলেন মুক্ত স্বদেশে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানানো হয়েছিল আকাশবাণী' ও বাংলাদেশ বেতারের ধারা বিবরণীর মাধ্যমে। দুই দেশের বেতার কেন্দ্র এক যোগে একই ঘোষণা প্রচার করেছিল কিছু সময় ।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় ছিলেন না। দেশ-রণাঙ্গনে আমাদের সহযোদ্ধা ছিলেন না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। আমার একটি ক্ষুদে নিবন্ধ ‘পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবন্ধু'। প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক আজাদীতে। ১৪-৬-৭৫ তারিখে। নিবন্ধটি :

কলকাতার জনাকীর্ণ সড়কের স্থানে স্থানে ফুটপাথের এক প্রান্তে একটি বস্ত্রখণ্ড ইটে চাপা দিয়ে পাতা, একধারে ফ্রেমে বাঁধানো আলোকচিত্র, সামনে ধূপকাঠির ধোঁয়া উড়ছে। টাঙ্গাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, পথচারী সবাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে পয়সার স্তূপ নির্মাণ করছেন সেই বস্ত্রখণ্ডে। সেই বস্ত্রখণ্ডে সঞ্চিত পয়সার প্রতি কোনো দুষ্ট ছেলের, কোনো ছিঁচকে চোরের কিংবা ঠগের কিছুমাত্র গ্রাহ্য নেই। সেই কয়েক হাত এলাকাটিতে রামরাজ্য।

এ পয়সা সন্ধ্যার পরে স্বেচ্ছাসেবীরা এসে তুলে নেবেন এবং জমা হবে বাংলাদেশে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ তহবিলে ।

পশ্চিমবঙ্গ এবং আগরতলায় বঙ্গবন্ধুর অসংখ্যা প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয় সড়কের ধারে ধারে এবং এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয় অজস্র টাকাকড়ি। এটা ১৯৭১ সালের প্রতিবেদন, বলাই বাহুল্য ।

সেই অক্টোবর মাসে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব। উৎসব উপলক্ষে ঢাকঢোলের শব্দে মুখরিত মহানগরী। বিগ্রহমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। বাংলাদেশের শরণার্থী সহযোগে এবারে ছিল দর্শনার্থীর সংখ্যাধিক্য। সর্বমণ্ডপেই কোনো একটি শোভন অবস্থানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টাঙানো। এ ছাড়া প্রবেশপথ থেকে প্রতিমা- মঞ্চে যাবার গলির দু'ধারে লেখা আর রেখাচিত্রের বিচিত্র প্রদর্শনী। রেখায় রেখায় কাঁচা বা পাকা হাতে রচিত বঙ্গবন্ধুর ছড়াছড়ি। বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধু। মিছিলের অগ্রভাগে বঙ্গবন্ধু। নৌকার মাস্তুলে বঙ্গবন্ধু। বন্দুক তাক করে যুদ্ধরত বঙ্গবন্ধু । কুস্তিগীর বঙ্গবন্ধু চেপে

বসে আছেন পরাস্ত প্রতিপক্ষ ইয়াহিয়ার বুকের ওপর । গলিপথের দু'ধারে সাজানো চিত্র প্রদর্শনী দেখতে দেখতে প্রতিমার সামনে গিয়ে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই । মা দুর্গার পাশে দণ্ডায়মান কার্তিক কোথায়? কার্তিকের পরিচ্ছদে মৃৎশিল্পীর নিপুণ হাতে বঙ্গবন্ধুর মুখাবয়ব নির্মিত হয়েছে। আর কালীপূজার মঞ্চে খড়্লে অসুরের মুখাবয়ব? সে-মুখ অবিকল ইয়াহিয়া খানের ।

পুজোমণ্ডপের মাইকে নাম সংকীর্তন কিংবা শ্যামাসঙ্গীতের চেয়ে বেশি এবং বারবার বাজানো হয় 'আমার সোনা বাংলা', কিংবা 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি'। এ ছাড়া 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের রেকর্ড।

এপ্রিল মাসে একদিন আগরতলায় এই বজ্রকণ্ঠ রাস্তায় (সম্ভবত কর্নেল চৌমুহনি থেকে রাজবাড়ির দিকে যাবার পথে কোনো স্থানে) ভয়াবহ গাড়ির ভিড় জমিয়ে দিয়েছিল। সেই ভিড় নিকেশ হতে সময় লেগেছিল ঝাড়া দু'ঘণ্টা।

সাদা চাদর-জড়ানো বঙ্গবন্ধুর মূলত পাসপোর্ট সাইজের সুন্দর ছবিটি, আজকাল জাতির জনকের ছবি হিসেবে যেটার ডেভেলপড্ কপি বেশির ভাগ অফিস-আদালতের কক্ষে কক্ষে সংরক্ষিত— ছবিটি জনাব আমিনুল হক বাদশার ব্যক্তিগত এলবাম থেকে প্রাপ্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীযুক্ত দিলীপ চক্রবর্তীর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ১৯৭১ সালের মে-ডিসেম্বর দেওয়াল-ক্যালেন্ডারে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।

১৬ ডিসেম্বর মহানগরী কলকাতার রাজপথ বঙ্গবন্ধুর আলোকসজ্জায় ছেয়ে যায়। বড়ো বড়ো ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ডে রাশি রাশি প্রতিকৃতি। মাল্যভূষিত এবং রংবেরঙের আলোকসজ্জিত । এ পথে সে-পথে গণমিছিলের উল্লাস। সে এক আনন্দঘন শিহরণযুক্ত মুহূর্ত ।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভবনে ভবনে প্রিয়দর্শিনীর পাশে যুদ্ধজয়ী বঙ্গবন্ধুর বিরাট বিরাট প্রতিকৃতি ।

পশ্চিমবঙ্গে কিংবা আগরতলায় এবং ভারতের অন্য যে-কোনো এলাকায় যুদ্ধকালীন বাঙালি শরণার্থীরা বঙ্গবন্ধুর আশিস থেকে ক্ষণকালও ছিল না বঞ্চিত ।

‘একাত্তরের রণাঙ্গন' গ্রন্থে সংযোজনের জন্যে কিছু সমকালীন অভিব্যক্তি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন গ্রন্থকার শামসুল হুদা চৌধুরী। ১৯৮০ সালের শেষ চতুরংশে। লিখে পাঠিয়েছিলাম ‘কোনো কিছুই প্রাপ্য নেই' শীর্ষক এই ক্ষুদে নিবন্ধটি :

আমি বলতে চাই, আমি যদি সত্যি সত্যি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন নগণ্য কর্মী হয়ে থাকি এবং ন'মাসব্যাপী গৃহছাড়া অবস্থায় দখলদার বাহিনীকে উৎখাত করার কাজে যে-কোনোভাবে নিয়োজিত থাকি, তাহলে ১৬ ডিসেম্বর '৭১-এ দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর গৃহ প্রত্যাগত হওয়ামাত্রই আমার ‘সব পেয়েছি-র ঘরে' ফিরে আসা হয়ে গিয়েছিল। দেশের কাছে, জাতির কাছে আমার আর কোনো কিছুই প্রাপ্য নেই। কেননা দেশকে শত্রুমুক্ত করার সাধনা কিছু মুনাফাখোর বৈশ্য সওদাগরবৃত্তি ছিল না। এ ছাড়া, একজন মুক্তিযোদ্ধা কোনো ভিখারী নন যে হাত পেতে কারো কাছ থেকে দান গ্রহণ করবেন। তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি স্বদেশভূমির প্রতি ইঞ্চি মাটি সংগ্রাম করে উদ্ধার করতে হয়েছিল, মুষ্টিভিক্ষা হিসেবে এক মুঠো মাটিও তাঁর হাতে কেউ তুলে দেয়নি।

স্বীকৃতি? কে কাকে স্বীকৃতি দেবে? একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্যে মহত্তম স্বীকৃতিই হচ্ছে একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ-পরিবেশ, যেখানে দখলদার উৎপীড়কদের পদচারণায় সন্ত্রাস নেই। এই স্বদেশভূমির একটি মানচিত্র প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার বুকের পাতে সহজ স্নিগ্ধ আঁকা হয়ে আছে। তার চেয়ে অধিকতর মহিমান্বিত কোনো আনুষ্ঠানিক স্বর্ণপদক হতেই পারে না। স্বর্ণপদক তো তস্করে লুণ্ঠন করতে পারে, স্বর্ণপদক দৈনন্দিন মৌলিক চাহিদা চাল-ডালের দরে অকপটে বেচে দিতে হতে পারে ।

ইতিহাস নির্মাণের ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধার কোনো মাথাব্যথা নেই। ইতিহাসের চরিত্রই হচ্ছে যে, ‘যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ'। মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যাবলী গোয়েবলসীয় ধারায় চিরকালই ‘চোরের মার বড়ো গলা'য় সোচ্চার থাকবে। অন্যদিকে, সত্য ও সমৃদ্ধি স্ব-স্থানে অবস্থানরত ধ্রুবনক্ষত্র হয়ে মিটিমটি জ্বলবে। বিদগ্ধজনদের বিবেচনায়, যে-কোনো ‘ঘটনা’র অন্তত তিন দশক পরে সর্বপ্রকার ভক্তির অতিশয্য, রাজশক্তির ভয়ভীতি ও ব্যক্তিগত আত্মপ্রসাদের অবলুপ্তি হয়ে থাকে, এবং তখন যেসব তথ্য অবিস্মৃত থাকে, তাকেই সত্যাশ্রয়ী বলা যেতে পারে। আজকের কুণ্ঠা ও আড়ষ্টতা কেটে যাবার পর, আগামী দিনের ইতিহাস নির্মাতারা মুক্তিযুদ্ধের সত্য সমৃদ্ধ ধ্রুবনক্ষত্রের আলো ঠিকই প্রত্যক্ষ করবেন।

আমি আরো বলতে চাই— যেহেতু আমি ১৯৭১ সালে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মরণপণ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি, অর্থাৎ অত:পর যদি সমকালীন দেশ-পরিবেশের সত্যিকার মুক্তি এখনো আসেনি বলে আমি উপলব্ধি করি, তাহলে আবার আমাকে নবতর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে । এখন আমি মনে করবো, আমাদের চূড়ান্ত মুক্তির জন্যে আরো যুদ্ধ করতে হবে। 'আমাদের সংগ্রাম চলবে'।

একজন মুক্তিযোদ্ধার সর্বমুহূর্তের ধর্মকর্মই হচ্ছে, জীবন জয়ের জন্যে যুদ্ধরত থাকা । দেশ ও জাতির কাছে তাঁর কিছুই প্রাপ্য নেই, বরং তাঁর কাছেই দেশ ও জাতির দাবি অফুরন্ত । কি পেয়েছি নয়, কি দিয়েছি এবং দেবো, সেই হোক আমাদের কর্তব্যবোধ।

'ও-মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো,

অনেক নিয়েছি মা—

তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা। (১৪-৯-৮০)

শামসুল হুদা চৌধুরী এই নিবন্ধটি তাঁর গ্রন্থে সংযোজিত করেননি। আমার অন্য লেখা পস্ত্রস্থ করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ-এ প্রকাশিত হয়েছিল এই তথ্য বিবরণীটি (নং ১০০৮৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য অবদানের জন্যে ২২ জন শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতার কর্মীর বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক লাভ।

ঢাকা, ২৫শে মার্চ : বাংলাদেশে স্বাধীনতার সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ে উত্তীর্ণ করার জন্যে বেতার মাধ্যমে যেসব শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী এবং বেতারকর্মী তাঁদের সৃষ্টি বা তৎপরতা দ্বারা অসামান্য অবদান রেখেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদেরকে 'স্বর্ণপদক'-এ ভূষিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৮ জন বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতারকর্মী এবং চারজন ভারতীয় শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতারকর্মী সহ ২২ (বাইশ) জনকে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক' দেয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী জনাব তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, জাতীয় সংসদ সদস্য ও পদস্থ কর্মচারী সমন্বয়ে

গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি এদের নির্বাচন করেন।

পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত শিল্পীরা হলেন— বাংলাদেশের সর্বজনাব মরহুম রাজু আহমেদ, মরহুম আলতাফ মাহমুদ, মরহুম সরদার আলাউদ্দীন, বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ আল ফারুক, মুস্তফা আনোয়ার, রেজাউল করিম চৌধুরী, রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, কাজী হাবিবউদ্দীন, শারফুজ্জামান, সৈয়দ আবদুর শাকের, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, এম আর আখতার, আপেল মাহমুদ, শ্রী রথীন্দ্রনাথ রায় ও সমর দাস এবং ভারতের শ্রী দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়, শ্রী গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, শ্রী প্রণবেশ সেন ও শ্রী অংশুমান রায় ।

নির্বাচিত শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী ও বেতার কর্মীরা সবাই বেতার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং এঁদের ভূমিকা দেশবাসীকে প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। (সংক্ষেপিত)

২৬ মার্চ বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের স্থানীয় সংবাদের কভারেজটি ছিল : এদিকে, আজ হচ্ছে চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠারও চতুর্থ বার্ষিকী। হানাদার বাহিনীর আকস্মিক মরণ ছোবলে দেশের সব বেতার কেন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গেলেও এইদিন চট্টগ্রাম বেতারের একদল অকুতোভয় কর্মী ও শিল্পী কালুরঘাটের ট্রান্সমিটিং স্টেশন থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রচার শুরু করেন। এই বেতার থেকেই সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয় ।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় হাসিলের জন্যে বেতার মাধ্যমে যারা তাদের কাজকর্মে ও তৎপরতার অনন্য অবদান রেখেছেন, তার স্বীকৃতি হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের যে ১৮ জন প্রখ্যাত শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বেতার কর্মচারীকে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের ১০ জন কর্মচারী ও শিল্পী রয়েছেন ।

এই পুরস্কারের জন্যে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট এই মনোনীত ব্যক্তিরা হচ্ছেন: জনাব বেলাল মোহাম্মদ, জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, জনাব আবদুল্লাহ আল ফারুক, জনাব মুস্তফা আনোয়ার, সৈয়দ আবদুশ শাকের, জনাব আমিনুর রহমান, জনাব রাশেদুল হোসেন, জনাব রেজাউল করিম

চৌধুরী, কাজী হাবিবউদ্দীন এবং জনাব শরফুজ্জামান ।

আইটেমটি সহকারী বার্তা সম্পাদক নজরুল ইসলামের সৌজন্যে প্রাপ্ত ।

৩১ মার্চ ১৯৭৫ তারিখের দৈনিক আজাদীর সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম 'একটি প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি' :

'বেতার মাধ্যমে যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচণ্ড শক্তি যুগিয়েছিলেন তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হচ্ছে। .... বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পাক-বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের মুখে অসংগঠিত হতচকিত জনগণকে সংগঠিত করে তাদের মনোবল জিইয়ে রেখে দুস্তর সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছিল এই বেতার কেন্দ্রটি । চট্টগ্রাম থেকেই এর সূত্রপাত। পাক বিমান হামলার প্রথম শিকার ছিল এই ট্রান্সমিরটি। সে সময়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে যাঁরা এগিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে জনাব বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ আল ফারুক প্রমুখের নাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নামকরণ, পটিয়া থেকে মেজর জিয়াকে (বর্তমানে মেজর জেনারেল) ডেকে এনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদানের কাজ জীবন বিপন্ন করে জনাব বেলাল মোহাম্মদ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, ইতিহাসে তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলেছে এই পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে। প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে যানবাহনের অভাবে বেলাল মোহাম্মদ প্রমুখকে প্রাণ হাতে নিয়ে চট্টগ্রাম কালুরঘাট হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছিল। কেউ কি জানত সেদিনের সেই অনিশ্চিত পদক্ষেপগুলো আমাদের ইতিহাসকে এক হেঁচকা টানে এগিয়ে নেবে অনেক দূর। তাদেরকে পুরস্কৃত করে সরকার প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এই সুযোগে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিবেদিত প্রাণ কর্মীদেরকে মোবারকবাদ জানাই। সরকারকে ধন্যবাদ জানাই তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি দানের জন্যে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগঠকের কৃতিত্বের দাবি নিয়ে যে টানাহেঁচড়া চলছিল এতে করে তারও অবসান ঘটলো। অবসান ঘটবে নেপোদের দই মারার খেয়োখেয়ির। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া জাতীয় কর্তব্য । স্বীকৃতি না পেলে ত্যাগ ও তিতিক্ষার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আসে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।' (সংক্ষেপিত)

ব্যক্তিগতভাগে আমি ডাকযোগে অভিনন্দন-পত্র পেয়েছিলাম অনেকের কাছ থেকে । বাংলাদেশ বেতার, মহাপরিচালকের পরিদপ্তর, ঢাকা থেকে লিখেছিলেন পরিচালক নূরুন্নবী খান। পত্রে তিনি রাশেদুল হোসেন এবং আমিনুর রহমানের নাম উল্লেখ করেছিলেন। চট্টগ্রাম আলকরণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণপ্রসাদ তালুকদার চিঠি লিখেছিলেন । তিনি আমার চট্টগ্রাম কলেজ জীবনের সতীর্থ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখেছিলেন প্রভাষক দানিউল হক। পত্রে তিনি আবুল কাসেম সন্দ্বীপের নাম উল্লেখ করেছিলেন ।

আমাকে ব্যক্তিগত সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল চট্টগ্রামের তরুণদের সংস্থা সবুজ সাহিত্য আসরের পক্ষ থেকে । সংবর্ধনা-সভায় পৌরহিত্য করেছিলেন বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলম। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন এ বি এম ওসমান গণি, শ্যামল অদুদ, আবদুস সাত্তার, সুখময় চক্রবর্তী ও ফাহমিদা আমিন ।

একটি উষ্ণ সংবর্ধনা পেয়েছিলাম আমরা পাহাড়তলিতে। সেখানকার এক শ্রমিক সমাবেশে। সেই অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ শাহ্ বাঙালিও উপস্থিত ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

দৈনিক আজাদীর স্বত্বাধিকারী এম এ মালেক আয়োজন করেছিলেন এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট-এ। ২৭ এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখে। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম আর সিদ্দিকী। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী। আনুষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল ‘স্বাধীন বাংলা বেতার প্রতিষ্ঠাকারী দলের সংবর্ধনা।' সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, এম এ মালেক, মাহবুব আলম চাষী, সেকান্দর হায়াত খান, ডাক্তার মান্নান, বদরুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ।

সংবর্ধিতদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রেখেছিলাম আমরা তিনজন আমি, সৈয়দ আবদুশ শাকের ও আবুল কাসেম সন্দ্বীপ। আমার ভাষণটি ২৯-৪-৭৫ তারিখের দৈনিক আজাদীতে প্রকাশিত হয়েছিল । হুবহু ভাষণটি ছিল :

সম্মানিত সুধীবৃন্দ, পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি জনাব এম আর সিদ্দিকী, সুজন প্রধান অতিথি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী, কৃতজ্ঞতাভাজন

দৈনিক আজাদী কর্তৃপক্ষ, আজকের এই উদ্যোগের নেপথ্য স্থপতি বন্ধুবর ওবায়দুল হক এবং স্নেহাভাজন আতাউল হাকিম, আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আজকের এই আনুষ্ঠানিকতার জন্যে আমরা আপনাদের কাছে চিরঋণী। এবং শারীরিক অসুস্থ হয়েও স্রেফ আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে আমি আপনাদের সামনে দু-একটি কথা বলতে দাঁড়িয়েছি।

বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদকের জন্যে মনোনীত তথা পুরস্কৃত দশজন বেতারকর্মীকে আপনারা আজ সংবর্ধনা দিচ্ছেন। একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে আমার বিশ্বাস, এই পুরস্কার এবং সংবর্ধনা আমরা অনেক আগেই পেয়ে গেছি। সংগ্রামের বিজয়ই হচ্ছে একজন সংগ্রামী কর্মীর জন্যে প্রকৃত পুরস্কার। আর বিজয়ের ফলে দেশ জনপদে যে স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, একজন কর্মীর জন্যে সেটাই বড়ো সংবর্ধনা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ যে-সংগ্রামের পরম সূচনা, ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় সেই সংগ্রামী কর্মীদের জন্যে প্রকৃত সাফল্য তথা পুরস্কার । আর ঐদিন শত্রুমুক্ত এই দেশ জনপদে যে আনন্দ উল্লাসের জয়ধ্বনি উঠেছে, সেই জয়ধ্বনিই আমাদের জন্যে ছিল প্রাণের সংবর্ধনা ।

অবশ্য কর্মের স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে। কর্মীর জন্যে উৎসাহ এবং পরবর্তীদের জন্যে প্রেরণা এই স্বীকৃতির মাধ্যমে অর্জিত হয়। আমাদের পুরষ্কারপ্রাপ্তি প্রকৃতপক্ষে এদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতি জাতীয় স্বীকৃতিস্বরূপ। বিভিন্ন জটিলতার আবর্তে দীর্ঘকাল উপেক্ষিত এবং অনেকাংশে বিকৃত একটি ঐতিহাসিক সত্য এই পুরষ্কারের মাধ্যমে স্বীকৃত হলো। এই পুরষ্কারের মধ্য দিয়েই বিলম্বে হলেও চট্টগ্রাম যে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার, তা স্বীকৃত হলো। ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত হলো, চট্টগ্রাম থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রচারিত এবং মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রথম আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল। স্বীকৃত হলো, চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধের আনুকূল্য প্রার্থী হয়েছিলেন বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে। স্বীকৃত হলো, মরহুম এম এ হান্নানের কর্মচাঞ্চল্যদীপ্ত চট্টগ্রাম। স্বীকৃত হলো, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন আখ্যাত শহীদ মাহমুদ হোসেন, ডাক্তার মোহাম্মদ শফী ও খোন্দকার এহসানুল হক আনসারীর অবদান ।

আপনারা জানেন, সরকারি কর্মচারীরা পলিসির দাস। যখন সে সরকার আসে, সেই সরকারের নীতির অনুসরণে তাঁরা কাজ করেন। আমাদের জন্যে পরম

সৌভাগ্য হচ্ছে, ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে দুই শতাব্দীকালের মধ্যে এবারেই যে এদেশের কতিপয় সরকারি কর্মচারী ক্ষমতাসীন সরকারের নীতির দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আমরা তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। স্থানীয় জননেতাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে সারা দেশে আমরাই সরকারি কর্মচারী হিসেবে সর্বপ্রথম ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলাম ।

আজকে যে-দশজন কর্মী পুরস্কৃত হয়েছেন, তাঁরা ছাড়াও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা পর্যায়ে আরো কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা রয়েছেন। পুরস্কৃত দশজনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চের মধ্যে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশে শত্রুপক্ষের প্রথম বিমান হামলার মোকাবিলা করেছিলেন, একটি ১-কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটার তুলে নিয়ে মুক্ত অঞ্চলে সরে গিয়েছিলেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরবর্তী সকল পর্যায়ে দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া অবধি কর্মরত ছিলেন ।

বস্তুত ইতিহাস নানা কারণে বিকৃত হয়। বিকৃত হয় আমাদের স্মৃতিবিভ্রমের ফলে। বিকৃত হয় আমাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হবার ফলে । বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃত হবার জন্যে শেষোক্ত কারণটিই বিশেষভাবে দায়ী। সচরাচর একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাস লেখেন, তিনি তৃতীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং শ্রুতিনির্ভর কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এটা হচ্ছে, স্বদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধের সঙ্গে একজন বাঙালি হিসেবে নিজের ন্যূনতম অংশগ্রহণের কৃতিত্বটুকুকেও আমরা ফলাও করে বিবৃত করতে আগ্রহী হই । এই প্রবণতা স্বাভাবিক হলেও ইতিহাসের সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সবশেষে, একটা সত্য অবশ্যই স্বীকার করা কর্তব্য যে, পুরস্কৃত আমরা দশজন কর্মী, যাঁরা ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চের মধ্যে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকায় সংগ্রামী কৃতিত্বের অধিকারী । আমি এবং জনাব মুস্তফা আনোয়ার একটি বাড়তি দাবি রাখবো— আপনারা যদি অনুগ্রহ করে হাসি সম্বরণ করেন। দলের আমরা দুজনই ছিলাম বিবাহিত এবং একমাত্র সন্তানেরও পিতা— দেশ শত্রুমুক্ত এবং নিজ শহরে প্রত্যাবর্ত হবার আগে পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রের কোনো খবরই আমরা জানতাম না ।

এবার উপস্থিত প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে একটি চুটকি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

একজন বললেন : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মীদের যে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার দেয়া হয়েছে, এ পুরস্কার কিন্তু বড়ো দেরিতে দেয়া হলো। আরো অনেক আগেই এটা প্রাপ্য ছিল ।

অন্যজন বললেন : পুরস্কার মানে সোনার মেডেল তো। তা '৭২ সালে না দিয়ে এখন দেওয়াতেই ওদের জন্যে ভালো হলো। তখন সোনার দাম কম ছিল, এখন দাম বেশি। জানোই তো, ওদের নামকাম আছে কিন্তু ঘরে চাল-চুলো নেই। স্যাকরার কাছে ওদেরকে যেতেই হবে ।

আর একবার আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের এই পুরস্কার নির্বাচনী সংসদের চেয়ারম্যান তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং অপর দশজন সদস্যের উদ্দেশে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দৈনিক আজাদীর স্বত্বাধিকারী জনাব এম এ মালেকের প্রতি এবং আমাদের চির শুভাধুন্যায়ী অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের প্রতি। ধন্যবাদ ।

সেই ১-কিলোওয়াট শক্তির মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারটি। আমরা যা তুলে নিয়েছিলাম কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবন থেকে। সেটি ২৪ মে ১৯৭১-এর পর থেকে আগরতলায় সংরক্ষিত ছিল। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ৯১ নং হেড কোয়ার্টার্সে শালবাগানে। পরে ঢাকার নিয়ে আসা হয়েছিল ।

১৯৭৬ সালে ট্রান্সমিটারটি প্রদর্শিত হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত শিল্প ও সংস্কৃতি মেলায়। তিন মাসব্যাপী চালু ছিল সেই মেলা। বেতার প্রকৌশলী ইমদাদুল হক তৈরি করেছিলেন একটি স্টুডিও ও কন্ট্রোল রুম। নিজেই সংযোজিত করেছিলেন কনসোল । সংযোগ ছিল বেতার ভবনের কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে। কাঁচে ঘেরা সাউন্ডপ্রুফ কক্ষ। এয়ারকুলার ছিল। সজীব অনুষ্ঠান প্রচারের দৃশ্য দেখতে পেতেন দর্শকরা। সেই স্টুডিওতে রাখা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ১-কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি। দর্শকদের মধ্যে প্রদর্শন করেছিলেন আঞ্চলিক প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুশ শাকের।

ট্রান্সমিটারটি ঢাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত।

১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী ড. কামাল হোসেন। নির্বাচনী সফর উপলক্ষে গিয়েছিলেন সিলেটে। ২-১১-৮১ তারিখে সিলেট স্টেশন ক্লাবে তাঁর সম্মানে নৈশভোজ । ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ। বিশিষ্ট নাগরিকরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমিও

ছিলাম। নাগিরকদের পক্ষ থেকে দু'কথা বলেছিলেন আমিনুর রশীদ চৌধুরী। সাপ্তাহিক 'যুগভেরী'র সম্পাদক। পরবর্তী বক্তা হিসাবে নাম ঘোষণা করা হয়েছিল আমার। আমার পূর্বাবগতি ছাড়াই। স্বভাবতই অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। নিম্নস্বরে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলাম উদ্যোক্তাদের প্রতি। সিরাজ আহমেদ বলেছিলেন : এটা তো কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ নয় । ইলেকশন সম্পর্কে আপনি কিছুই বলবেন না ।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেছিলাম আমি। বলেছিলাম : এক দশক পর অনেক পরিচিত মুখের সমাবেশ দেখে আমি আজ অভিভূত।

বলেছিলাম : আমি একটি গণসঙ্গীতের কয়েকটি ছত্র আবৃত্তি করতে চাই। ভারত বিভাগের পরপর যে-গানটি গীত হতো। আমি তখন কিশোর-

'শোন সবে শোনো

সরমের কথা শোনো গো আমরা নাকি স্বাধীন পাইলাম

কর্তায় কইছে শোনো ।

সেই হাকিম তার সেই হুকুম তার সে জুলুমই চলে

পেটে আগুন জ্বইলতো যেমন,

আইজো তেমন জ্বলে ॥

যতো ছিল রায় বাহাদুর

নবাব নাইট খাজা

তারাই হইল দেশের মালিক

তারাই লুটে মজা ॥ ' ইত্যাদি

আমার ধৃষ্টতা মার্জনীয়। গানটির আবেদন কি আজকের দিনটিতেও ফুরিয়েছে? একবিন্দুও ফুরিয়ে যায়নি, আমি বলবো । সাতচল্লিশ সালের তথাকথিত স্বাধীনতার পরেও যেমন, আজকের দিনেও তেমনি। আজ এই সমাবেশ উপস্থিত আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ। তাঁর নিশ্চয় মনে পড়বে, মন্ত্রী থাকাকালে তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন সুনামগঞ্জে।

দেশগ্রামের কৃতি সন্তানের বাড়িতে তখন অভ্যাগতদের ভিড়। বাউল শাহ আবদুল করিমও দেখা করতে গিয়েছিলেন মন্ত্রীর সঙ্গে। গৃহভৃত্য চা পরিবেশ করেছিলেন । শাহ আবদুল করিম মন্ত্রীকে বলেছিলেন : আচ্ছা, ভাইসাব, সংগ্রাম করে দেশ তো স্বাধীন করলেন, মন্ত্রীও হলেন। এখন বলুন তো, এই বেচারাটাকে স্বাধীনতা কখন দেবেন?— গৃহভৃত্যাটির দিকে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শাহ আবদুল করিম ।

বক্তৃতায় উপসংহার বলেছিলাম : সত্যি আমি অভিভূত এ মুহূর্তে। আমি স্মৃতিভারাক্রান্ত । তাই সত্যের খাতিরে, বিবেকের তাড়নায় একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম এবং দু'টি প্রাণচঞ্চল শব্দ উচ্চারণ করে আমার বক্তব্য শেষ করবো । এই নাম ও শব্দ স্থানকাল দলমতের ঊর্ধ্বে একটি সত্য সুন্দর ইতিহাস । নামটি 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' । শব্দ দু'টি 'জয় বাংলা'।

'জয় বাংলা' শুধু স্লোগানই ছিল না। ছিল একটা বিপুল পরিচিতি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকেই অনেকে বলতেন 'জয় বাংলা রেডিও'। 'জয় বাংলা' মানেই 'রেডিও', এরকম উপলব্ধির প্রচলনও দেখা গিয়েছিল।

আসলে 'রেডিও' মানেই হয়তো বা জয়— জয় জয়কার। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম। সবচেয়ে ব্যাপকভিত্তিক গণমাধ্যম। 'জয়ধ্বনি'র জন্যে প্রথম ও প্রধান ভূমিকাই রেডিও-র।

১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের পর। শাহবাগ বেতার ভবনের সামনে দিয়ে চলেছিল একটি রিকশা । আরোহী একজন গ্রামীণ প্রবীণ । রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : বলো-তো, বেটা, এই বাড়িটার গেটে এতো পুলিশ মিলিটারি কেন?

রিকশাওয়ালাটি উত্তর দিয়েছিলেন : জানেন না আপনি? ও, আপনি তো গাঁওগেরামের মানুষ, তাই জানেন না । এই যে বাড়িটা এটার ভেতরে আছে একটা বিরাট মাইক, মানে চুঙ্গা। সে চুঙ্গাটায় মুখ লাগিয়ে যে বলতে পারবে, আমি সারাদেশের প্রেসিডেন্ট, অমনি সে প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে। ঐ চুঙ্গাটা যার, দেশটাও তার । সেজন্যেই এতো কড়া পাহারা ।

ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত 'লেখক' সঙ্কলনে (মার্চ-এপ্রিল '৮৩) আমার একটি ক্ষুদে সাক্ষাৎকার পত্রস্থ হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি—

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধের যে স্মৃতি আপনি কখনো ভুলতে পারেন না, সেই স্মৃতির পাতা থেকে কিছু বলুন ।

উত্তর : আমি ২৬ মার্চ ১৯৭১-এ অর্থাৎ প্রথম দিনই একজন শব্দ-সৈনিক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে আত্মনিয়োগ করি, কার্যত যখনও সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠেনি। চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং ৩০ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগীয় মোট ১০ জন প্রাথমিক কর্মীর দল সংগঠন আমার উদ্যোগে হয়েছিল। ২৭ মার্চ আমার ব্যক্তিগত আহ্বানে পটিয়া থেকে আমার সঙ্গে কালুরঘাটে এসেছিলেন মেজর জিয়া এবং আমারই প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বত:স্ফূর্ত স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। সেই ব্যস্ততম মুহূর্তগুলো আমার জীবনে অবিস্মরণীয় ।

প্রশ্ন : আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বাধীনতা-উত্তর শিল্প-সাহিত্যে কতটুকু বাস্তব প্রভাব ফেলেছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' কথাটি কিন্তু একটি চিরায়ত উপলব্ধি । যেমন, আমি আমার একটি সদ্য সঙ্কলিত কাব্যগ্রন্থের নামকরণই করেছি 'সামনে আছে মুক্তিযুদ্ধ'। গ্রন্থটি এখন যন্ত্রস্থ। গ্রন্থের একটি খণ্ড কবিতায় বলেছি, 'মুক্তিযুদ্ধ সর্বদেশে প্রাত্যহিক নিত্য অনুষ্ঠান ।'

প্রশ্ন : স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও মূল্যবোধ এখন স্তিমিত কেন, মন্তব্য করুন। উত্তর : এ কথার সঙ্গে আমি তত্ত্বগতভাবে একমত নই। প্রকৃতপক্ষে জীবনসংগ্রামী মানুষ কখনো যুদ্ধরত থাকে, আর কখনো নবতর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণরত থাকে । কোনো সময়েই জীবনসংগ্রাম থেকে বিরত থাকে না। এছাড়া মূল্যবোধ ও যুক্তি বিচার অনবরতই কাল-পাত্রের নিরিখে বিবর্তিত ও বিকশিত হতে থাকে মানুষের পৃথিবীতে ।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সরকারি উদ্যোগে লিপিবদ্ধ করা কি বাঞ্ছিত? যুক্তিসহ বিস্তারিত বলুন ।

উত্তর : আমি মনে করি, ভক্তি ও রাজশক্তি ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করে । তবে একটি বিশেষ ঘটনাপ্রবাহের মোটামুটি নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার জন্যে অন্ততপক্ষে তিনটি দশক অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে কোনো ইতিহাসই কোনো সময়ে চূড়ান্ত লিপিবদ্ধ করা যায় না। অসত্য নয় যে, মহাযুদ্ধে হিটলার বিজয়ী হলে বিশ্ব ইতিহাসে নন্দিত হতেন, বিজিত হলেন

বলেই নিন্দিত হয়েছেন। যে-কোনো অবস্থাতেই ইতিহাস রচনা একটি দুরূহ এবং গ্রন্থ প্রকাশ একটি দুর্বহ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার । কাজেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আপাত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সরকারি কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। পুনর্লিখনের কল্যাণে পর্যাপ্ত কালক্ষয়ের ফলে নিরপেক্ষ ইতিহাসকে উদ্ধার ও সংরক্ষণ অবশ্যই সম্ভব হবে ।

প্রশ্ন : আপনি যেখানে কর্মরত, সেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের কি কোনো প্রয়াস রয়েছে? থাকলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করুন।

উত্তর : আমি সরকারি প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও এই মাধ্যম থেকে ব্যাপক প্রচার করা হয় ।

'আবারও সোচ্চার হতে পারি'। একটি কবিতার শিরোনাম। রচনাকাল ২৯-১১- ৮০। কবিতাটি :

কেউ কেউ কথা বলতে বলেন আমাকে, আমিও

বলতে চাই— বিশেষত বিশেষ দিনগুলোতে

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী দিতে কিছু আমার ও

অশেষ আগ্রহ।

অথচ আমার কেবল শঙ্কা,

কেউ আমার কথায় হবেন কি করে আস্থাশীল—

আমার যেহেতু কোনোরকম ক্ষমতার অধিষ্ঠান

নেই— দৈনন্দিন রুপালি পর্দায় সগৌরবে

চলমান চিত্রপট এবং ইথারে একচ্ছত্র কণ্ঠস্বর

ছড়িয়ে দেবার অবকাশ আমার নেই যে আদৌ ।

তাই বলে যত্রতত্র উড়ে বেড়াবার

বাষ্পরথ চাই নে আমার ।

কেবল আমি যদি ঢাকা

জাদুঘর থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারি আমার

এক-কিলোওয়াট প্রচারযন্ত্রটি, আবারও সোচ্চার তাহলে

হতে পারি প্রাণপ্রমত্ত মুক্তাঞ্চল নিজ দেশভূমে ॥

অনুষঙ্গ— ১

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বেলাল মোহাম্মদ কর্তৃক রচিত ও প্রচারিত কয়েকটি কথিতা :

১। 'আমরা বাঁচবো, আমরা গড়বো' (১)

আজ হোক, কাল হোক, গণতান্ত্রিক বিশ্ব স্বীকৃতি দেবেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে— বাংলাদেশের নবগঠিত সরকারকে। এই সম্ভাবনা অমূলক নয়, এ এক সুনিশ্চিত সত্য। কেননা পশ্চিম পাকিস্তান সরকার গত দুই যুগ ধরে বাংলাদেশের ওপর যেভাবে তাদের কায়েমি শাসন চালিয়ে গেছে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আজ সেই ব্যূহ ভেদ করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে এখন তারা আপোসহীন। তথাকথিত পাকিস্তানি জাতীয়তা ও জাতীয় সংহতির মোহ কাটিয়ে এখন তারা স্বাধীন সমৃদ্ধ জীবননির্বাহের ব্যাপারে হয়েছে আত্মসচেতন। এই আত্মসচেতন জাতির তথা বাংলার মানুষদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি দান তাই গণতান্ত্রিক বিশ্বের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ।

এভাবে অচিরেই পৃথিবীর মানচিত্রে নবরূপে চিহ্নিত হতে যাচ্ছে আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র— যার নাম বাংলাদেশ, যে দেশের জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি।

এ-কথা বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশের এই নবতর রূপায়ণ এ অঞ্চলের হৃত ও স্বাধীনতারই পুনরুদ্ধার সাধন ।

যে-স্বাধীনতা আমরা একবার বিকিয়েছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে এবং স্বাধীনতার নামে আমাদের যে-স্বাধীনতা দুই যুগ আগে হরণ করেছিল তথাকথিত পাকিস্তানি প্রশাসনযন্ত্র, আজ জীবনের মূল্যে আমরা অর্জন করেছি আমাদের সেই জন্মগত অধিকার— স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলার

সাড়ে সাতকোটি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ।

আজকের অধিকার সচেতন প্রতিটি বাঙালি জড়িয়ে পড়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার এক জীবন-মরণ সংগ্রামে । আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিতে শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখা আর সম্ভব নয় বুঝতে পেরে পশ্চিম পাকিস্তানি পশুশক্তি মরণকামড় দিয়েছে এখানে । সময়ের ও ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ থেকে নিজেদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী দেখতে পেয়ে তারা চাইছে যাবার আগে সোনার বাংলাকে শ্মানে পরিণত করতে। নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে, বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করে তারা তাদের সেই অসদিচ্ছারই নজির সৃষ্টি করেছে। আমাদের ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, মালগুদাম, গঞ্জ-বাজার, শহর-বন্দর, শিল্প অঞ্চল ইত্যাদি ধ্বংস করে দিতে চাইছে তারা । চাইছে বাংলাদেশের মানুষকে দুর্যোগের মুখে ঠেলে দিতে।

কিন্তু আজকের আত্মসচেতন বাঙালিকে তারা কোনো শক্তিতে দমন করবে? ভ্রাতৃশোক, পুত্রশোক, বন্ধুবিচ্ছেদ বা বসতঘর থেকে উচ্ছেদ— কোনো কিছুতেই বাংলার মানুষ আজ মনোবল হারাবে না। প্রতিটি বাঙালির লক্ষ্য, বর্বর হানাদারদের দুষ্কর্মপ্রসূত ধ্বংসস্তূপে নতুন আবাদ গড়ে তোলা । আমাদের অন্তর থেকে উত্থিত উচ্চধ্বনি : আমরা বাঁচবো, আমরা গড়বো ।

দুর্বৃত্ত পাকিস্তানি হানাদারদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশ আজ যুদ্ধক্ষেত্র। বিক্ষিপ্ত ছাউনি গেড়ে অসম্ভবরকম সশস্ত্র পাহারায় বিশেষ বিশেষ কয়েকটি এলাকাকে শত্রুরা আজ তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। নিজেদের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বেতারের মাধ্যমে করে চলেছে নানারকম অপপ্রচার— ভাড়াটিয়া অবাঙালিদের মুখে উচ্চারিত নির্লজ্জ 'জিন্দাবাদ' শ্লোগানের ধারাবিবরণী প্রচার করছে ঘটা করে । বাংলার মুক্তিবাহিনীর হাতে মার খেয়ে তারা চোখে সর্ষেফুলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের দেখতে পেয়েছে বলে করেছে খবর প্রচার।

কিন্তু নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিক— নাগরিকদের উৎখাত করেও তারা কি সত্যকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবে? কেমন করে পারবে? কেমন করে পারবে তারা সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে?

সাড়ে সাত কোটি জনশক্তির সামনে কতোক্ষণ তারা টিকে থাকবে? বাংলার মুক্ত অঞ্চলের মানুষের কর্মচাঞ্চল্য যখন কেউ লক্ষ্য করবে, অনুভব করবে কি অসীম মনোবল সম্বল করে তারা বেঁচে আছে। প্রতি মুহূর্তে হানাদার পশ্চিম

পাকিস্তানিদের বর্বরোচিত বিমান আক্রমণের আশঙ্কাকে বেমালুম উপেক্ষা করে তারা তাদের দৈনন্দিন মাঠের কাজ, খামারের কাজ করে যাচ্ছে। এখন চাষাবাদের জন্য স্বাভাবিক সময়ের মতো সার, কীটনাশক, উন্নতমানের বীজ ইত্যাদির সরবরাহ নেই। নেই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এখন শুধু প্রথম বর্ষণের প্রাণরসে সঞ্জীবিত মাটির উর্বরতা আছে। আর তাকেই অবলম্বন করে লাঙল নামানো হয়েছে আবাদযোগ্য জমিতে। বাংলার কৃষক বসে থাকতে জানে না। গত বছরের ১২ নভেম্বরে সর্বনাশা বান-তুফানে উপদ্রুত এলাকায় যখন হালের গরু ছিল না, তখনো কৃষক চাষ করেছে— নিজেই সে টেনে টেনে চলেছে জোয়াল ।

জোয়ান ছেলে যোগ দিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে। ফিরবে বিজয়ী বেশে। গ্রামবাংলার কিষাণী পুত্রকে আদর সোহাগ করবে— এর চেয়ে বড়ো আশা আনন্দ আর কি আছে?

আজ হোক, কাল হোক, গণতান্ত্রিক বিশ্ব স্বীকৃতি দেবে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে । সে এক সমৃদ্ধ জনপদ, সোনার দেশ বাংলাদেশ। আজকের মুক্ত অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন স্বতঃস্ফূর্ত কর্মচাঞ্চল্যে বিধৃত রয়েছে তারই আভাস ।

— (রচনা ও প্রচার ১৭-৪-৭১)

২। বাংলার কথা (১)

ঢাকা বেতারের আর এক নাম বানোয়াট কাহিনীর প্রচারযন্ত্র। বানোয়াট এবং রূপকথার কল্পলোক সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার ।

উচ্চশক্তির এই প্রচারযন্ত্রটিকে আমরা এই মুহূর্তেই হয়তো নিতান্তই বাতুল বলে উড়িয়ে দিতে পারবো না। কিন্তু অবাক হতে আপত্তি কি? আমরা অবাক হই— ঢাকা বেতারের এক-একটি অনুষ্ঠান শুনি এবং অবাক হই । অবাক হই, যখন শুনি, বাংলাদেশের মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্যে সে-বেতার গানবাদ্যের নামে আমাদের কানে বিষ ছড়ায় । অবাক হই, বাংলাদেশের মানুষের হয়ে ওকালতি করার জন্যে যখন বেতারের মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় জনধিকৃত তথাকথিত নেতা বাংলার মীরজাফর-উমিচাঁদদের । অবাক হই, আমাদের চোখে-দেখা ঘটনাকে বিকৃত করে যখন খবর প্রচার করা হয় এবং আমরা ব্যথিত হই, যখন শুনি আমাদেরই কোনো পরিচিত

অসহায় কণ্ঠস্বর— যার জন্যে-আমরা ঠিকই বুঝতে পারি, উঁচিয়ে আছে তীক্ষ্ণধার বেয়নেট ।

এ ছাড়া একথাও আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি, ঢাকা বেতারের যে-কোনো অনুষ্ঠান যখন আগাগোড়া শুনি--বুঝতে পারি, তার কতোটা সত্য, আর কতোটা মিথ্যা ।

এই তো ক'দিন আগেই ঘটা করে ওরা প্রচার করলো একটি তথাকথিত গণমিছিলের ধারাবিবরণী। বাংলাদেশের প্রধান শহর ঢাকা-সাড়ে তেরো লক্ষ মানুষের শহর ঢাকা । সে ঢাকার বুকে একটি গণমিছিল হবে, এতে অবাক হবার কিছুই ছিল না । কিন্তু মাত্র একদিন আগে যারা আজকের মৃত্যুপুরী ঢাকা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে, তারা তো বলতে পারে, তেরো লক্ষ মানুষের শহরে আজ গণমিছিল জমিয়ে তোলার জন্যে তোরোজন বাঙালিও বেঁচে আছে কি না। আমরা তাই অবাক হই । তবে হ্যাঁ, গণমিছিলের জন্যে মানুষের অভাব নেই। অভাব কেন হবে?? কেননা ঢাকা অলিগলি পথে ছড়িয়ে আছে অগণিত রক্তলোলুপ জানোয়ার, অগণিত কসাই-আর আছে তাদের পেয়ারের কতিপয় দুস্তীদার, যারা বাংলার দুগ্ধপোষ্য কালসাপ, বাংলার মাটিতে বিচরণ করেও বাংলা ভাষায় কথা বলে না। এবং আরো আছে বাংলারই অশুভ-সন্তান গুটিকয় জগৎশেঠ রায়দুর্লভ। দু-একটি সস্তা নগ্ন নির্লজ্জ স্লোগান আর মিছিলের সাউন্ড- ইফেক্ট-এর জন্যে তারাই তো যথেষ্ট। আর তা-ই নিয়ে ধারাবিবরণী সহযোগে কড়া সামারিক পাহারাধীন ঢাকা বেতারের ঘটা করে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা কি- এমন অসুবিধাজনক? ঢাকা শহর আজ ২৫ থেকে ৩০ হাজার হানাদার সৈন্য ও ৫০ থেকে ৬০ হাজার উর্দু ভাষীর উল্লাসভূমি। তারাই ঢাকার আজকের বাসিন্দা। বেতারের বলা হয়, ঢাকায় এখন বাস চলাচল করছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলছে। তা চলছে। আর তাতে রয়েছে মানুষ ভর্তি । কিন্তু কে বলবে তার একটিও সিভিলিয়ানদের গাড়ি নয় । বাস বা গাড়ির যাত্রী আরোহীরা কেউই নয় বাঙালি। সবাই তারা সৈন্য বা উর্দুভাষী চাটুকার।

এটা তো কোনোমতেই আমাদের বুঝতে ভূল হয় না, যখন শুনি, একই মাইকে একদিকে খবর প্রচার করা হয়, বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক, জনজীবন স্বাভাবিক অফিস-আদালতের কর্মচারীরা কাজে যোগ দিয়েছে। অন্যদিকে বলা হয়, তাদের বর্বর বাহিনীর বানোয়াট অগ্রাভিযানের খবর, জারি করা হয়

কর্মচারীদের সত্বর কাজে যোগদানের নির্দেশ। এরকম পরস্পরবিরোধিতা হয়তো-বা নানিবুড়ির মুখে রূপকথার গল্পেই আকর্ষণীয় বা হৃদয়গ্রাহ্য হয়।

কিন্তু এভাবে যতোই তারা সত্যকে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' করে রাখতে চায়, তা পারে না— সম্ভব নয়। তাদের পরিবেশিত পরস্পরবিরোধী বক্তব্য থেকেই বাংলার স্বাধীনচেতা শ্রোতাসাধারণ আসল সত্যটি ঠিকই বুঝে নিতে পারেন ।

আমরা লক্ষ্য করলাম, দুর্বৃত্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে বাংলার মুক্তিফৌজ আজ যে জীবনপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, যুদ্ধের নিয়মেই যে এখন স্থানীয়ভাবে উভয় পক্ষের জয়-পরাজয়ও হচ্ছে, তার খবরাখবর প্রচারের সময় ঢাকা বেতার এক অপূর্ব পদ্ধতির অনুসরণ করছে। হানাদারদের অগ্রাভিযানের খবর বলতে গিয়ে তারা বলে, দুষ্কৃতকারীদের হাটিয়ে দিয়েছে এবং হানাদার বাহিনীর হটে যাবার খবর বলতে গিয়ে বলে, বাংলাদেশে নাকি ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা হামলা করেছে। সে যা- ই হোক, বিকৃত তথ্য আর বানোয়াট প্রচারণা সবকিছুকে ছাপিয়ে বাংলার গণমানসের কথা, বাংলার বাণী আজ মানবতাবাদী বিশ্বের কানে গিয়ে পৌঁছেছে ।

(রচনা ও প্রচার ১৯-৪-৭১)

৩। বাংলার কথা (২)

হ্যাঁ, সেই বানোয়াট কাহিনীর প্রচারযন্ত্রটির কথা বলতে চাই। বলতে চাই কি দুঃসাহসে এই বাংলার অধিকৃত এলাকায় বর্বর সামরিক কড়া পাহারাধীন থেকে সেই ধিকৃত যন্ত্রটি এমন বিকৃত তথ্যাবলী পরিবেশন করে চলেছে। বলতে চাই, নবতরঙ্গ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের ছলে কোনো দুরাশায় এই প্রচারযন্ত্রটি এখনো বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। কোনো মুখে ঐ মানবসভ্যতার দুশমন শিশুঘাতী নারীঘাতী বেঈমানরা "ভূতের মুখে রাম নাম" নিয়ে এখনো সেই ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ক্ষুধার্ত মাইকের সামনে এসে দাঁড়ায়, বুঝতে পারি না। সে কথাই বলতে চাই ।

বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণ করতে চায় ওরা। কল্যাণ অনেক তো করা হয়েছে। আবার কোনো কল্যাণ? কল্যাণ করা হয়েছে, বাঙালির ঘরবাড়ি সম্পদ পুঁজি বোমার আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে ভিটেমাটিছাড়া দায়মুক্ত করে দিয়ে। কল্যাণ করা হয়েছে, যুবক সন্তানকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে হতভাগ্য মা-বাপকে সন্তানপালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে। শত

শত সাজানো বাগান, মধ্যবিত্তের ঘর-সংসার, সমৃদ্ধ শহর-বন্দর-পণ্য-বিপণি-হাটবাজার নাপামের একটি হুঙ্কারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাংলার গণপদকে বিরান করে দিয়ে অনেক কল্যাণ করা হয়েছে—কল্যাণ করা হচ্ছে ।

আর সেই মহান কল্যাণের উল্লাসে মেতে গিয়ে যদি যুগের দজ্জাল তথাকথিত পাকিস্তানের 'খ' এলাকার প্রশাসক আরো কল্যাণ করার উদযোগের কথা ঢাকা বেতারের মাধ্যমে প্রচারের ঔদ্ধত্য দেখায়, তাহলে কি বলা যায়!

আমরা অন্য আর কিছুই বলতে চাই না। শুধু বলবো, বাংলাদেশের পাকিস্তানি বর্বর অধিকৃত এলাকায় শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের মুখ দিয়ে যতোই মায়াবী আহ্বান জানানো হোক, একজন বাঙালিও সেই আহ্বানে সাড়া দেবে না ।

সাড়া কেউই দেবে না এবং বর্বর হানাদারদের কাঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রচারযন্ত্রটিতেও নিশ্চয় ওরা নিয়োজিত করতে পারতো না একজনও বাঙালি কর্মচারী বা ঘোষক- ঘোষিকাকে যদি আমাদের সেসব গুটিকয় অসহায় ভাইবোনের বুকে সারাক্ষণ বেয়নেট উঁচিয়ে রাখা না হতো। বাংলার কোমলপ্রাণ মায়ের স্নেহে লালিত সেই দু'-একজন অসহায় শিল্পীকে আজ হয়তো প্রাণের মায়ায় দুর্বৃত্তদের গোলামি তথা উৎপীড়ন স্বীকার করে নিতে হয়েছে। তাদের জন্যে আমরা ব্যথিত ।

কিন্তু এই অবকাশে আমরা বাংলার কুলাঙ্গার কতিপয় জনধিকৃত নেতা ব্যক্তির পরিচয় নতুন করে সংগ্রহ করতে পারছি। এরা সবাই বয়ো বৃদ্ধ। এদের কাছে নিজের প্রাণরক্ষার চেয়ে বাংলার মানুষের স্বার্থই বৃহত্তর বলে বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল। বাংলার মানুষ এদেরকে আর একবার চিনে রাখলো। কেননা কোনোদিন যদি এরা নিজেদের আজকের প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে প্রাণের ভয়ের অজুহাত দেখাতে চায়, সেদিন যেন আর এই 'দুমুখো সাপ'-দেরকে ক্ষমা করা হয় না । জীবনের ভোগ-বিলাসের পূর্ণতা সাধিত হওয়ার পরও এতোই যখন প্রাণের মায়া, সেই ইতরপ্রাণকে আজকের জাগ্রত বাংলার বিজয়ী সৈনিকরাই তখন নিঃশেষ করে দেবে।

সত্যি, ঢাকা বেতারের মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো মৌ-লোভী আয়েবে রসূল বা রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে সালামের পবিত্র নামের অবমাননাকারী কলঙ্কিত কণ্ঠ যদি আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আজকের পশ্চিম পাকিস্তানি বর্বরতার স্বপক্ষে কথা বলতে শুরু করে, যদি কোনো রাজনৈতিক

দলীয় নেতাব্যক্তি বর্তমান জঙ্গিশাহীর বাঙালি নিধন অভিযানের স্বপক্ষে শত শত বাঙালির লাশের ওপর পা রেখে এখনো তথাকথিত সংহতি আর ইসলামের ভ্রাতৃত্বের কথা বিবৃত করে, তখন যে শব্দে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে পারে, সেরকম শব্দ বাংলা ভাষার অভিধানে পাওয়া যাবে না । ঐ সব পশুর চেয়ে ইতর নরাধমদের উদ্দেশ্যে বলা যায় : চেটে নাও— যতোক্ষণ পারো তোমরা তোমাদের প্রভুদের পা চেটে নাও এবং বাংলার বুকে নির্বিচারে নরহত্যা যজ্ঞের ধানদুর্বার যোগান দিয়ে যাও। কেননা দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের প্রভুদের সদর্প পদসঞ্চালন অচিরেই থেমে যাবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে তোমাদের জিহ্বাও, যে-জিহ্বার সাহায্যে তোমরা কোটি কোটি বাঙালি মা-বোনের হৃদয়মনকে ব্যথাহত করে দুশমন-অধিকৃত প্রচারযন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে নগ্ন নির্লজ্জ উক্তি করে চলেছ। তোমরা তো জানো না, বাংলার মর্মের বাণী বাংলার প্রাণের কথা দুর্বৃত্তদের প্রচারযন্ত্রের চেয়ে আরো অনেক অনেক উদাত্ত ।

(রচনা ও প্রচার ২০-৪-৭১)

৪ । বাংলার কথা (৩)

এ কথা অনস্বীকার্য যে যুদ্ধকালীন প্রচারযন্ত্র যে-কোনো যুদ্ধের একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। বর্তমান বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানিরা নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালিদের ওপর এই হাতিয়ারটিও পূর্ণশক্তিতে প্রয়োগ করে চলেছে। তাদের সুপরিকল্পিত এই যুদ্ধের পূর্বাহ্নেই তারা হাত করে নেয় ঢাকা বেতার কেন্দ্রটি। তারপর ঠিক যেভাবে তারা তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে, সেই একইভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এই যন্ত্রটির মাধ্যমে । প্রচারযন্ত্রটিকে তারা নিয়োজিত করেছে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি প্রদানে । তথাকথিত জাতীয় সংহতি এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রচারণার আর অন্ত নেই । নিজেদের কায়েমি স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তস্কররা পবিত্র কোরানের অপব্যাখ্যাও প্রচার করেছে বেতারের মাধ্যমে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। — হবে না। ধর্মপ্রাণ আত্মসচেতন বাঙালির মন আজ আর কিছুতেই ভুলছে না । সশস্ত্র বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণকে প্রতিহত করছে বাঙালির যে-মনোবল, সে একই মনোবল এখানেও কাজ করছে। পাকিস্তানিদের ধর্মকথা আর তাদের মর্মে গিয়ে পৌছবে না। কেননা

একথা আমাদের বুঝতে বাকি নেই যে খুনি লুটেরা হামলাবাজের মুখের 'অমরবাণী' আর ভুতের মুখে রাম নামের মধ্যে কোনো তফাত নেই। বাংলার সুজলা-সুফলা শস্যক্ষেতে যারা আগুন জ্বালালো, বাংলার মা- বোনের ইজ্জতের ওপর যারা হামলা করলো, যারা এখানে নির্বিচার গণহত্যায় মেতে উঠলো, তাদের মুখে 'শান্তির ললিত বাণী 'ব্যর্থ পারিহাস' ছাড়া আর কিছুই নয় ।

বাংলার প্রাণকেন্দ্রে বসে বাংলার মানুষের জন্যে তারা যে বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার করছে, তা আদৌ বাংলার কথা নয়। বাংলার কথা বাঙালির বুকে বুকে সঞ্চিত হয়ে আছে।

অতি সম্প্রতি ঢাকা বেতার কেন্দ্র নতুন অনুষ্ঠান শুরু করেছে— নাম 'সবরং'। অনুষ্ঠানটি শুধু 'বিশেষ' বিশেষণে ভূষিতই নয়। বরং এর জন্যে তাদের একটি অধিবেশনের সময়সীমা আধঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সবরং অনুষ্ঠানটি একটি গীতিবিচিত্রা । প্রথম দিনের অনুষ্ঠানটিতে ছিল একটি নাতে রসূল— যাকে আমরা আগেই 'ভূতের মুখে রাম নাম' বলেছি। এরপর দু'টি পাঞ্জাবি লোকগীতি, একটি সিন্ধি লোকসঙ্গীত, একটি বাংলা ভাটিয়ালি ও একটি বালুচ বিয়ের গান। বাংলা ভাটিয়ালি গানটি ছিল 'ওরে ও ঝিলাম নদীর পানি'। অর্থাৎ নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোনো কবিকে দিয়ে ইতঃপূর্বে তথাকথিত সংহতি সম্প্রীতিসূচক বৈদেশিক একটি নদী-বন্দনার যে- গানটি লিখিয়ে নেয়া হয়েছিল।

ঢাকা বেতারের পশ্চিম পাকিস্তানি ভাষার গান শুনে কে যেন সেদিন বলেছিলেন : বাজিয়ে নে— প্রাণভরে বাজিয়ে নে। এসব তোদের জালিম সৈন্যদের বাঙালি নিধনের নেশা ধরাক । কিন্তু কতোদিন? তোদের নৃত্যগীতের আসর অচিরেই ভাঙ্গবে ।

— (রচনা ও প্রচার ১-৫-৭১)

৫। বাংলার কথা (18)

আপনারা যাঁরা গ্রামবাংলার মুক্তঅঞ্চলে আছেন-কিংবা যাঁরা শত্রুকবলিত কোনো শহর-বন্দরেই আছেন— আছেন প্রতি মুহূর্তে 'পদ্মপত্রে জল' প্রাণখানা হাতে করে। এমনকি, যাঁরা ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অফিসে স্টুডিও-তে অনুষ্ঠান তৈরির বা প্রচারের কাজেই নিয়োজিত আছেন— সবাই আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারেন, ঢাকা বেতারের কথা বাংলার কথা নয় । কেন বুঝবেন না,

বলুন? আপনি যদি মুক্ত অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হন, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, আপনার এলাকায় বহু মানুষের ভিড়। এঁরা সবাই প্রাণে বেঁচে এসেছেন দূরদূরান্তের শহর থেকে, গ্রাম থেকে— যেখানে দুর্বৃত্ত পাকিস্তানি হানাদাররা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, স্থানীয় মুসলিম লীগারদের লেলিয়ে দিয়ে লুট করিয়েছে গৃহস্থের ধনসম্পদ, মায়ের সামনে যুবক ছেলেকে গুলি করে মেরেছে, বাপের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে যুবতী কন্যাকে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, পুত্রহারা মা, কন্যাহারা পিতা, ভাইহারা বোন আর পিতামাতাহারা শিশু, সহায়-সম্বলহারা বৃদ্ধরা আপনার এলাকায় এসে ভিড় করেছে, আশ্রয় নিয়েছে এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই নতুন উদ্যমে শত্রুকে ঘায়েল করার জন্যে । এ ছাড়া আপনি যদি শত্রুকবলিত এলাকায় থাকেন, প্রতি মুহূর্তে আপনি সচকিত, অত্যাচার উৎপীড়ন এবং মৃত্যুভয়ে আপনি ভীত। যে- কোনো রাতেই আপনার ঘরে লুটেরারা হানা দিতে পারে। যে-কোনো সময়ে জানালা ভেদ করে গুলি এসে বিঁধতে পারে আপনার গায়ে। কারফিউর সময়ের তো প্রশ্নই ওঠে না, অন্য সময়টুকুতে যখনই কেনাকাটার প্রয়োজনে ঘরের বাইরে আসেন, ভয়ে আপনি এতোটুকুন হয়ে থাকেন— পথের যে-কোনো বাঁকে টহলদার হানাদার সৈন্যের সম্মুখীন হতে পারেন এবং আপনার উদ্দেশ্যে উৎকট প্রশ্ন হতে পারে : ‘কৌন্ হো তুম-বাঙালি ইয়া মুসলমান'। অর্থাৎ বাঙালি কখনো মুসলমান হতে পারে না ।

এবারে আপনার ব্যাপারে বলি— আপনি, যিনি সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের প্রশ্নে স্বেচ্ছায় অথবা বেয়নেটের মুখে বাধ্য হয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কাজে যোগদান করেছেন। আপনি সবই জানেন, বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থার খবর কিছুই আপনার অজ্ঞাত থাকে না, কিন্তু আপনার পক্ষে কি তাই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করার উপায় আছে? অথচ আপনি কি এই কিছুদিন আগেও নির্বাচিত প্রতিনিধি মহলের ডাকে এই বেতারেই অসহযোগ আন্দোলনের স্বপক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন নি? আপনি কি বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর বেতারের মাইকের সামনে তুলে ধরেননি? সব আপনি করেছেন । কিন্তু এখন আপনি নিরুপায় । এবং আপনি আজ বাংলার মানুষের জন্যে যে কথা বেতারের মাধ্যমে বলছেন, তা বাংলার কথা নয়- আপনাদের প্রাণের কথা নয়, একথা স্বীকার না করে আপনি পারেন না ।

কিন্তু আমরা আশ্চর্য হই, বাড়ো বেশি আশ্চর্য হই, যখন দেখি, বাংলার কতিপয় বিশ্বাসঘাতক দুর্বৃত্ত হানাদারদের হয়ে ওকালতি করছে ঐ বেতারের মাধ্যমে ।

তারা তা করুক— যতোদিন পারে নিজেদের কুলাঙ্গার বৃত্তি চরিতার্থ করুক । বরং তাতে আমাদের উপকারই হচ্ছে— আমরা তাদের চিনে রাখতে পারছি- চিহ্নিত করে রাখতে পারছি। কেননা আমরা আজকের হানাদারদের যখন হটিয়ে দেবো, তখন সেই সঙ্গে এসব বশংবদদেরকেও করবো দেশছাড়া। ঢাকা বেতার আমাদেরকে যতোই শান্তির কথা বলুক, আপনি-আমি যে যেখানেই আছি, আমরা সবাই অশান্ত— সমগ্র বাংলাদেশ আজ অশান্ত। কেননা বাংলার মুক্তিফৌজ রণক্লান্ত হয়নি-বাংলার দামাল ছেলেরা সেদিনই শান্ত হবে, যেদিন এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি থেকে প্রতিটি হানাদারকে উৎখাত করতে পারবে।

— (রচনা ও প্রচার ১-৫-৭১)

৬। 'বাঙালি, ইয়া মুসলমান'?

'কৌন্ হো তুম-বাঙালি ইয়া মুসলমান'-আজকের দিনে এটা একটা বহুশ্রুত প্রশ্ন, বাংলাদেশের শত্রুকবলিত অঞ্চলগুলোতে এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে-কোনো বাঙালিকে। প্রশ্নকর্তা হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য। এমনি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন চট্টগ্রামের একটি মসজিদের ইমাম সাহেব, ৬০ বছর বয়সী শান্ত সৌম্য বৃদ্ধ হতভাগ্য ইমাম সাহেব, জোহরের জামাত শেষে জায়নামাজে বসে তবিহ্ পাঠ করেন বেশ কিছুক্ষণ । ততোক্ষণে মুসল্লিরা যার যার ঘরে ফিরে যায়-জামে মসজিদের সিঁড়িতে ভিড় থাকে না। তখনই তিনি নেমে আসছিলেন সিঁড়ি বেয়ে সড়কে । সামনে পড়লো একদল টহলদার পাকিস্তানি সৈন্য, ওদের একজন প্রশ্ন করল : 'এই বড়ুঢ়া। তুম বাঙালি, ইয়া মুসলমান'? বলে কি! নিশ্চয় আমি বাঙালি, এই বাংলার ছায়া-সুনিবিড় এক শান্তির নীড়ে আমি জন্মেছি, মায়ের আদরে বোনের সোহাগে বড়ো হয়েছি। মায়ের মুখের বুলি বাংলাভাষায় কথা বলতে শিখেছি এবং আমি যে আরবি-ফারসি ভাষা ধর্মপুস্তক পাঠ করেছি, তা-ও বাংলা ভাষার মাধ্যমেই। আমাদের দেশ বাংলাদেশ, দেশের মানুষের ভাষা বাংলা ভাষা। ঘরে-বাইরে যেখানেই যাই, বাংলা ভাষাতে হয় আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা । আমার মা বাঙালি, বাপ বাঙালি, এই যে মসজিদে নমাজের জামাতে শামিল হয় অগণিত মুসল্লি, তাদের কেউ জুম্মার নামাজ— ঈদের নামজের নিয়ত না জানলে বাংলাতেই তাদেরকে শিখিয়ে দিই নিয়ত পাঠ করার জন্যে । এবং নিশ্চয় আমি মুসলমানও। বংশপরম্পরায় আমরা মুসলমান। আমার বাপ-দাদা ছিলেন মুসলমান । আমাকে তাঁরা দীন-ই-

ইম শিক্ষা দিয়েছেন। আমি আজ মুসলমানদের নমাজের জামাতে ইমাম পর্যন্ত হয়েছি। আমি রোজ রোজ মসজিদের মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে নসিহত করে থাকি। নিশ্চয় আমি মুসলমান। জন্মগতভাবে। দেশ-পরিচয়ে আমি একজন অকৃত্রিম বাঙালি এবং আমার ধর্মীয় পরিচয় আমি মুসলমান। কিন্তু এটা কেমন প্রশ্ন : বাঙালি না মুসলমান? আমাদের মহানবি নিজকে জন্মভূমির পরিচয়ে 'আরবীয়' বলতে আনন্দ পেতেন, আমার 'বাঙালি' পরিচয়ও তাই আনন্দদায়ক। বিশেষ করে আজ আমাদের সন্তানেরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই-এ অকাতরে প্রাণপণ করেছে। বৃদ্ধ ইমাম সাহেব জবাব দিলেন : 'আমি তো, বাপু, একজন বাঙালি মুসলমান' । তিনি হয়তো আরো কিছু বলতেন। কিন্তু তার আগেই হানাদার দস্যুর বিষাক্ত বেয়নেট বিদ্ধ করে দিয়েছিল ৬০ বছরের বৃদ্ধের বুক! বৃদ্ধ ইমামের মুখে অন্তিম কলেমা পাঠ শুনেও দুষ্কৃতকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের বিচলিত হবার কোনো কারণ ছিল না। আর এভাবেই তারা হত্যা করেছে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের। বাংলাদেশের শত্রুকবলিত এলাকাগুলোকে বাঙালিশূন্য করাই তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য কোনো দিনই সফল হবে না, কেননা বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা আজ রক্তের বদলে রক্ত নেবার সঙ্কল্পে ঐক্যবদ্ধ। পাকিস্তানি পশুশক্তিকে তারা বাংলার সবুজ মাঠ থেকে উৎখাত করবেই। সর্বশেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে তারা এ সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হবে না। বাঙালি মুসলমান বৃদ্ধ ইমাম সাহেবের উষ্ণ রক্তকে কিছুতেই তারা দেবে না বৃথা যেতে ।

(রচনা ও প্রচার ২-৫-৭১)

৭। বাংলার কথা (৫)

পাকিস্তান বেতারের একটা চিরাচরিত ঘোষণা হচ্ছে, তারা তাদের যাবতীয় অনুষ্ঠান নাকি প্রচার করে থাকে শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে। তাঁদের মনোগ্রামেও আরবি হরফে একথার সমর্থক কোরানের আয়াত খচিত রয়েছে। তা হচ্ছে "কুলুলিনাসে হুস্না।" অর্থাৎ লোকদেরকে সুন্দর কথা শোনাও ।

সুন্দর কথা-আর যে-অঞ্চলের জন্যে যা-ই হোক, বাঙালিদের জন্যে নিশ্চয় দুর্বোধ্য উর্দু ভাষা নয়, কিংবা পশ্চিম পাঞ্জাবের হাল্কা নাচের গান বা সিন্ধুর লোকগীতি, বালুচ বিয়ের গান নয়।

আজকাল ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এসব প্রচারের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করেই

আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। কেননা ঢাকা বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শ্রোতা হিসেবে বাংলাভাষী মানুষদেরকেই গণ্য করা স্বাভাবিক বলে আমরা মনে করি ।

অথবা আমরা জানি না, হয়তো এমনও হতে পারে, বর্তমানে কড়া সামরিক পাহারাধীন ঢাকা বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্য পরিবর্তনও করতে পারে। হয়তো-বা তাদের মনোগ্রাম থেকে তারা 'কুলুলিননাসে হুসনা' কথাটিও মুছে দিয়ে থাকতে পারে ।

কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ এখন দুঃসময়। পর্যাপ্তসংখ্যক কর্মচারীর অভাব। রাজধানী শহরে নেই জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুলগুলো বন্ধ— সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সংস্থাগুলো নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ শহরে এখন বেতার-কথিকা প্রচার করার উপযুক্ত লোকই খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন শুধু রয়েছে কতিপয় চাটুকার আর পশ্চিম পাকিস্তানি প্রভুদের পদলেহনকারী জন্মধিকৃত মুসলিম লীগার ।

হ্যাঁ, আরো কেউ কেউ আছে— যথেষ্ট সংখ্যক। কিন্তু কেউ তারা বাঙালি নয়। বাংলাদেশের খেয়ে-পরে যারা খান্দানি উর্দু ভাষার কথা বলে, তারা আছে। আর আছে-সারা শহর ছেয়ে আছে টহলদার সামরিক বাহিনীর খুনি লুটেরা সৈন্য। হয়তো ঢাকা বেতার তাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই বাংলার বিজাতীয় ভাষার অনুষ্ঠানের সংখ্যা শনৈ শনৈ বাড়িয়ে চলেছে।

তা তারা বাড়াতে থাকুক। মিথ্যা প্রচারণা আর ছলনা তারা চালিয়েই যাক । তাতে বাংলার সংগ্রামী জনসাধারণের কিছুই যাবে আসবে না। কেননা ওসব অনুষ্ঠান বাঙালিদের মনোরঞ্জনের জন্যে নয়, একথা তারা বোঝে। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের মাইকে আজ আর বাংলার গণমানসের কথা আদৌ শোনা যায় না, একথা তারা বোঝে । তারা বুঝতে পারে, বেতারের যে-কোনো অপপ্রচারে ভুলে যাবার দিন আর নেই । আজ সময় এসেছে জীবনপণ সংগ্রামের। সময় এসেছে বাংলাদেশের বুক থেকে বিদেশী হানাদারদের চিরদিনের জন্যে উৎখাত করার । সময় এসেছে রক্তের বদলে রক্ত নেবার। আর এজন্যেই পঞ্চমুখী প্রচারযন্ত্র চালিয়েও পাকিস্তানি জঙ্গি মহল প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না বাঙালিদের মনে। প্রতিটি বাঙালি আজ সংকল্পে অটল, সঙ্কটে অবিচল দুর্বার দুর্জয় সৈনিক ।

— (রচনা ও প্রচার ২-৫-৭১)

৮। বিসুভিয়াস বাংলা

বিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাত ছিল এক ধারণাতীত ব্যাপার। ভোগবিলাস সমৃদ্ধ পম্পিয়াই নগরীর বাসিন্দারা এই মৃত আগ্নেয়গিরিকে একটুও ভয় করতো না। কেননা তারা বছর বছর ধরে লক্ষ্য করে এসেছে, এই জ্বালামুখে কোনো লাভার চিহ্ন নেই। আর তাই মৃত আগ্নেয় পাহাড়টিকে তারা অবজ্ঞা করেছে-উপেক্ষা করেছে। যেমন খুশি তেমন এর চূড়োয় বেয়ে উঠেছে, পায়ের তলায় পিষ্ট করেছে প্রতিটি পাথরকে ।

অবশেষে একদিন বিসুভিয়াসের ঘুম ভেঙেছিল। মুখ খুলেছিল বিসুভিয়াস। আর অগ্নিলাভা ফেটে বেরিয়েছিল গলগল করে— সেই আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল পম্পিয়াই নগরবাসীদের খেয়ালখুশির প্রাসাদ।

এ যুগের পম্পিয়াই নগরী ইয়াহিয়ার পাকিস্তান। এ যুগের আগ্নেয়গিরির এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এক-একজন বাঙালি ।

বিসুভিয়াস বাংলাদেশ ঘুমিয়ে ছিল। তেইশ তেইশটি বছর ঘুমিয়ে ছিল এই জনপদ। আর তাই ইয়াহিয়ারা এদেশকে করেছে অবজ্ঞা-করেছে উপেক্ষা। যথেচ্ছাচার চালিয়েছে তারা এদেশের বুকে শাসনের নামে শোষণ করেছে এদেশের মানুষকে, শান্তির নামে পীড়ন করেছে বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষকে ।

তারা ভেবেছিল, বাঙালি জাতি মৃত— বাঙালি শুধু দুর্ভোগ পোহাতে আর দাসত্ব করতেই জানে । কিন্তু তারা তো জানতো না। বাঙালির এতোদিনের নীরবতা ছিল তার ক্ষমাসুন্দর মহত্ত্বেরই অভিব্যক্তি। কোনোকালেই বাঙালিরা দুর্বল ছিল না। সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত তারা দেখেছে। দেখেছে কাপুরুষরা মানবতার বিরুদ্ধে কতোটা শত্রুতা করতে পারে ।

মানবতার অপমান আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। যেদিন ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে বিকৃত করে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠন করা হলো এবং তার সঙ্গে জোর করে জুড়ে দেয়া হলো পূর্ববঙ্গকে— আজকের স্বাধীন বাংলাদেশকে । আমরা দেখেছি সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের তথাকথিত জনককে নির্লজ্জের মতো বলতে : উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।

দেখেছি, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষার এই অবমাননার প্রতিবাদে ঢাকায় আমাদের ছাত্রজনতার স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে পাকিস্তানশাহী কিভাবে গুলি ছুঁড়েছিল।

আমরা দেখেছি, বাংলার মানুষ যখন বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ে বিপন্ন, তখন তাদের গলিত লাশের ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানিদের নির্বিকার আনন্দ উল্লাস। তারা সেদিন কেউই এগিয়ে আসেনি দুর্গত মানবতার সেবায়। বরং বিদেশ থেকে যেসব সাহায্যদ্রব্য এসেছে, নিজেদের এলাকায় তা স্টক করেছে, উপদ্রুত বাংলার মানুষের জন্যে নির্ধারিত দ্রব্যের সিংহভাগ নিজেরাই করেছে আত্মসাৎ।

অতি সম্প্রতি আমরা দেখেছি, পৃথিবীর ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা- স্বনির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়াকে দেশের আপামর জনসাধারণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে। বাংলার গণদাবির চাপে তারা দিয়েছিল নির্বাচন। আমরা ভোট দিয়েছিলাম । নির্বাচিত করেছিলাম আমাদের প্রতিনিধিদের। যুদ্ধবাজ ইয়াহিয়া সরকার আমাদের প্রতিনিধিদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে গোটা বাঙালি জাতির ওপর চাপিয়ে দিল গোদের ওপর বিষফোঁড়া— নবতর সামরিক কুশাসন ।

এবং তারা ভেবেছিল, এই বিধান বাঙালিরা মাথা পেতে নেবে। তারা ঘুঘু দেখেছিল-কিন্তু ফাঁদ দেখেনি। আজ তা-ই তারা দেখছে। বাংলার মানুষকে দাবিয়ে রাখার সকল আশাভরসা আজ তাদের ফুরিয়েছে। তারা অবাক হয়ে দেখছে, বাংলার মানুষ আজ আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ। নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের শপথে তারা আজ দীর্ঘসূত্রী প্রস্তুতি নিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আজ ইয়াহিয়া বাহিনীকে তাদের জঙ্গি ছাউনি গুটাতেই হবে। কেননা এই প্রবল প্রতিরোধের মুখে ক্রমেই তাদের এখানে ভাতে-পানিতে মরার অবস্থা হয়েছে।

আমরাও তাদের ছেড়ে দেবো না । প্রতিটি হানদার দুশমনকে আমরা এক-এক করে হত্যা করবো। প্রতিশোধ-প্রতিশোধ নেবো আমরা। ওরা আমাদের যে রক্ত ঝরিয়েছে, সে-রক্তে আজ জেগেছে ঝর্ণাধারা। বাধা পেয়ে সেই ধারা প্রতিদিন ফুলে ফুলে উঠেছে। এবার আমরা পথ পেয়েছি। সে পথে নেমে এসেছে দুর্বার ধারা-বাঁধাভাঙ্গা জলপ্রপাত । এই স্রোতের মুখে ইয়াহিয়া বাহিনীর প্রতিটি হানাদার সৈন্য খতম হতে বাধ্য। প্রতিশোধ-কড়ায়গণ্ডায় প্রতিশোধ নেবার জন্যে উদ্যত আজ বাঙালির বজ্রহাত। আজ প্রতিটি বাঙালি হয়েছে

বিসুভিয়াসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ । ওদের বিলাসের প্রাসাদ ভাঙতে হবে। নইলে যে এখানে গড়ে তোলা যাবে না বাংলার মানুষের শান্তির নীড় পর্ণকুটির। ওদের সকল আধিপত্যের ধ্বংসস্তূপের ওপরেই তো জমে উঠবে আমাদের সৃষ্টি সুখের উল্লাস ।

(রচনা ও প্রচার ৬-৫-৭১। পুনপ্রচার ১৭-৫-৭১ ও ২৬-৬-৭১)

৯। বাংলার কথা (৬)

গায়ের জোরে পাহাড় টলানো যায় কি না জানি নে, কিন্তু কথার তোড়ে মানুষের মন গলানো যে যায় না, এতে কোনো সন্দেহ নেই । বাড়িতে ডাকাত পড়লে, ডাকাতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তার অর্থ ডাকাতের কাজে আত্মিক সমর্থন জ্ঞাপন নয় । বাংলাদেশের শত্রুকবলিত অঞ্চলের জনগণ আজ সামরিক দস্যুদের মোকাবিলায় প্রাণ দিচ্ছে, সহায়-সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে। তার অর্থও নিশ্চয় এই নয়, বাংলাদেশের মানুষ দুর্বৃত্তের শাসন মেনে নিচ্ছে বা নিয়েছে। অথচ তা-ই বলে বেড়াচ্ছে দস্যুশাহী নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র। অবাক হতে হয়, একই মাইকের মুখে তার যে-দেশকে, যে-দেশের জনগণকে দৃষ্কৃতকারী বলছে, তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে বলেও স্বীকার করে নিচ্ছে- আবার সে-দেশের বুকেই তথাকথিত শান্তির রাজত্ব কায়েম হয়েছে, কি করে বলতে পারছে?

বাংলার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দুষ্কৃতকারী, বাংলার জোয়ান ছেলেরা দৃষ্কৃতকারী, বাংলার ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীরা দৃষ্কৃতকারী, তবে বাংলাদেশের কোনো পরিবারটি দৃস্কৃতকারীমুক্ত, তা বুঝিনে! পাকশাহীর দুষ্কৃতি দমন অভিযান কোনো বিশেষ পরিবারটিকে শায়েস্তা না করে পারছে, ভেবে পাইনে। প্রতিটি জনপদ, প্রতিটি পরিবারই আজ তাদের হাতে লাঞ্ছিত। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মায়েরা সন্তানহারা, বৃদ্ধরা সহায় সম্বলহারা, শিশুরা পিতৃহারা- ছিন্নমুল বাসিন্দারা সর্বস্বহারা। লক্ষ লক্ষ সাজানো- গোছানো ঘর-সংসারকে কারা আজ এভাবে বিরান করে দিলো? তারাই আজ চাইছে এখানে শান্তির হাট বসাতে। নিজেদের পঞ্চমুখী কথার তোড়ে দাবি করছে, বাংলাদেশ নাকি 'পাক ওয়াতান' হয়ে গেছে। যতো সব না-পাক দুষ্কৃতকারীদের দেশকে নাকি তারা গায়ের জোরে একেবারে পাক-সাফ বানিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই নাচিজ বাঙালিদেরকে এতো কষ্ট করে, অর্থক্ষয় সৈন্যক্ষয়

অস্ত্রক্ষয় করে জাতে তুলতে চাওয়ার এতো আগ্রহ কেন?

কারণ আমরা জানি। ঢাকা বেতারের মারফতেই আমরা তা জেনেছি। খাজনা আদায়ের নোটিশ প্রচার করেছেন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দেউলিয়া যুদ্ধবাজ সরকার । তথাকথিত দুষ্কৃতি দমনের নামে বাংলাদেশের গৃহতল্লাসির ছলে অসহায় মানুষের ধনসম্পদ, টাকাকড়ি, খাদ্যশস্য লুট করে নিয়েও তাদের গোলাবারুদ আর বুলেট বাবদ যে খরচ হয়েছে/ হচ্ছে, তা কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। বাংলার মানুষের শ্রমের ফসল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ হয়েছে বন্ধ। বিদেশে পাক-টাকার মুল্যমান কমতে কমতে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কোনো কুক্ষণে তারা বাংলার জনমতের বিরুদ্ধে অস্ত্রের হামলা শুরু করেছিল-যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এখন পড়তে হলো নিদারুণ অর্থসঙ্কটে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্যে রক্তচোষারা খাজনার নোটিশ জারি করেছে ‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ঢাকা বেতারের মাধ্যমে। শোনো বাঙালি প্রজারা, আমাদের খাজনা আদায় করে দাও—অতিশীঘ্র-জুন মাসের মধ্যেই। নইলে তোমাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হবে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি, অভাব, অক্ষমতা—কোনো অজুহাতই খাটবে না । আমাদের খাজনা আদায় করে দিতে হবে।

এমন উদাত্ত ফর্মান শুনে বাঙালিদের অন্তরাত্মা বিগলিত হতে পারে বৈকি, যদি কথার তোড়ে মানুষের মন গলানো সম্ভব বলে ঢাকা বেতার মনে করেন। আমরা কিন্তু তা মনে করি নে। আমরা ঘৃণা করি-ঘৃণা করি পাকিস্তানি নরঘাতকদের। ওসব ঘৃণিত হানাদারদের একটা একটা করে হত্যা করেই আমরা প্রতিশোধ নিচ্ছি । কথার তোড়ে নয়, বরং সত্য ন্যায়ের দুর্বার মনোবল আর সাহসিকতায় ।

— (রচনা ৪-৬-৭১ । প্রচার ৬-৫-৭১)

১০। বাংলার কথা (৭)

খেলার মত উঠলে জমে খেলা

কি আনন্দ এ-বেলা ও-বেলা-

এ-বেলা ও-বেলা দুর্দান্ত অনুষ্ঠান প্রচার করে চলেছে পাকিস্তানি দস্যু-বাহিনীকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র। সেই এক শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র। তারই

ক্ষুধার্ত মাইকে ধরে নেয়া হচ্ছে যত্তোসব সুরেলা পাকিস্তানি তারানা, খান্দানি তেজারতি ধর্মকথা, হরেক রকমের বাতচিত, শানদার যুক্তি-কটাক্ষ আর গলদঘর্ম গবেষণার পর্যালোচনা-এমনি কতো কি!

এই তো সেদিন শোনা গেলো একটি তথ্যবহুল আলোচনা—বরং বলা যায়, একটি কবে কোথায়-কি-ছিল না-ছিল, তার সঠিক হিসাব-নিকাশের খতিয়ান। কি ছিল আর কি ছিল না, তার ফিরিস্তিটা অবশ্যই পাকিস্তান রাষ্ট্রের তথাকথিত দুই অঞ্চলের মধ্যেই সীমিত। খতিয়ানটিতে দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল বিষয়ক বৈষম্যগুলো সুন্দরভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, পাকিস্তান সৃষ্টি তেইশ বছরে এর তথাকথিত দুই অঞ্চলের মধ্যে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে বৈষম্য বিদ্যমান থাকার কথা, কিন্তু এই সাধু স্বীকারোক্তির পাশাপাশি এ ব্যাপারে কৈফিয়ৎ সুলভ বিভিন্ন কারণও করা হয়েছে উল্লেখ। আসলে পচা ইতিহাস ঘেঁটে ওসব তথ্য তুলে ধরাই ছিল বেতারের তথাকথিত জাতীয় অনুষ্ঠানটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বাংলার মানুষকে একটু খুশি করার এক জঘন্য ও হীন প্রয়াস, যে প্রয়াসের আজ আর কোনো প্রয়োজনই ছিল না। যে-কোনো বাঙালির একথা শুনে অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পাবে। ১৯৪৭ সালের আগে কোনো দেশের কোনো অঞ্চলে কি ছিল না-ছিল, তার চেয়ে পরবর্তী দুই যুগে কি হতে পারতো না- পারতো, সেটাই হচ্ছে আসল কথা । হিসাব আমরাও জানি । আমরা জানি, আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানেরই পূর্বাঞ্চল ছিল, তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এর কতোটা বৈষম্য গড়ে তোলা হয়েছিল । বিষয় অনুযায়ী উল্লেখ করা যাক :

রাজস্ব খাতে ব্যয় : বাংলাদেশে দেড় হাজার কোটি পশ্চিম পাকিস্তানে ৫ হাজার কোটি

উন্নয়ন খাতে ব্যয় : বাংলাদেশে তিন হাজার কোটি পশ্চিম পাকিস্তানে ৬ হাজার কোটি

বৈদেশিক সাহায্য : বাংলাদেশে শতকরা ২০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৮০ ভাগ

বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি : বাংলাদেশে শতকরা ২৫ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৭৫ ভাগ

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি : বাংলাদেশে শতকরা ১৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৮৫ জন ।

সামরিক বিভাগে চাকরি : বাংলাদেশে শতকরা ১০ জন পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৯০ জন

চাউল মণপ্রতি : বাংলাদেশে ৫০ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫ টাকা

আটা মণপ্রতি : বাংলাদেশে ৩০ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫ টাকা

সরিষার তেল সের প্রতি : বাংলাদেশে ৫ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ২.৫০ টাকা

স্বর্ণ প্রতি ভরি : বাংলাদেশে ১৭০ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৫ টাকা

এখন প্রশ্ন জাগে, আয়-ব্যয়, চাকরি-বাকরি, দ্রব্যমূল্য এসবের বৈষম্যও কি ১৯৪৭ সালের আগেই গড়ে উঠেছিল? আমাদের মনে আছে, বাংলাদেশের মানুষকে বোকা বানাবার জন্যে বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসের ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীরা কিভাবে প্রকাশ করতো । যেমন বলা হতো, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৫টি ট্রাকটর ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১০০ টি হ্যাণ্ড-হো। সংখ্যা হিসাবে ৫ আর ১০০- র দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু তার অন্তরালে ট্রাকটর আর হ্যাণ্ড-হো-র ব্যবধানটিও যে বাঙালিরা বুঝতো না, তা কি করে তারা ভাবতে পারে? পাকিস্তান-বেতারের আলোচ্য অনুষ্ঠানটি প্রচারের উদ্দেশ্য তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে-হাত দিয়ে তারা আমার ভাইকে খুন করেছে, সে হাত আমার মাথায় যতোই বুলিয়ে যাক, ওতে আমাদের মন ভুলবে না । তাদের প্রচার-প্রচারণার খেলা আর জমে উঠবে না, এবং এ কথা দিবালোকের মতো সত্য, যে পাক-পতাকা আমরা পদদলিত করেছি, তা আর আমাদের ছাদে উড্ডীন হবে না— হতে পারে না। বাংলাদেশের পতাকা বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত, এই উষ্ণ রক্ত পাকিস্তানি দস্যুরাই ঝরিয়েছে- এখন গাছের আগা কেটে গোঁড়ায় যতোই পানি ঢালা হোক, বাঙালিদের মন ভোলানো যাবে না, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনো কিছুতেই থামবে না ।

— (রচনা ও প্রচার ৭-৫-৭১)

১১ । আর এক নাৎসিচক্র

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা তোমাদের মনে আছে'? বাংলায় মুক্তিবাহিনীর একটি

শিক্ষাশিবিরে ট্রেনিংরত নব্য যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন একজন ক্যাপ্টেন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়তো কেউই এরা দেখেননি, স্বয়ং এই ক্যাপ্টেনও দেখেননি, কিন্তু সবাই এঁরা যুদ্ধের ইতিহাস পড়েছেন, আর সেই ইতিহাসের কথা মুক্তিবাহিনীর তরুণ জোয়ানদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান সুযোগ্য ক্যাপ্টেন। তিনি বলেন : 'তোমরা নিশ্চয় পড়েছ সেই ইতিহাস, হের হিটলারের বর্বর বিজয়াভিযানের কাহিনী । সারা পৃথিবীর বুকে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিল হিটলার। এক সময় নিজের নাৎসি বাহিনীকে রাশিয়ার ইউক্রেনের ওপর দিয়ে মার্চ করিয়ে দিয়েছিল হিটলার। ইউক্রেনের উর্বর ভূমি, লাল নীল ঘাসফুলশোভিত প্রান্তর, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সাধ্য বা সুকুমার মন হের হিটলারের হয়তো ছিল না, কিন্তু ইউক্রেন তাকে আকৃষ্ট করেছিল। এই বৈদেশিক এলাকাকে জর্মান জাতির আবাসভূমিতে পরিণত করার এক অদ্ভূত চিন্তা খেলেছিল হিটলারের মস্তিকে। সেই চিন্তা হচ্ছে, দলে দলে জর্মান চাষীদের পাঠিয়ে নতুন আবাদ গড়া হবে ইউক্রেনে। রাশিয়ার একটি এলাকায় পত্তন হবে জর্মান সমাজের— সেই সমাজের আচার-আচরণ হবে জর্মান, ভাষা জর্মান। কিন্তু হিটলারের সেই স্বপ্ন কি সফল হয়েছিল? না, বরং তার নাৎসি আধিপত্য আদৌ টিকে থাকেনি। বৈদেশিক এলাকার তো কথাই নেই, হিটলারের নিজের দেশই হয়ে পড়েছিল দ্বিধাবিভক্ত। তোমরা নিশ্চয় জানো সেই ইতিহাস'।

ইতিহাসের এই নজিরটি উল্লেখ করে সেদিন আমাদের মুক্তিবাহিনীর সুযোগ্য ক্যাপ্টেন এ যুগের এক নাৎসি শক্তির প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন। বস্তুত সেই পাকিস্তানি নাৎসি বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করা । জন্যে বাংলার মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। হিটলারের অপকীর্তিকেও ম্লান করে দিয়েছে মানবতার দুশমন ইয়াহিয়াকৃত গণহত্যা। নির্মম এক পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের অগণিত নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষকে এই যুগ-দানব ইয়াহিয়া হত্যা করেছে, সর্বস্বান্ত করেছে। করেছে ঘরছাড়া দেশছাড়া, এবং আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের পাকিস্তানি হানাদারকবলিত অঞ্চলগুলোতে দেখতে পাওয়া যাবে ইতিহাসের এক অপূর্ব পুনরাবৃত্তি। এসব এলাকার আদি বাসিন্দা বাঙালিরা আজ প্রায়ই ছিন্নমূল। তাদেরকে হয় মেরে ফেলা হয়েছে, না হয় বিতাড়িত করা হয়েছে। আর তাদের জায়গায় নতুন পত্তন হয়েছে উর্দু ভাষী লোকদের । বাংলাদেশের পাকিস্তানি অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ব্যবহারিক জীবনের ভাষা হিসেবে উর্দুকে চালু করার আপ্রাণ কোশেশ করা হচ্ছে ।

দোকানপাটের সাইনবোর্ড উর্দুলিপিখচিত করা হচ্ছে।

অর্থাৎ তাহলে আমরা কি হিটলারের পরিকল্পনারই এক নব-রূপায়ণ লক্ষ্য করছি? ইতিহাস সাক্ষী, ইউক্রেনে জর্মান আবাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু বার্থই হয়নি, সকল পরিকল্পনাকে নিদারুণভাবে ব্যাঙ্গ করে হিটলারের স্বদেশভূমিই হয়ে গিয়েছিল দ্বিধাবিভক্ত ।

সেই ইতিহাসকে সাক্ষী করে বলতে চাই, তুমি যা-ই ভাবো, ইয়াহিয়া, জোর জবরদস্তি করে, কৌশলজাল বিস্তার করে কিছুতেই তুমি পারবে না বাঙালির দেশ বাংলাকে বিদেশীদের বাসস্থানে পরিণত করতে। বরং এ রকম উদ্ভট পরিকল্পনা তোমার নিজের এলাকার ওপরেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, বাংলাদেশের জনগণের ওপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে আজ বিশ্বজনমতের চাপে তোমাকে কিভাবে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়েছে!

— (রচনা ৬-৫-৭১। প্রচার ৭-৫-৭১)

১২। ধর্মনিরপেক্ষ সহঅবস্থান

জন্ম আর লালনভূমিতে বসবাসের আগ্রহ ও অধিকার মানুষের সহজাত । লালনভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রার অনুকূল। বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখা মানুষকে নির্ধারিত আলো-বাতাসে, খাদ্য পানীয়ে যেমন অভ্যস্ত করে তোলে, তেমনি রুচিবোধ এবং লোকাচারেও করে তোলে সুসংহত। এ ব্যাপারে ধর্মীয় অনুশাসন বা কর্মজীবনের নিয়মনিষ্ঠা কোনো বাধার সৃষ্টি করে না। ভৌগোলিক পরিচয় মানুষের ধর্মরক্ষার বা কর্ম করার পথে আদৌ অন্তরায় নয়। নিজ নিজ আবাসভূমিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ চিরকাল ধর্মনিরপেক্ষ সহঅবস্থানে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। কেননা কোনো ধর্মই তার ভৌগোলিক সত্তাকে অস্বীকার করেনি। আমি মুসলমান— তার অর্থ, আমাকে বাধ্যগতভাবে কোনো 'মুসলমানিস্তানের বাসিন্দা হতে হবে না। আমি হিন্দু— তার অর্থ, আমাকে বসবাসের জন্যে একটি 'হিন্দুস্তান' গড়ে তুলতে হবে না। তেমনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বসবাসের জন্যে ‘বৌদ্ধস্তান' প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা নেই ।

বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্ম ও লালন ভূমির পরিচয়ে ‘আরবীয়’— তাঁর ভাষা ‘আরবি’। কিন্তু তিনি তো সমগ্র মুসলিম

জাহানেরই নবি-তাঁর মাধ্যমে আরবি ভাষায় নাজেলকৃত পবিত্র কোরান সকল দেশের সকল ভাষাভাষী মুসলামানদেরই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। পবিত্র কোরানে ধর্মনিরপেক্ষ সহ-অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে সূরা আল-কাফিরুনে। অমুসলিমদের উদ্দেশে মুসলমানদের বক্তব্য হিসেবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়। যেমন-

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে-

আমরা তাঁর উপাসনা করি না, যাঁর উপাসনা

তোমরা করে থাকো ।

তোমরাও তাঁর উপাসনা কর না, যাঁর উপাসনা

আমরা করে থাকি ।

আমরা তাঁর উপাসনা করবো না, যাঁর উপাসনা

তোমরা করে থাকো ।

তোমরাও তাঁর উপাসনা করবে না, যাঁর উপাসনা

আমরা করে থাকি ।

তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম,

আমাদের জন্যে আমাদের ধর্ম ।

সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটি সে সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মক্কাবাসী বা আরববাসীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ সহঅবস্থানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। এতে অমুসলিম বাসিন্দাদের আরবভূমি থেকে উৎখাত করার কথা বলা হয়নি।

অথচ আমাদের যুগে পাকিস্তান বলে কথিত একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ঠিক কোনো আদর্শের অনুসারী হয়েছে, তা বুঝি নে। একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার আনুকূল্যে এখন থেকে তেইশ বছর আগে সেই দেশটি দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধানের পূর্ববঙ্গ এলাকাকেও বেঁধে নিয়েছিল রাষ্ট্রীয় বন্ধনে। কিন্তু তখন থেকেই প্রতিমুহূর্তে পূর্ববঙ্গ তথা আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধরা তাদের ভৌগোলিক পরিচয় বাঙালি চেতনাকে

রেখেছে অটুট। এখানে নির্বিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যেমন নিজেদের ধর্মকর্ম করছে, তেমনি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরাও। অতিসম্প্রতি পরিকল্পিতভাবে এই অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছে পাকিস্তানি হানাদার শক্তি । স্বাধীন বাংলাদেশের পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকবলিত এলাকাগুলোতে তারা ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার জন্যে উস্কানি দিচ্ছে এবং এমনকি কোনো কোনো এলাকা থেকে বাঙালিদের উচ্ছেদ করে উর্দুভাষী ও অন্য লোকাচারে অভ্যস্ত বিদেশী লোকদের দিয়ে বসত গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে ।

পাকিস্তানি নাৎসি শক্তির অনুরূপ কার্যকলাপের মধ্যে যে-উদ্দেশ্যই নিহিত থাকুক, তারা একটি ভৌগোলিক পরিবেশকে নিশ্চয় পারবে না পাল্টে দিতে। নিশ্চয় তারা পারবে না ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির জাতীয় সত্তাকে লোপ পাইয়ে দিতে । বাংলার মুক্তিবাহিনীর দুর্বার প্রতিরোধের মুখে তাদেরকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

— (রচনা ৭-৫-৭১, প্রচার ৮-৫-৭১, পুনপ্রচার : ১০-৫-৭১)

১৩। বাংলার কথা (৮)

বালাগাল উলা বিকামালেহি

কাশাফাৎ দুজা বেজামালেহি

হাসুনাৎ জামিইউ খেসালেহি

সাল্লু আলাইহে ওয়া আলিহি ।

আজ পবিত্র ফাতহা-ই-দোয়াজ দাহম, বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও ওফাৎ দিবস। মুসলিম জাহানের প্রতিটি মানুষের কাছে এই দিনটি অশেষ ফজিলতের । অনন্ত অসীম প্রেমময় রসূল করিমের জীবনাদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অনুসরণ করার তাগিদে বিশ্বের মুসলমানরা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্মৃতি-দিবসটি উদ্যাপন করছেন।

“রহমাতুল্লিল আ'লামীন” অর্থাৎ বিশ্বজগতের জন্যে কল্যাণস্বরূপ রসূল করিমের জন্ম ও জীবনী নিয়ে আলোচনা মহফিল, মৌলুদ শরীফ, মুশায়ারা, কাওয়ালি ও নাতে রসূলের অনুষ্ঠান ইত্যাদি আজকের ব্যাপক কর্মসূচি । নবি করিমের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে লাখো সালাম ও দরুদ :

সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ।

এবারের পুণ্যময় ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম বাঙালি মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এমন এক দিনে এসেছে, যখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এ উৎসব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জমে ওঠার অবকাশ নেই। বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আজ এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। বাঙালি নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই আজ মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত । তাদের ওপরে এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এক অসভ্য জল্লাদ শক্তি । ইসলামের নবি যে-গণতন্ত্রের শিক্ষা দিয়েছেন, যে-স্বাধীনতার বাণী-উচ্চারণ করেছেন, তারই চরম অবমাননা করেছে সেই পাকিস্তানি বর্বর শক্তি। তারা বাংলার মুক্তিকামী মানুষের শান্তি সমৃদ্ধির পথকে চায় রুদ্ধ করে দিতে। একদিকে ধর্মভিত্তিক বলে কথিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকমহল নিজেদেরকে মুসলমান বা নবির উম্মত বলে দাবি করে থাকে, অন্যদিকে নির্বিচারে মুসলমান ভাইদেরকে খুন করার জন্যে তারা বাংলাদেশে লেলিয়ে দিয়েছে সশস্ত্র সেনাবাহিনী। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, পবিত্র ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহম উপলক্ষে তারা নিজেদের কড়া পাহারাধীন ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানও প্রচার করছে। সমগ্র বাংলাদেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে নিরস্ত্র জনপদে হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ আর গণউচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে তার পাশাপাশি কি করে যে তারা একটি পবিত্র দিবস উদ্যাপনের ছলনা করতে পারে, ভেবে পাই নে। এ যেন ইয়াজিদের প্রাসাদে 'হায় হোসেন হায় হোসেন' মর্সিয়ার আয়োজন।

গত রাতে ঢাকা বেতার ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশের সর্বত্র নাকি নবি-দিবস উদযাপন করা হচ্ছে । হচ্ছে বৈ-কি! নবি-দিবস উদযাপন করা হচ্ছে, সামরিক পাহারাধীন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের মাইকে সাড়ম্বরে। আর অন্যত্র, অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন রণাঙ্গনে ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা নবতর বদর, ওহুদ ও খন্দকের প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে এই মহান দিবসটি উদ্যাপন করছে। বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা আল্লাহ্র কালামের প্রতি অকৃত্রিম আস্থা রেখেছে। কালামে পাকে, এরশাদ হয়েছে : 'আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

আর (যুদ্ধে) তাদের হত্যা করো, যেখানে তাদের পাও। আর তাড়িয়ে দাও তাদের সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে । আর উৎপীড়ন হত্যার চাইতে নির্মম । ....

...... তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তাদের হত্যা করো।.... .... আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যে-পর্যন্ত না উৎপীড়ন বন্ধ হয়। (সূরা আল বাকারাহ, ১৯০, ১৯১, ১৯৩ আয়াত ।)

উৎপীড়ক আক্রমণকারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা। আর এভাবেই তারা উদ্যাপন করছে নবি-দিবস। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের এই সংগ্রামের আর এক নাম জেহাদ। এ জেহাদে তারা হয় গাজী, নয় তো শহীদ হবার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে যুদ্ধ—এই সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই বাঙালির জন্যে শেষ পর্যন্ত বিজয় এনে দেবে। নবি করিমের পবিত্র আদর্শের উদ্দেশ্যে লাখো সালাম ও দরুদ :

সাল্লেমোয়া কাওমোবাল

সাল্লেআলা সদরিল আমিন

মোস্তাফা মা-জা ইল্লাহ

রাহমাতুললিল আলামিন ।

— (রচনা ও প্রচার ৮-৫-৭১)

১৪ । কবিগুরুর শিলাইদহ

‘পঁচিশে বৈশাখ চলেছে

জন্মদিনের ধারাকে বহন করে

মৃত্যুদিনের দিকে।

সেই চলতি আসনের উপর বসে কোনো কারিগর গাঁথছে

ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়

নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা' ।

মৃত্যুহীন প্রাণের অধিকার নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন—পঁচিশে বৈশাখ। আর সেই মৃত্যুহীন প্রাণ রচিত হয়েছিল তাঁর কবিকীর্তির মাধ্যমে ।

রবীন্দ্র-স্মৃতির অঙ্গনে আজ আমরা অসহায়—

কেননা, কবিগুরু, তোমার স্মৃতিনিকেতন শিলাইদহ কুঠিবাড়িটি আমরা রক্ষা করতে পারিনি। পদ্মা পার হয়ে কুষ্টিয়ার কুমারখালী অভিমুখে যাবার পথে চোখে পড়বে একটি ধ্বংসস্তূপ-পাকিস্তানি দস্যুদের ধ্বংস অভিযানের এক নির্মম স্মারক ।

আমরা তো জানি, আমাদের কাছে শিলাইদহ কুঠিবাড়ির অস্তিত্ব কতো মহান—কতো মনোহর। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের বেশির ভাগ গল্প, ছিন্নপত্রের সমস্ত চিঠি, গীতাঞ্জলির বহু গান এই কুঠিবাড়িতেই হয়েছে রচিত। রবীন্দ্র-যৌবনের হাসি-কান্না আনন্দ-বিষাদ মিশে আছে শিলাইদহের আকাশ-মাটিতে ।

এই কুঠিবাড়িতেই মরমী কবি লালনশাহ-র সঙ্গে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাবের আদান-প্রদান ।

কবিগুরু, তোমার নির্মল স্মৃতিবিজড়িত এই কুঠিবাড়ি পাকিস্তানি দানবি-চক্রের হাত থেকে আমরা রক্ষা করতে পারলাম না ।

অথচ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা সোচ্চার—

কেননা, কবিগুরু, আমরা তো তোমার ভাষার অমর্যাদা করিনি। তোমার ভাষাকে আমরা ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারিতে রক্তের মূল্যে করেছি প্রতিষ্ঠিত। তোমার সঙ্গীতকে আমরা ১৯৬৯-এর গণদাবির মাধ্যমে করেছি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ।

বাংলাদেশের কাব্য-উপন্যাস-প্রবন্ধ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে এসেছে রবীন্দ্রপ্রভাবে অভিষিক্ত। যখনই পাকিস্তানি অশুভ শক্তি রবীন্দ্রবিদ্বেষের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে, আমাদের গণ-আন্দোলন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

আজ বড়ো দুঃসময়ে আমাদের ওপরে এসেছে অনেক আঘাত। এক অতর্কিত হামলার সম্মুখীন আমরা। হামলাবাজদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। আমাদের শহরবন্দর গ্রামজনপদ আজ এক বিস্তৃত রণাঙ্গন ।

রণাঙ্গন থেকে বলছি—

কবিগুরু, চুনসুড়কি-কাঠ-কাঁটাতারের কুঠিবাড়ি দুর্বৃত্তরা ধ্বংস করুক, ওরা ধ্বংস করেছে অসংখ্য শহীদ মিনারও— কিন্তু প্রতিটি বাঙালির অবয়ব এক-একটি জীবন্ত স্তম্ভ । যে পাখি বাংলায় গান গাইবে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ তার

কণ্ঠে বিধৃত থাকবে-যে নদী কুলকুল ধ্বনিতে বইবে, তার বক্ষে উঠবে রবীন্দ্রপ্রবাহ ।

‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ তাই তব জীবনের রথ পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারংবার ॥ '

-(রচনা ও প্রচার ৯-৫-৭১। পুনঃপ্রচার ১২-৬-৭১ ও ৮-৮-৭১)

১৫। মুক্তিযোদ্ধাদের শপথ

সাধারণভাবে বলতে এবং বুঝতে গেলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি প্রত্যেকেই এক- একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ-নারী পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই আজ স্বদেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করার সংগ্রামে কৃতসংকল্প । বাংলাদেশের মানুষ—বাংলাদেশে বা বাঙালি পরিবারে যার জন্ম—তিনি আজ দেশে বা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্যে তিনি প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন ।

বাংলার মায়েরা বড়ো আদরের সন্তানদের পরিয়ে দিচ্ছেন যোদ্ধৃবেশ, বোনেরা ভাইদেরকে অকাতরে বিদায় দিচ্ছে শত্রুসেনার সম্মুখীন হবার জন্যে। বাংলার বৃদ্ধরা তরুণদের উৎসাহ দিচ্ছেন, শত্রুকে ঘায়েল করার জন্যে যোগাচ্ছেন সাহস ও পরামর্শ ।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাংলার শিশুদের মেলা। তারা আজ খেলনা হিসেবে হাতে নিয়েছে কাঠের তলোয়ার, কাঠের বন্দুক।

বাংলার কিশোরকে দেখা যাবে, উঠোনোর মাটিতে কাঠি দিয়ে আল্পনা আঁকছে। সে আল্পনায় ফুটে উঠছে, কাল্পনিক শত্রুসৈন্যের ছবি, যাকে সদ্য গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। কাছেই দেখা যাবে বন্দুক নিশানা করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলার মুক্তিসেনা ।

বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পরম আশা-আকাঙ্ক্ষার ধন তাদের ঘরের ছেলেরা— যারা আজ মুক্তিবাহিনীর এক-একজন বীর জোয়ান হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করছে। প্রত্যেকেই তারা বাংলার অগ্নিসন্তান ।

মুক্তিবাহিনীর শিক্ষাশিবিরগুলোতে দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে বাংলার দামাল

ছেলেরা। এ কিছু গতানুগতিক রিক্রুটিং নয়। এদের বুকের ছাতি মেপে দেখার চেয়ে বুকের বল এবং সৎসাহস যাচাই করা হচ্ছে। যুদ্ধবাজ পাকিস্তানি সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে যদি মৃত্যুবরণই করতে হয়, তাহলে যেন আগেই কয়েকজন শত্রুকে তারা করতে পারে হত্যা। গেরিলা পদ্ধতিতে একাধি শত্রুকে খতম করার পর যদি নিজের মৃত্যু আসে, সে মৃত্যু হবে দেশপ্রেমিকের। সে মৃত্যুতে সুখ আছে ।

মুক্তিবাহিনীর শিবিরে শিবিরে আমাদের নব্য যুবকদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম দেখে আশা-আনন্দেবুক ভরে ওঠে। এরাই তো বাংলার মায়ের আদুরে সন্তান, স্নেহের দুলাল । কিন্তু প্রয়োজনে এরা আজ কতো শক্ত-সমর্থ। কি আশ্চর্য, দেশের শত্রুদের ওরা খুন করতে পারে, দেশকে শত্রুমুক্ত করার যুদ্ধে ওরা অকাতরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, প্রাণ দিতে পারে! এরা কতো নির্ভিক, দুর্বার, দুর্মর!

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শিবিরে রণাঙ্গনে বাংলার স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির প্রশ্নে যে কোনোরকম আপোনহীনতার শপথ নিচ্ছে কি অকুতোভয়ে! কোনোমতেই তারা শত্রুকে ক্ষমা করবে না। যে হানাদার শত্রুরা তাদের মা-বোনকে উৎপীড়ন করেছে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে, লুট করেছে তাদের ধনসম্পদ, তারা ক্ষমার অযোগ্য। তারা ঘৃণার পাত্র। রক্তের বদলে রক্ত নিয়েই উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে হবে আজ তাদের ওপর ।

দেশের নামে, মায়ের নামে, শপথ নিচ্ছে আমাদের নব্যযুবক মুক্তিযোদ্ধারা, বহিঃশত্রু গৃহশত্রু কাউকেই তারা দেবে না রেহাই। শত্রুবাহিনীর সাহায্যকারী বাংলার মীরজাফরদেরকেও তারা দেখাবে না কোনো দয়ামায়া। শত্রুবাহিনীকে তাদের বাঙালিনিধন অভিযানে যে এতোটুকু সহায়তা দিয়েছে, হোক সে নিজের পিতা বা ভাই, সেও শত্রু— তাকেও করতে হবে হত্যা। কি কঠোর শপথবাক্য! এ এক অপূর্ব সৎসাহস— দেখে শুনে আশা-আনন্দে ভরে ওঠে বুক।

— (রচনা ৯-৫-৭১ । প্রচার১১-৫-৭১। পুনঃপ্রচার ২৯-৫-৭১) ১৬।

বাংলার কথা (৯)

বাংলাদেশের বুকে জাঁকিয়ে-বসা যে প্রচার প্রতিষ্ঠান বাংলার গণমানসের কবি বিশ্বকবির জন্মদিনকে বেমালুম উপেক্ষা করতে পারে, সে প্রতিষ্ঠানের নাম 'রেডিও পাকিস্তান ঢাকা'— যার চারধারে পাকিস্তানি নাৎসি বাহিনী রয়েছে সার্বক্ষণিক পাহারায় নিয়োজিত ।

আমরা তো জানি, এমন কোনো বাঙালি শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী নেই, যে বা যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে যে-কোনো রকম শিল্পচর্চা করতে পারেন। বিশেষ, করে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব যা দেশ-বিদেশের সর্বত্রই পূর্ণ মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়, তা রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সাহিত্যের দেশ, কর্মজীবন-নির্বাহের দেশ বাংলার বুকে স্থাপিত সরকারি প্রচার প্রতিষ্ঠানটির অনুষ্ঠানসূচি থেকে এমনিভাবে বাদ পড়বে, এটা কেমন কথা? অথবা এ থেকে আমরা কি বুঝবো?

এই বেতার যন্ত্র থেকেই— পাকিস্তানি নাৎসি বাহিনীর সার্বক্ষণিক সতর্ক পাহারাধীন ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকেই প্রতিদিন প্রচার করা হয়, বাংলাদেশ নাকি ইতোমধ্যেই 'পাক ওয়াতান' হয়ে গেছে এবং এখানকার গণজীবনে নাকি এখন স্বাভাবিক অবস্থা পূর্ণমাত্রায় ফিরে এসেছে। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার এলান শেষ হবার পরপরই আবার বিভিন্ন শহরের সান্ধ্য আইনের মেয়াদ এবং কড়া সামরিক আইনের ব্যাপক নির্দেশনাগুলো ঘোষণা করা হয়। বলিহারি স্বাভাবিক অবস্থা ।

বাংলাদেশের বুকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবে আক্রমণকারী তস্করররা? স্বাভাবিক অবস্থা তোমরা ফিরিয়ে এনেছ সেসব হতভাগ্যের জীবনে, যারা নিরস্ত্র ছিল এবং তোমাদের অতর্কিত হামলার মুখে চিরতরে নির্জীব নিথর হয়ে ঢলে পড়েছে । স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে শুধু বাংলার বেসামরিক জনপদের সেই সব মানুষদের জীবনেই, যারা হত্যাকারীদের হাতে নিহত হয়েছে। অস্বাভাবিক অকালমৃত্যুর মাধ্যমে তারা অন্তিম স্বাভাবিকতা লাভ করেছে ।

এবং অন্যদিকে যারা বেঁচে আছে, তাদের জীবনে এ অবস্থায় কেমন করে ফিরে আসবে স্বাভাবিকতা? বাংলাদেশের জনজীবনের পূর্ণ স্বাভাবিকতা একমাত্র যে অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে, এ দেশ থেকে শত্রুদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন। অর্থাৎ যখন বাংলাদেশের মানুষ জীবনের সর্বস্তরের সমৃদ্ধি ফিরে পাবে।

যেখানে চোখের সামনে দেশের সম্পদের ধ্বংসস্তূপ, জনপদকে করা হয়েছে বিরান, মানুষের লাশ এখানে-ওখানে ছড়ানো, যেখানে বাড়িতে বাড়িতে লুটতরাজ অনাচার চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মৌলুদ মহফিলের অভ্যাগতদের ওপর— নমাজ পাঠরত ধর্মপ্রাণ মানুষের ওপর গুলি নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং সবার ওপরে

যেখানে আমাদের মুক্তিবাহিনী দুর্বৃত্ত শত্রুসৈন্যদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে চলেছে, এ অবস্থায় কি করে এখন বাংলাদেশে জনজীবনের স্বাভাবিকতা ফিরে আসার কথা কল্পনা করা যায়?

কল্পনা আমরা করতে পারি না— কিন্তু আগেই যা বলেছি, বাংলাদেশের বুকে জাঁকিয়ে-বসা যে প্রচার-প্রতিষ্ঠান পঁচিশে বৈশাখকে নিজেদের অনুষ্ঠানসূচি থেকে বেমালুম বাদ দিয়ে দিতে পারে, সেই সামরিক প্রহরাধীন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কল্পনাশক্তি এবং কল্পনাবিলাস সীমাহীন। আমরা জানি, ঐ বেতার কেন্দ্র যে-সব অসহায় বাঙালি শিল্পীকে বেয়নেটের মুখে তোতাপাখি বানিয়ে রেখেছে, তাদের জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসা একটি অবান্তর কথা । খাঁচার পাখির কণ্ঠে কখনো মুক্ত বিহঙ্গের কলঙ্গীত শোনা যেতে পারে না। যদি তা সম্ভব হতো, তাহলে পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পড়ে যেতো ঢাকা বেতার কেন্দ্রের দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে। এবং তার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিকতা ফিরে আসার এক দৈনন্দিন মিথ্যা প্রচারণা বিশ্বের দরবারে আকস্মিকভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারতো ।

(রচনা ও প্রচার ১১-৫-৭১)

১৭। বাংলার কথা (১০)

বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণ করার জন্যে পাকিস্তানি দস্যুশক্তি এখন উঠে-পড়ে লেগেছে। কল্যাণের সবক দেয়া হচ্ছে হিজ মাস্টার্স ভয়েস বেতার-যন্ত্রের মাধ্যমে ।

বেতার-যন্ত্রের ডায়াসে এসে দাঁড়ানো এক-ডজন লাঠিয়াল শিক্ষক— তাঁরা লেকচার দেন, আর তা শুনে অগণিত জ্ঞান অর্জন করে অজ্ঞ মূর্খ বাঙালিরা। তবু ভালো ছিল, লঠিয়াল শিক্ষককুল এককালে যে-কোনো মূল্যে ভোট আদায় করে জন-সমর্থনের 'খেল' দেখাতেন। কিন্তু এবারে অন্য রকম। এবারে তাঁরা কেউই সাম্প্রতিক নির্বাচনে লাঠির খেলায় একটুও সুবিধা করতে পারেননি। এবারের লাঠালাঠিতে তাঁদের হাতের লাঠি ভেঙে টুকরো টুকরো খাটো হয়ে পড়েছিল। সেটাকেই ওরা এখন খুঁটা বানিয়ে নিয়েছে । আর এখন ওরা খুঁটার জোরে চলছে, নাচছে, কুদছে। সেই যে বচন :

‘ছাগল নাচে খুটার বলে

ধমকে হাঁটে ন্যাকের বলে ।'

‘ন্যাক' মানে সোয়ামী প্রভু। পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গি প্রভুদের ‘তাকদে' এসব কদাকার পদলেহনকারী আজ বলীয়ান। ওরা আজ বেতারের মাইকে ধর্মকথা বলে বেড়ায় ।

আমাদের শুধু ঘৃণা পায় । সীমাহীন ঘৃণা । ঘৃণা পায়, যখন বাঙালিদের উকিল সেজে বেতারে বাজখাই গলাবাজি করতে শুনি বাংলার কুলাঙ্গার ফ-কা-দের। সীমাহীন ঘৃণা পায়, যখন শুনি ওরা বাংলার মানুষের কল্যাণের কথা বলতে এসেছে।

নিঃসন্দেহে মহানুভবতা। কেননা এই তো কিছুদিন আগেই বাংলার মানুষ ওদের ভোট না দিয়ে চরম অপরাধ করেছে— সেই অপরাধের শাস্তির বদলে ওরা আজ দস্তুরমতো কল্যাণের বাণী শোনাচ্ছে। কল্যাণের বাণী শোনাচ্ছে সামরিক কড়া পাহারাধীন ঢাকা কেন্দ্রের মাইকে ।

কিন্তু কেন? কেন এবং কাকে শোনানো হচ্ছে এই বাণী? পশ্চিম পাকিস্তানি তস্কর সৈন্যদের বাঙালি নিধনযজ্ঞে যারা ইন্ধন যোগায়, তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় শহর- গ্রামজনপদের অলিতে গলিতে বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করার জন্যে, তাদের মুখে তো কল্যাণের কথা শোভা পায় না ।

তোমাদের কথায় বাংলার মানুষের মন গলবে না। আজ বড়ো দুঃখেও ভাইহারা, বন্ধুহারা, সহায়-সম্বলহারা বাংলার সর্বহারা মা-বোনেরা তোমাদেরকে শুধু অভিশাপ দেবে, বদদোয়া দেবে। তবে হ্যাঁ, খুশি হবে তোমাদের ওপর তোমাদের ঐ জালিম প্রভুরা, আর তাতেই তোমরা হবে কৃতার্থ। যেমন সেই বচন :

‘কর্তায় বলে বাঁদীর ভাই

আনন্দের আর সীমা নাই ।'

সেই সাময়িক আনন্দেই তোমরা মজে থাকো । কিন্তু বাংলার বিক্ষুব্ধ মানুষের কল্যাণ করার জন্যে এক পা-ও এগিয়ে এসো না ।

বাংলার কল্যাণ, বাঙালির কল্যাণ করার মালিক বাংলার আপামর জনসাধারণ।

তারা আজ স্বদেশের মানসম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করবে। কোনোক্রমেই তারা নতিস্বীকার করবে না পাকিস্তানি পশুশক্তির কাছে।

বাংলার মানুষকে দুর্ভিক্ষের— মহামারীর কবলে ফেলে, সামরিক বাহিনীর ব্যূহবন্দি করে, নগ্ন নির্লজ্জ লাঠিয়ালের মুখে কল্যাণের বাণী শুনিয়ে তার মুক্ত স্বাধীন অন্তরাত্মার ওপরে 'আছর' করা যাবে না। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে আজ সে দীক্ষিত। সেই মন্ত্রে সে আজ এ দেশ থেকে পাক-ওয়াতানের প্রভাবকে ভূতছাড়া করেছে।

— (রচনা ও প্রচার ১৩-৫-৭১)

১৮। বাংলার কথা (১১)

পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য এক নয়। যে-অঞ্চলে যে-খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশি, সাধারণত সে-অঞ্চলের মানুষ সেটাকেই প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। চাল, গম, বরবটি ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্যশস্য এক এক দেশের মানুষের কাছে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক প্রধান খাদ্যেরই রয়েছে বিকল্প। খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে যে-কোনো অঞ্চলের মানুষই বিকল্প খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অজন্মা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদির ফলে উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্যঘাটতি হয়েই থাকে। এছাড়া তেইশ বছরের কুশাসন আমলে বাড়তি মুনাফার জন্য বাংলাদেশের চাল বিদেশে চালান দিয়ে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীরা যে বাঙালিদেরকে বিকল্প প্রধান খাদ্য হিসেবে গমের আটা ইস্তেমাল করাবার কোশেশ করেছিল, সেটাও ছিল প্রধান খাদ্যের বিকল্প গ্রহণের ব্যাপারে বাঙালিদের জন্যে একটা বাধ্যবাধকতা।

বাংলার কথা বলতে গিয়ে এতোক্ষণ আমরা কিছু ভূমিকা উপস্থাপন করলাম। এবারে আসল কথায় আসি। সেদিন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একটি কম্পোজিট অনুষ্ঠানে কয়েকজন মহিলার মধ্যে বাতচিত-এর ভেতরে বিকল্প খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে কিছু সদুপদেশ শোনা গেল। অনুষ্ঠানের অমুক-তমুকের মায়েদের উদ্দেশ্যে নেত্রীর উপদেশটি ছিল, ভাতের বদলে যেন তারা শাকসব্জি খেতে শুরু করে। ওতে পেট ভরবে, আবার বাড়তি প্রোটিনও পাওয়া যাবে,— যার ফলে স্বাস্থ্যের অশেষ উপকার হবে ।

বেতারের অন্তরঙ্গ বাতচিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটা করে এই সদুপদেশ এ সময় কেন দেয়া হচ্ছে, আমরা সেটাই এখন যাচাই করে দেখতে চাই। এই তো সেদিন পাকিস্তানি দস্যু-সর্দার ইয়াহিয়া জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের বাংলাদেশের জন্যে খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাবার স্বতঃস্বেচ্ছ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিষ্কার বলে দিলেন : ধন্যবাদ, সেক্রেটারি সাহেব, আমাদের খাদ্যবস্তুর অভাব নেই ।

সত্যি তো, রক্তপিপাসু পশ্চিম পাকিস্তানিদের অভাব কি? বাঙালির রক্ত চুষে বাঙালির মালামাল লুট করে তারা তো বেশ হাতের সুখ মনের সুখ মিটিয়ে নিচ্ছে হচ্ছে— পরিতৃপ্ত, লাশকাটা-ঘর বাংলার মাঠঘাট প্রান্তরে আজ শকুনিদের মচ্ছব । কোনো অভাব নেই। অভিযোগ নেই। আমরাও জানি, আমাদের কোনো অভাব নেই। দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অজন্মা আমরা অনেক দেখেছি— অনেক সয়েছি। আবার দেখবো এবং সইবো । আমাদের আছে অশেষ সহ্যগুণ এবং অনন্ত মনোবল । মনোবল আর ধৈর্যস্থৈর্যের অভাব নেই বাঙালির। আর অভিযোগ? কার কাছে করবো আমরা অভিযোগ? অভিযোগ করা যায় আইনের দরবারে। অভিযোগ চলতে পারে বিচারকের সমক্ষে । যেখানে আইন নেই, প্রশাসন নেই— সর্বত্র এক অসম্ভবরকম অচলাবস্থা, সেখানে বাঙালিদের কোনো অভিযোগের কারণই থাকতে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ আজ আত্মনির্ভরশীল । তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অচিরেই তারা আদায় করে নেবে। কোনো দস্যু-সর্দারের সুপারিশ বা সদুপদেশ তারা শুনতে চায় না। একদিকে বিশ্ববাসীকে নিজেদের বর্বরোচিত কৃতকর্মের অশুভ প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ বাংলাদেশে চরম খাদ্যাভাবসৃষ্টির ব্যাপারে জানতে না দেবার হীন প্রচেষ্টা, অন্যদিকে বিকল্প খাদ্য গ্রহণের জন্যে বাংলার মানুষকে সদুপদেশ দেয়া কোনো কিছুই আজ আমরা গ্রাহ্যই করি না। আমরা যা বুঝি, আমাদের ধানের গোলা ডাকাতে লুঠে নিয়েছে, আমাদের ঘরে চাল বাড়ন্ত। আমরা এখন লতাপাতা যা- ই খাই, আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করবো। এজন্যে বেতারের নগ্ন নির্লজ্জ মাইকের দৌরাত্ম্যে চটুল চতুর সদুপদেশ নিতান্তই অবাঞ্ছিত।

(রচনা ও প্রচার ১৪-৫-৭১)

১৯।মুক্তিযুদ্ধে আত্মনির্ভরশীলতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আজকের এক জীবন-জিজ্ঞাসা। এ যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে সবাই একমত— বাংলাদেশ থেকে এ পর্যায়ে আজ হোক কাল হোক,

শত্রুবাহিনীকে তাদের বর্বর জঙ্গি হাত গুটাতেই হবে। কিন্তু কি উপায়ে? কেউ কেউ বলে থাকেন, আমাদের স্বপক্ষে ক্রমেই বিশ্বজনমত জোরদার হচ্ছে। অচিরেই তার প্রভাবে এ যুদ্ধের সমাপ্তি অর্থাৎ বাংলার মানুষের বিজয় আসবে। কেউবা বলছেন, আমাদের নবগঠিত গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকার শিগগিরই বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর স্বীকৃতি পাবেন এবং আমরা যুদ্ধ সরঞ্জাম সাহায্য পাবো। তা-ই দিয়ে বিদেশী সৈন্যদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবো। এ ছাড়া এ রকমও কেউ কেউ বলেছেন— যেমন, যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে করতে অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তান ইতোমধ্যেই দেউলিয়া হয়ে পড়েছে । খরচ চালাতে না পেরে তারা নিজে থেকেই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। এভাবে অবশ্যই সূচিত হবে আমাদের বিজয় ।

উল্লেখযোগ্য যে, এই বক্তব্যগুলো একটি যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর নয়— নয় কোনো মুক্তিযোদ্ধার ।

বাংলার মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক সৎসাহসের এক-একটি জীবন্ত প্রতীক। তারা বিশ্বজনমত বা কালের প্রবাহের চেয়ে নিজেদের কার্যক্রমের ওপরেই সর্বাত্মকভাবে নির্ভরশীল। তারা বিশ্বাস করে একজন মুক্তিযোদ্ধার কথায় : আমরাই যুদ্ধ করে শত্রুকে হটাবো। আমাদের স্বাধীনতাকে আমরাই নির্বিঘ্ন করবো। পাকিস্তানি দস্যুসৈন্যদের হামলাকে আমরা প্রাণপণে প্রতিরোধ করে চলেছি। তারা সামরিক শিক্ষায় যথেষ্ট পারদর্শী এবং শক্তিশালী যুদ্ধ-সরঞ্জামের অধিকারী হয়েও আমাদের কাছে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বেদম মার খাচ্ছে। বাংলাদেশের যেখানেই তারা খাঁটি গেড়ে বসুক, বিজয়ের উল্লাস করার অবকাশ তাদের নেই— প্রতি মুহূর্তেই তারা সন্ত্রস্ত।

আমরা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছি। যতোই আমরা যুদ্ধবিদ্যায় বা অস্ত্রসজ্জায় স্বল্পপটু বা অল্পসজ্জিত হই, তবু আমাদের সৎসাহস ও দেশপ্রেমের কাছে ওরা প্রতি মুহূর্তেই নাজেহাল হতে বাধ্য। আমরা তো কেউ মাসোহারার ভিত্তিতে যুদ্ধ করার জন্যে নিযুক্ত হইনি । আমরা তো কেউ যুদ্ধবিদ্যাকে জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন করিনি । আমরা কোনো সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে যুদ্ধ করছি না । আমরা বৈদেশিক এলাকার ধনসম্পদ লুট করার জন্যে শুরু করিনি যুদ্ধ-অভিযান। আমাদের এ যুদ্ধ জীবনজয়ের— আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার। স্বদেশভূমিতে সহজ সমৃদ্ধ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্যেই আমাদের এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের মা-বোনের ইজ্জত। এ যুদ্ধের ওপর

নির্ভর করছে একটি জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ।

আর আমাদের এ যুদ্ধের প্রতি রয়েছে বাংলার গণমানসের অকুণ্ঠ সমর্থন— বাংলার স্নেহময়ী মা-বোনের অশ্রু আশিস।

বিশ্বজনমত বা সাহায্যের চেয়ে অনেক অনেক বড়ো তাই আমাদের কাছে আমাদের আত্মশক্তি । প্রতিটি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা আত্মশক্তি আর আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ । তাদের দেশ থেকে তারাই বিতাড়িত করবে দুর্বৃত্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে । বাংলার মুক্তিযোদ্ধারাই করবে বাংলাদেশের জনজীবনকে স্বাধীন সমৃদ্ধ । দেশের স্বাধীনতা কারো দান হিসেবে গ্রহণ নয়, বরং শরীরের উষ্ণ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করাই বাংলার মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্য ।

- (রচনা ১৪-৫-৭১। প্রচার ১৫-৫-৭১। পুনঃপ্রচার ১-৬-৭১)

২০। বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি

সেকালের মীর জাফরের জীবনের করুণ পরিণতির কথা আমরা শুনেছি। বড়ো সাধের মনদ থেকে অপসারিত এবং শেষ জীবনে কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত মীরজাফরের অন্তিম অনুতাপ বাংলার মানুষের মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির উদ্রেক করেনি। কেননা নিজের কৃতকর্মের দ্বারা সে বাংলার মানুষের অশেষ ঘৃণা কুড়িয়েছিল। যেখানে ঘৃণা, সেখানে দয়ামায়ার অবকাশ থাকে না ।

আর সে জন্যেই বোধ হয়, আমরা যখন শুনি, কোনো পদলেহী কুকুর মুনিবের পদাঘাত খেয়েছে— তখন আমাদের আফসোস হয় না। তবে আমরা একটু অবাক হই, যদি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি খুব দ্রুত ঘটতে দেখি।

এই তো মাত্র মাস দেড়েক-দুয়েকের ব্যাপার, যখন থেকে বাংলাদেশে এক পাশবিক শক্তির নির্মম বর্বরতা শুরু হয়েছে। আর সেই শক্তিমন্ত প্রভুদের পদসেবায় নিয়োজিত হয়েছে বাংলার কুলাঙ্গার কতিপয় ইতর জীব, পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞে ইন্ধন যোগানো এবং বিনয়াবনত আনুগত্য দিয়ে বিদেশি প্রভুদের মন-মেজাজকে ‘খোশ' রাখাই হচ্ছে যাদের কাজ ।

এরা হচ্ছে তারাই, যারা সাম্প্রতিক নির্বাচনে নিজ নিজ এলাকায় ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে হয়েছিল চরমভাবে উপেক্ষিত। এরা হচ্ছে তারাই, যারা ‘মৌলবি' ‘চৌধুরি’ ইত্যাদির পরিচয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি খান-খানানদের ধামাধারা ।

সেদিন জনমতের কাছে উপেক্ষা লাভ করে মুখে চুনকালি মেখে এসব শেয়ালরা গর্তে ঢুকেছিল । এমন সময় এসেছিল এক নিকষ অন্ধকার কালরাত্রি পঁচিশে মার্চ। সেই নির্মম গভীর রাতে অতর্কিত কামানের গোলায় যে শব্দ উঠেছিল, সেই শব্দই তাদের কানে বেজেছিল 'হুক্কাহুয়া' হয়ে। আর তাতেই গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ফ-কা- ফরিদা শেয়ালরা । মুহূর্তে ওদের ঘাড়ের পশম খাড়া হয়ে উঠেছিল । শিকারি জানোয়ারের মতো। কেননা এতোদিনে তারা বাংলার ভোটারদের ওপরে প্রতিশোধ গ্রহণের মোক্ষম সুযোগ পেয়েছিল।

সেই শোধ তারা নিতে লাগলো সুদে-আসলে কড়ায় গণ্ডায়। বাংলায় দেশপ্রেমিক স্বাধীনচেতা আত্মসচেতন মানুষের ঘাতক পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে তারা “জ্বি- হুজুরে'র মহড়া দিতে লাগলো । বাংলাদেশ থেকে বুদ্ধিজীবী ও যুবসমাজকে নির্মূল করার অমানুষিক অভিযানে তারা দুর্বৃত্তদের সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করলো। ইসলামের পবিত্র নাম দিয়ে তারা বাংলার বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের মনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে সচেষ্ট হলো। এসব শয়তানরাই জিন্নাটুপি মাথায় দিয়ে সতী-সাধ্বী বাঙালি ললনাদের ওপর পাকিস্তানি তস্কর সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য পরম কৌতূহলের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগলো ।

আবার এই বদছুরত ফা-কা-ফরিদার দলই বাংলাদেশের মানুষের লাশের ওপর তথাকথিত শান্তি কমিটি গঠন করে নিজেদের খান্দানি প্রভুদের তাঁবেদারির আর এক জঘন্য কীর্তি স্থাপন করলো। শান্তি কমিটির নামে বাংলার শত্রুকবলিত অঞ্চলগুলোতে মানুষ হত্যা ও ঘরবাড়ি লুট করার নিত্যনৈমিত্তিক কাজে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি জানোয়ার সৈন্যদের গাইড হিসেবে কর্মতৎপর হয়ে উঠলো।

কিন্তু বাংলাদেশ ও বাঙালিদের সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও যেন নয় সুদূরপরাহত। এসব পা-চাটা মৌ-লোভীরা ইতোমধ্যেই তাদের বিদেশি ‘বাবাজি’দের হাতেই কিছু উত্তম-মাধ্যম লাভ করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ যার জন্যে তারা চুরি করলো, সে-ই এখন তাদের চোর বলবে— অনেকটা এ-রকম অবস্থা।

মাত্র কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা বলি। ঢাকায় রাস্তায় টহলদার পাকিস্তানি সৈন্যরা অপমান করেছিল একজন তথাকথিত শান্তি কমিটির সদস্যকে। সদস্যটি নিজের দাসানুসসুলভ পরিচয় দিয়েও ‘চুপরাও শুয়র' ইত্যাদি পাকিস্তানি সাধু-সম্ভাষণ লাভ করেছিল। তারপর বিষয়টি অনুযোগ হিসেবে

পেশ করেছিল খাদেমে কওম মৌলবি ফরিদের খেদমতে। মৌলবি ফরিদ আর কি করেন— ছুটে গেলেন এর একটা বিহিত করার সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাতে বিদেশি দস্যু সর্দার টিক্কা খানের প্রাসাদে।

: এ কেমন কথা, হুজুর। আমাদের শান্তি কমিটির সম্মানিত সদস্যের সঙ্গে আপনার চর দুর্ব্যবহার করবে কেন?

এরকম অভিযোগ টিক্কা খানের কাছে নিতান্তই অবাঞ্ছিত । সে বলে উঠেছিল : কেয়া কাতা তুম, ইডিয়েট? নিকাল যাও ইহাঁসে ।

মৌলবি ফরিদকে 'জ্বি-হুজুর' বলে কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তার কানে এসেছিল এক হুকুমনামা—

দস্যু-সর্দার তার কোনো অনুচরের উদ্দেশে বলছে : এসব ইডিয়েটদের আমার এজাজত ছাড়া আন্দারে আসতে দেবে না ।

ঘটনাটি এখানেই শেষ । কিন্তু এই তো কেবল শুরু। তবু সেকালের মীরজাফরদের তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হয়েছিল বেশ একটু ধীরে সুস্থে। কিন্তু আজকের মীরজাফরদের শাস্তি ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। কারণ বোধ হয়, ইতিহাসের মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল একজন নবাবের সঙ্গে। অন্যদিকে আজকের ফা- কা-ফরিদারা বিশ্বাসঘাকতা করছে একটি জাতির সঙ্গে, সাড়ে সাতকোটি কৃষক শ্রমিক মেহনতি নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধের সঙ্গে। এদের ওপর বাংলার মা-বোনের বুকভাঙা অভিশাপ— এদের ওপর আল্লাহর গজব ।

(রচনা ১৫-৫-৭১। প্রচার ১৬-৫-৭১)

২১। বাংলার কথা (১২)

পাকিস্তান বেতারের খবরে প্রকাশ, লাহোরের চারটি পত্রিকার সম্পাদকদের বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে বিচার বসেছে। কারণ এসব পত্রিকায় নাকি রাজনৈতিক দলমত নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে— যা পাকিস্তানের তথাকথিত প্রশাসনের জন্যে অশেষ ক্ষতিকর হয়েছে।

এ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য অথবা আমরা যা বুঝতে পারি, তা হচ্ছে করাচি- লাহোর-রাওয়ালপিন্ডি প্রভৃতি শহরে সম্ভবত এতোদিন কিছুটা

গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বিরাজ করাছিল এবং এখন থেকে আর তা থাকবে না। বাংলাদেশের অধিকৃত শহরগুলোতে যেমন জঙ্গি কর্তৃপক্ষ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে, সেই একই অবস্থা হয়তো শিগগিরই এসে যাচ্ছে খাস পাকিস্তান মুলুকের শহরগুলোতেও। পত্রপত্রিকায় এখন থেকে আর নিজস্ব মতামত অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করা চলবে না । সামরিক বিভাগ যা যা ছাপতে বলবে, তাই দিয়ে পত্রিকার কলাম ভর্তি করতে হবে । ঠিক যেমন শত্রু-অধিকৃত ঢাকা শহরের পত্রিকাগুলোর অবস্থা। ক্ষুদ্র বা নিয়ন্ত্রিত কলেবর পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এক পশুশক্তির অপকর্মের স্বপক্ষে নানা কথা । অর্থাৎ দুর্বৃত্তদের আত্মপ্রশংসামূলক ডিকটেশন ঢাকার পত্রপত্রিকায় এসব প্রকাশ করিয়ে আবার বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ঘটা করে প্রচার করানো হচ্ছে নিয়মিত। যেমন, ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠানে সেদিন একটি পত্রিকার মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রচারিত হলো, পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের সাম্প্রতিক পত্রের জবাবে লিখেছিলেন, পূর্ববঙ্গের জন্যে আপাতত নাকি কোনোরকম সাহায্য সামগ্রীর প্রয়োজন নেই। পরে কখনো প্রয়োজন দেখা দিলে জানানো হবে এবং তা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে— কেননা তারা নাকি গেলোবারের সাইক্লোনে উপদ্রুত পূর্ববঙ্গের উপকূল এলাকায় রিলিফ বিতরণের কাজ করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে...ইত্যাদি ।

এ' রকম একটা ডাহা মিথ্যা কথা লিখে জাতিসংঘকে ভোলাবার চেষ্টা করা হলে আমাদের বলবার কিছু সুযোগ ছিল না । কিন্তু সেই জবাবি পত্রের কথা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় প্রকাশ এবং পত্রিকার উদ্ধৃতি হিসেবে বেতারের অনুষ্ঠানে প্রচার করার ধৃষ্টতাকে কি বলা যায়? বলা যায় ছিচকে চোররা লুকিয়ে চুরি করে— কিন্তু খুনি তস্কররা প্রকাশ্যেই করে থাকে।

বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় সেবারে যে ভয়াবহ সাইক্লোন হয়ে গেলো, তখন দুর্গত মানবতার সেবায় এসব নিচাশয়রা কোথায় এগিয়ে এসেছিল বা কি করেছিল, তা সবাই আমরা জানি। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারও উড়ে আসেনি সেদিন উদ্ধারকার্যে। বাংলার জননেতারা সেদিন বিদেশি রাষ্টগুলোর কাছে হেলিকপ্টার ও অন্যান্য সাহায্য ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হারামখোরেরা যা করেছে, তাও সবাই জানে। দুর্গতদের জন্যে দেশ-বিদেশ

থেকে যেসব সাহায্য এসেছে, সাহায্য তহবিলে যে টাকা সংগৃহীত হয়েছে সেসব বহুলাংশে নিজেদের ভোগে লাগিয়েছে, সাহায্য তহবিলের টাকায় করেছে ব্যবসা ।

এসব কারো অজানা নেই। কাজেই নিজেদের নগ্ন আয়ত্তাধীন পত্রপত্রিকায় বিকৃত তথ্য প্রকাশ করে এবং বেভারে বানোয়াট প্রচার প্রচারণা চালিয়ে এরা শুধু বাংলার গণমানসের কাছে নিত্য নিত্য নিজেদের মোনাফেক আর মিথ্যাবাদীর পরিচয়ই দিয়ে যাবে। বেতারের অপপ্রচার আর বাংলার মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারবে না কিছুতেই ।

(রচনা ও প্রচার ১৬-৫-৭১)

২২। বাংলার কথা (১৩)

বাংলার নায়ের মাঝিরা জানে জোয়ারভাঁটার কোনো পর্যায়ে নদীতে পাড়ি জমাতে হয় । বাংলার গাঁয়ের চাষীরা জানে কোনো শস্যবীজ বপনের মৌসুম কোনোটি ।

নায়ের মাঝি গাঁয়ের চাষীদের এই জ্ঞান বাস্তব— এ তাদের হাতে-কলমে শেখা অভিজ্ঞতা— তাদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞান।

এ ছাড়া এসব ক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষারও রয়েছে অবকাশ। আবহাওয়া-বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা এবং পদ্ধতিগত সংস্কার বা উন্নয়ন-পরিকল্পনাও বিশেষজ্ঞরা প্রণয়ন করে থাকেন ।

একজন গ্রামবাসী চাষী তাঁর কৃষক পিতার কাছ থেকে হাতে-কলমে যে কাজ শিখেছেন এবং সে অনুযায়ী চাষাবাদ করছেন, তিনি কৃষিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তাঁর কাজের আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারেন। যে কোনো উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উন্নত বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলো জনগণের কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয় ।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একটি বিশেষ কম্পোজিট অনুষ্ঠান ‘ক্ষেতে খামারে’-এর মাধ্যমে সরস কথোপকথনের আকারে কৃষিজীবীদের জন্যে উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ বা তথাকথিত ‘অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে'র ব্যাপারে তথ্যাবলী প্রচার করা হতো ।

বর্তমান সময়টি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের এক চরম দুর্দিন। এ কেন্দ্রটি এখন পাকিস্তানি জঙ্গি বাহিনীর কড়া পাহারাধীন। নিত্য নিত্য অসংখ্য বানোয়াট তথ্য আর বাংলার গণবিরোধী কথা প্রচারের কাজে এখন এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন সমগ্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বিরাজ করলেও সে ব্যাপারে এ কেন্দ্রের কোনো অনুষ্ঠানে স্বীকারোক্তি থাকে না। এরা শুধু তথাকথিত জনজীবনের স্বাভাবিকতার উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা তথ্যাবলী প্রচার করে থাকে ।

বর্তমান দুর্দিনে— আমরা আগেই একদিন বলেছিলাম, ঢাকা বেতারের অসুবিধার অন্ত নেই। পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মাচারীর অভাব— রাজধানী শহরে নেই জ্ঞানীগুণী বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ক উপদেষ্টা বা অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নির্ধারণের পরামর্শদাতারা কেউ নেই। এবং সে জন্যেই সম্ভবত পাট বোনার মৌসুম কবেই শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঢাকা বেতারের 'ক্ষেতে খামারে' অনুষ্ঠানে সেদিন চাষীর ভূমিকায় অভিনয়কারীর মুখে শোনা গেলো পাট বোনার খবর । বলা হলো পাটের জমিতে চাষ দেয়া হয়েছে, পাট বোনা হচ্ছে বা হবে ইত্যাদি উদ্ভট কথা ।

ভেতরের কারণটা আমরা ঠিকই আঁচ করতে পারি। প্রথম কথা হচ্ছে, চাষীর ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী শিল্পী এবং অনুষ্ঠানটির পরিচালক এঁরা কেউ সত্যিকারের কৃষিজীবী নন এবং যে-বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আলাপ-আলোচনা প্রচার করতে আদিষ্ট, সেটার ব্যাপারে বাস্তব তথ্য বা গ্রামীণ এলাকার অবস্থা সম্পর্কে জেনে নেবার সুযোগ তাঁদের নেই । পাট বোনার সময় কবেই চলে গেছে, তা সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত শহরের বন্দিগৃহে বসে তারা কি করে জানতে পারবে। তারা শুধু পাকিস্তানি তস্করদের হুকুম পালন করে যাবে। হুকুম জারি হয়েছে, তোমাদের দেশের চাষাভূষারা যেন এখন জোরেসোরে পাটের চায় করে, এজন্যে তাদের উৎসাহ দাও। পাট ছাড়া আমাদের চলবে কি করে! ধান-গমের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা গমের আটা খাই— গম আমাদের দেশেই হয়। আমাদের দরকার পাট— পাট বিদেশে চালান দিয়ে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে বাঁচাবো। সব ধানের জমিতে পাট লাগানো চাই। ও সব চাষাভূষাদের এজন্যে উৎসাহ দাও— সদুপদেশ দাও— ওরা যেন সারা বছর ধরে পাট ছাড়া আর কোনো কিছুর চাষ না করে ।

কিন্তু বাংলার চাষী, বাংলার গ্রামবাসী মেহনতি মানুষ জানে, কোনো বীজ বপনের মৌসুম কোনোটি । এ তাদের বাস্তব জ্ঞান— হাতে-কলমে শেখা

অভিজ্ঞতা । তারা এখন নিজেদের জমিতে ধানের বীজই বুনেছে। তাদের চোখে-মুখে স্বপ্ন, এই বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হবে, বাতাসে ঢেউ খেলবে কচি কচি সবুজ ধানের পাতায়। এই চারাগুলো বড়ো হবে, এর বুক চিরে বেরুবে শীষ, সেই শীষে একগুচ্ছ ধান— দুধাল-ধান— ক্রমেই সোনার আবরণে এক একটি সুপুষ্ট চাল। তারপর ।

বাংলার ছেলেরা আজ বিদেশী শত্রুদের দেশছাড়া করার জন্যে সংগ্রাম করছে। বিজয়ী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরবে তারা অচিরেই। কৃষাণী মা তাদের মুখে তুলে দেবে নবান্ন ।

এর চেয়ে বাস্তব আর সত্য-সুন্দর এখন কিছুই নেই। অথচ বিদেশী স্বার্থপররা অকালে ক্ষেতে ক্ষেতে পাট বোনার উদ্ভট প্রচার করাচ্ছে ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠানে। এরই আর এক নাম বোধ হয় গণবিরোধ, অথবা ঢাকা বেতারের গণবিরোধী অনুষ্ঠান প্রচারের এটাও আর একটা সুস্পষ্ট নমুনা ।

- (রচনা ১৬-৫-৭১। প্রচার ১৭-৫-৭১)

২৩। পাকিস্তান কি মুসলিম রাষ্ট্র?

‘লাকুম দীন-ওয়কুম ওলিয়াদীন'? তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম, আর আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম। ধর্মের ব্যাপারে নেই কোনো জবরদস্তি। আগেও আমরা একদিন বলেছিলাম, ইসলাম ধর্ম-নিরপেক্ষ সহঅবস্থানের বিধান দিয়েছে। বলেছিলাম, নিজ নিজ আবাসভূমিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ চিরকাল ধর্মনিরপেক্ষ সহঅবস্থানে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। কেননা ধর্ম কখনো মানুষের ভৌগোলিক সত্তাকে অস্বীকার করেনি। আমি মুসলমান-তার অর্থ আমাকে বাধ্যগতভাবে কোনো মুসলমানিস্তানের বাসিন্দা হতে হবে না, আমি হিন্দু— তার অর্থ আমাকে বসবাসের জন্যে একটি হিন্দুস্তান গড়ে তুলতে হবে না, তেমনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বসবাসের জন্যে ‘বৌদ্ধস্তান' প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা নেই।

অথচ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে কথিত পাকিস্তান কোনো নীতি বা আদর্শের অনুসারী, তা বুঝতে পারা সত্যি দুষ্কর। কেননা কতো রকমেই-না তারা চাইছে— চাইছে বাংলার কতিপয় মীরজাফরের সহায়তায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অশুভ চেতনা জাগিয়ে তুলতে। বাংলার মুক্তিকামী মানুষ যখন নিজেদের জন্মগত অধিকার দেশের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার

মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই তারা বাঙালিদের এই ন্যায়ের সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস হিসেবে এখানে সাম্প্রদায়িকতার কলুষ ছড়িয়ে দিতে চাইছে। তারা চাইছে পবিত্র ইসলামের মানবতার আদর্শকে বিকৃত করে বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষকে ভোলাতে। কিন্তু বাংলার গ্রামবাসী কৃষক শ্রমিক জেলে তাঁতি জোলা মাঝি মেহনতি মানুষ এবং ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চাকুরে বা বুদ্ধিজীবী সর্বস্তরের বাসিন্দা নির্বিশেষে সবাই বাংলাদেশের আলো-বাতাসে, বাংলার কর্মক্ষেত্রে বাঙালি হিসেবেই অবস্থান করছে। বেঁচে থাকার প্রশ্নের বা জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে নেই হিন্দু-মুসলমান বা বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসজনিত বৈষম্য ।

আজকের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী বিজয় শুধু কেবল বাঙালি মুসলমানদের জন্যেই বাঞ্ছিত নয়— বরং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যে-কোনো ধর্মবিশ্বাবাসী বাঙালি মেহনতি মানুষের জন্যে নিয়ে আসবে সুখী সমৃদ্ধ একটি জাতীয় জীবন ।

ধর্মনিরপেক্ষ সহঅবস্থানে অভ্যস্ত গ্রামবাংলার যে-কোনো ধর্মাবলম্বী মেহনতি মানুষেরই স্বার্থ এক, কর্মক্ষেত্র এক, জাতীয়তাবোধ এক । তারা সবাই এতোকাল লাঞ্ছনা ভোগ করেছে, বঞ্চনা লাভ করেছে । তাদের আজ সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন অবাধ স্বাধীন- পরিবেশ ।

এ অবস্থায় মানবতাবিরোধী পাকিস্তানি বর্বরদের যে-কোনো দুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাংলাদেশের পাকিস্তানকবলিত এলাকাগুলোতে বাংলার মীরজাফরদের সহায়তায় যুদ্ধবাজ পাকবাহিনী আজ এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। সেসব এলাকার নিজেদের সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা হিসেবে দুর্বৃত্তরা সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙালিদের ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর জবরদস্তি করছে। যদিও এসবে আদৌ বিভ্রান্ত না হয়ে বাংলার ধর্মপ্রাণ মেহনতি মানুষরা ভাবছেন, পাকিস্তান কি সত্যি ইসলামী রাষ্ট্র— না পবিত্র ধর্মের নামে জুয়াচোর, মোনাফিকদের আড্ডাখানা?

- (রচনা ১৭-৫-৭১ । প্রচার ১৮-৫-৭১)

২৪ । বাংলার কথা (১৪)

একটা গল্প দিয়েই শুরু করা যাক।

হাঁড়িভর্তি দুধ নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন একজন গোয়ালা। পথে দেখা গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে-তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি নিয়ে যাচ্ছ হে!

গোয়ালা বললেন : জি, দুধ নিয়ে যাচ্ছি বাজারে— বেচে মাছ-তরকারি সওদাপাতি কিনে আনবো ।

: বেশ, যাও। দেখো, আল্লাহ্র নাম-কালাম নিয়ে কথা বললে ভালো । গোয়ালার মনে এলো, দুধের হাঁড়ি রয়েছে তাঁর নিজের হাতে, বাজারে দুধ বিক্রি হবেই এবং বিক্রির পয়সায় তিনি সওদাপত্র কিনতে পারবেন, এতে আবার আল্লাহর নাম-কালাম নিতে হবে কেন? ইত্যাদি।

কিন্তু অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল গোয়ালকে। পায়ে হোঁচট খেলেন তিনি পথে। হাত থেকে দুধের হাঁড়িটি খসে পড়লো এবং সব দুধ পড়ে গেলো ।

ফেরার পথে দেখা আবার ইমাম সাহেবের সঙ্গে। তিনি প্রশ্ন করলেন : কি সওদা- পাতি আনলে হে?

জবাবে গোয়ালা বললেন : জি ইনশাআল্লাহ্, আমি কিছুই কিনতে পারিনি ইনশাআল্লাহ্ । কারণ ইনশাআল্লাহ্ পায়ে হোঁচট খেলাম ইনশাআল্লাহ্ । আর ইনশাআল্লাহ্ হাত থেকে হাঁড়িটা খসে পড়লো ইনশাআল্লাহ্ এবং ইনশাআল্লাহ্ সব দুধ পড়ে গেল ইনশাআল্লাহ্ ।

আল্লাহ্-র নাম-কালাম নিতে কার্পণ্য বা অবহেলা করার ফলেই নিশ্চয় তাঁর এতো বড়ো বিপদ হয়েছে, এই ভেবে গোয়ালা নিজের ভুলের মাসুল বারবার ‘ইনশাআল্লাহ’ উচ্চারণের মাধ্যমে আদায় করেছিলেন সেদিন । গল্পের গোয়ালার সঙ্গে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার পূর্বকৃত ভুলের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, জানি নে । কিন্তু ইত:পূর্বের মাসখানেক সময়ের কথা আমরা জানি, যখন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রচারসামগ্রীতে ‘পাকিস্তান' শব্দটির তেমন উল্লেখ থাকতো না। এবং তাতে কার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে, সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা না করেও এটা তো লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রকে এখন করতে হচ্ছে বেদমভাবে। যে-কোনো গানের কথায়, যে- কোনো আলোচনায় কথিকায় ‘পাকিস্তান' শব্দের মুহুর্মুহু ব্যবহার গল্পের গোয়ালার ‘ইনশাআল্লাহ্’-কেও ছাড়িয়ে গেছে দেখতে পাওয়া যায় ।

প্রসঙ্গত আর একটি গল্প বলি। গল্পটি একজন স্কুলে পড় য়া ছাত্রকে নিয়ে।

ছাত্রটি তার বইতে একটি শব্দ পেলো ‘কতিপয়' শব্দটি তার কাছে অসম্ভব রকম শ্রুতিমধুর ঠেকলো । কিন্তু সে মুহূর্তে সে শব্দটির অর্থ খুঁজে পেলো না। অথচ এমন সুন্দর শব্দটি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করার লোভ সংবরণ করতে পারলো না সে— সে তার পিতার কাছে চিঠি লিখতে বসলো এবং সম্বোধন করলো এভাবে : 'কতিপয় বাবাজান'। ছাত্রটি শব্দবিশেষের অর্থ না জানার ফলেই হয়তো এমন অপপ্রয়োগ করেছিল! কিন্তু ‘পাকিস্তান' শব্দের অর্থ সবাই জানে । এমনকি শব্দটি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশের নামের অপভ্রংশ নিয়ে গঠিত, সে কথাও সবাই আমরা জানি! তবু ঢাকা বেতার কেন্দ্রের একটি দৈনন্দিন বৈকালিক কম্পোজিট অনুষ্ঠান, যা গ্রামীন শ্রোতাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রচার করা হয়, সে অনুষ্ঠানের নাম স্বভাবতই ছিল কি যেন গ্রাম্য আসর— অথচ এখন সে নাম পাল্টে নতুন নামকরণ করা হয়েছে ‘আমাদের পাকিস্তান' । শব্দবিশেষের অর্থ জেনেশুনেও গ্রামীণ শ্রোতাদের জন্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের এই নাম দেয়া অর্থ না জেনে ‘কতিপয় বাবাজান' লেখার চেয়ে আনুপাতিকভাবে বেশি কৌতুকাবহ, সন্দেহ নেই ।

কিন্তু ‘পাকিস্তান শব্দটি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলোতে এমন কথায় কথায় ব্যবহারের বাড়াবাড়ি কেন? যে-নামের দেশ-সীমানার দাসত্ব থেকে বাংলাদেশ সদ্য তাজা রক্তের মূল্যে নিজেকে ছাড়িয়ে এনেছে, যে-নামের এক মানবেতিহাসের কলঙ্ক জঙ্গি প্রশাসন বাংলাদেশের বুকে নির্বিচার গণহত্যার জন্যে সশস্ত্র বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে, সে নাম সে শব্দ বাংলার উৎপীড়িত মা-বোনের আতঙ্ক, ধর্মপ্রাণ মেহনতি মানুষের কাছে অবিশ্বাস এবং সামগ্রিক ঘৃণার উৎস হয়েছে আজ! ঐ ‘পাকিস্তান' শব্দ বাংলার মানুষের মনে সঞ্চারিত করে শুধু ঘৃণা! ঢাকা বেতার কেন্দ্রের শত প্রচারণায়ও ঐ ‘পাকিস্তান' শব্দের তথাকথিত আবেদন বাংলার অধিকারসচেতন মানুষের ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে' না আর কোনো দিন ।

- (রচনা ও প্রচার ১৮-৫-৭১)

২৫ । জনগণের জয়

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষোভ :

'জনগণে যারা জোঁকসম শোষে

তারে মহাজন কয়,

সন্তান সম পালে যারা জমি

তারা জমিদার নয় ।

মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ

মাটির মালিক তাহারাই হন' ।

অন্যকথায় 'জোর যার মুল্লুক তার'। এই বর্বর সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে জনগণের প্রশাসন স্থাপনে বদ্ধপরিকর আজকের গণতান্ত্রিক বিশ্ব। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারও এই একই লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী। কেননা এই সরকারের অনুরূপ লক্ষ্য এর বৈধতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলাদেশের বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই এই নতুন সরকারের সংগঠকরা জনগণের সমর্থন লাভ করেছেন নির্বাচনের মাধ্যমে । এবং এঁরা কেউই সামরিক শক্তির অপপ্রয়োগে জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করার নগ্ন কৌশল অবলম্বন করেননি।

এ কথা সত্য যে, তথাকথিত পাকিস্তানি স্বাধীনতার মুখোশটি বাংলার মানুষের জন্যে ছিল সবচেয়ে বঞ্চনা ও শাসনের নামে শোষণের একটা পরিকল্পিত কুচক্র বা ষড়যন্ত্র। বিদ্রোহী কবি নজরুল এ অঞ্চলের বৈদেশিক শাসনামলের বঞ্চিত জনগণের অবস্থা অবলোকন করে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, গত তেইশ বছরে সে ব্যাপারে কোনো প্রতিকার তো হয়ইনি, বরং আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীদের উপনিবেশ এবং এ দেশের মানুষের শ্রম তাদের ভোগবিলাসের উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। বাংলার চাষীদের শ্রমে উৎপন্ন খাদ্যশস্য বাঙালি চাষী শ্রমিকরা খেতে পায়নি দু'বেলা পেট ভরে। তাদের শরীর নিংড়ানো ঘর্মরসে উৎপন্ন পাট বিক্রির পয়সা ওঠেনি তাদের গাঁটে। সকল ক্ষেত্রেই বাংলার গণদাবি হয়েছে উপেক্ষিত, বাংলার মানুষ হয়েছে অবহেলিত, প্রবঞ্চিত ।

বরাবরই বাংলার বুকে রাজনৈতিক চালিয়াতির জোরে বা সামারিক শক্তির দাপটে আধিপত্য স্থাপনকারী পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র আমাদের মেহনতি জনগণের ওপর 'জোর যার মুল্লুক তার' বর্বর নীতি চাপিয়ে রেখেছে। আর এ কাজে তাদেরকে সহায়তা দিয়েছে বাংলার কতিপয় মীরজাফর, যারা পাকিস্তানি শক্তির দালালি করে সুযোগ- সুবিধার এঁটোকাঁটা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে।

সেই অবস্থার হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশধরদের জীবনকে নির্বিঘ্ন করার চূড়ান্ত প্রয়াস আজকের এই সশস্ত্র সংগ্রাম । বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষী, জনগণের প্রাণের দাবি স্বদেশের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দুর্বৃত্ত দখলদারদের দেশ থেকে তাড়াতে হলে উপযুক্ত প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের মাধ্যমেই তা করতে হয়। বাংলার জনগণ আজ ইতিহাসের শিক্ষাকেই সংগ্রামের পাথেয় করে নিয়েছে।

মাতৃভূমি বাংলাদেশে আমরা সবরকমের শোষণ ও পাশবিক শাসনের মূলোচ্ছেদ করবো। এদেশের সম্পদ পুরোপুরি এ দেশের মানুষের ভোগেই ব্যবহৃত হবে। বাঙালি কৃষক শ্রমিকের শ্রমের ফসল কোনো তস্কর আর লুটে নিতে পারবে না ।

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে এমনি একটি নতুন দেশ, যে দেশে সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠের উদাত্ত ধ্বনি :

'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়

জয় নব উত্থান' ।

— (রচনা ১৮-৫-৭১। প্রচার ১৯-৫-৭১। পুনঃপ্রচার ২০-৬-৭১ ও ২৭-৮-৭১)

২৬। বাংলার কথা (১৪)

নানা রকমের বচন-প্রবচনই তো আছে-যেমন, 'লেফাফা-দুরস্ত'। আবার যেমন, 'যতো গর্জে ততো বর্ষে না'। এছাড়া ছড়া-কবিতাও আছে :

'দেখিতে মাকাল বটে পরম সুন্দর

ভিতরে কদর্য দ্রব্য কে করে আদর' !

বাংলা ভাষায় এবং বাঙালির মুখে মুখে বচন-প্রবচন ছড়া ইত্যাদির ছড়াছড়ি । কিন্তু এ মুহূর্তে যে বিষয়ে বলতে চাই, তার সঙ্গে ঠিক কোনো বচনটি মিল খাবে, বুঝে উঠতে পারছি নে ।

বলতে চাই, ঢাকা বেতারের একটি নব-প্রবর্তিত বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা। অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে পূর্বাহ্নিক ঘোষণা প্রচার করে শ্রোতাদের কান খাড়া করিয়ে রাখারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল । বেশ আড়ম্বরপূর্ণ নাম : 'পাকিস্তান ও

বিশ্ব সংবাদ-পত্র।' শুনে কি মনে হচ্ছে? মনে হয়েছিল, পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলো পাকিস্তানি দস্যু-সর্দার ইয়াহিয়ার পরম বর্বরতার ঐতিহাসিক কৃতিত্বের প্রতি সাধুবাদে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের বেসামরিক জনপদে সশস্ত্র বাহিনী লেলিয়ে দেবার বিষয়টিকে বিশ্ব অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে বসেছে। মনে হয়েছিল. ইসলামী রাষ্ট্র বলে কথিত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকৃত নির্বিচার গণহত্যা, জনগণের মালামাল লুটতরাজ, বসতঘরে অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদির স্বপক্ষে বিশ্বের পত্রপত্রিকা জায়েজ ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি যা মনে হয়েছিল তা হচ্ছে, বিশ্বের পত্রপত্রিকাগুলোর একচ্ছত্র খদ্দের বা পাঠক হয়তো-বা কেবল পাকিস্তানি বেতারের লেখক শিল্পীরাই— এ ছাড়া আমরা হয়তো আদৌ কোনো পত্রপত্রিকা পড়ার বা দেখার সৌভাগ্য লাভ করিনি I

যা-ই হোক, অনুষ্ঠানটি শুনে দেখতে গিয়ে যা দেখা গেলো, তাতেও কিছু হতাশ হবার কারণ ছিল না। কেননা কথোপাকথনের আকারে 'পাকিস্তান ও বিশ্ব সংবাদপত্র' অনুষ্ঠানটিকে বেশ রংচটা এবং আকর্ষণীয় করে তোলার আপ্রাণ প্রচেষ্টার ছাপ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, কথোপকথনের পরিবেশটি ঘরোয়া এবং দারুণ অন্তরঙ্গ— সেখানে নারীকণ্ঠের সরবরাহ রয়েছে। এবং দস্তুরমতো টক-মিষ্টি-ঝালের অপূর্ব সমারোহ ।

কিন্তু আগাগোড়া অনুষ্ঠান শুনবার পর যা মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে, ঠিক ঐ বহুশ্রুত মন্তব্যটি : বক্তার উদাত্ত কণ্ঠ, বাক্যের বিন্যাস, শব্দের গাঁথুনি, পরিবেশনার লালিত্য অপূর্ব-অপূর্ব! কিন্তু কি বললেন, ঠিক বোঝা গেলো না ।

অবশ্য 'পাকিস্তান ও বিশ্বসংবাদপত্র' অনুষ্ঠানটির মর্মকথা আমরা ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছি। ওতে পাকিস্তানি মনোভঙ্গির গতানুগতিক কথাগুলো বেশ ফলাও করেই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, শুধু অনুষ্ঠানটির নামকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্বের সংবাদপত্রের কোনো মন্তব্য তুলে ধরা হয়নি বা তা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ ঢাকা বেতার অনুষ্ঠানটির পূর্বাহ্ণিক প্রচার-প্রচারণার ব্যাপারে যতোটা গর্জন করেছিল, ততোটা বর্ষণ সম্ভব করে তুলতে পারে নি। 'লোফাফাদুরস্ত' গালভরা নামটি অনুষ্ঠানটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারে মাকাল ফলে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। আমরা কেউ আর এটিকে আদর অভ্যর্থনা বা গুরুত্ব দিতে পারলাম না।

অথবা ঢাকা বেতারের আলোচ্য অনুষ্ঠানটির নামকরণকে যদি আমরা মহাকবি

শেক্সপিয়ারের ‘নামে কি আসে যায়'-সূত্রের কষ্টিপাথরে ফেলে বিচার করি, তা হলে অন্য কথা। বিশেষ করে, এটা তো অতি সত্য কথা, বেয়নেটের মুখে বেতারে যাচ্ছে-তাই অনুষ্ঠান প্রচার করানো গেলেও বাংলার মুক্তিপাগল জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে বিভ্রান্ত করা একেবারেই অসম্ভব।

— (রচনা ১৮-৫-৭১। প্রচার ১৯-৫-৭১)

২৭। ইসলাম ও মানবতা

মনে করুন, এমন একটি দেশ ভূ-ভাগ—যে দেশে প্রতিটি মানুষই দু-বেলা পেটভরে খেতে পায়, প্রত্যেকেই নিযুক্ত আছে কোনো-না-কোনো কাজে—কেউই বেকার নেই এবং মনে করুন, প্রতিক্রিয়াশীলরা যখন বলে, ‘‘হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়', তখন সে দেশের মানুষ বলে : মানলাম, আঙুলগুলো লম্বা বা বেঁটে, সরু বা মোটা— কিন্তু যে-আঙুলটির জন্যে যতোটা রক্তপ্রবাহ প্রয়োজন, তার পূর্ণ সরবরাহ তো রয়েছে এবং প্রতিটি আঙুলই একযোগে কাজ করছে যার যার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে— এ রকম একটি দেশ সত্যি সুখের, শান্তির এবং আশা-আনন্দের ।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ— যাকে আমরা কাব্য-সাহিত্যে ‘সোনার বাংলা' বলে আনন্দ পাই, অথচ যে-বাংলা প্রকৃতপক্ষে এতকাল ছিল একটি বাজারমাত্র—যে বাজারে হয়তো-বা ব্যবসায়ীদের ছিল ব্যাপক আনাগোনা, অর্থাৎ যে-দেশের সম্পদ দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসমৃদ্ধির কাজে লাগতো না—লাগতো নব নব বাণিজ্য-দস্যুদের ভোগে, সেই বাংলাদেশ আজ সঙ্কট থেকে সঙ্কটে উত্তরণ করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন সম্ভব করে তোলার পথে ।

এই পথ নয় কুসুমাস্তীর্ণ। এই সংগ্রামী পথ আত্মপ্রতিষ্ঠার আর অধিকার আদায়ের। অনেক ত্যাগ, অনেক তিতিক্ষা ও অনেক রক্ত এ পথের পাথেয় ।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কারসাজিতে বাংলার কৃষক-শ্রমিকরা চিরকাল যে-কোনো নগ্ন প্রবঞ্চনাকে আল্লাহ্র হুকুম বা অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়েছে। বাংলার ধর্মপ্রাণ মেহনতি মানুষকে ইসলামের দোহাই দিয়ে মোনাফেক স্বার্থবাদী মহল করেছে বঞ্চনা। অথচ মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা:) বলেছেন : ফোরাত নদীর তীরে (অর্থাৎ শাসিত এলাকার তৎকালীন শেষ প্রান্তে) যদি একটি কুকুরও অভুক্ত থাকে, তার জন্যে দায়ী দেশের

খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান । প্রতিটি ইতর প্রাণীর জন্যে যেখানে এতো বড়ো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহন করা যেতে পারে, সেখানে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে তো সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না ।

খলিফা ওমর ফারুক (রা:) ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন হযরত বেলালের মালিকানধীন কিছু জমি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন— জমিটি হযরত বেলালকে রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময়ে চাষাবাদের জন্যে দিয়েছিলেন। হযরত বেলাল নিজের ভরণপোষণের জন্যে এর কিছু অংশে চাষাবাদ করতেন— বাদবাকি বাড়তি অংশ অনাবাদী পড়ে থাকতো। সে অংশটুকু দ্বিতীয় খলিফার আমলে বাজেয়াপ্ত করা হয়। কেননা, ইসলামী বিধানে যে নিজের হাতে যতোটুকু জমিতে চাষাবাদ করবে, সে ততোটুকু জমির ওপরে মালিকানা খাটাতে পারবে। এ নীতি হচ্ছে : 'যার লাঙ্গল তার মাটি' ।

অথচ বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মেহনতি মানুষকে যে-ইসলামের দোহাই দিয়ে বংশানুক্রমিকভাবে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করা হয়েছে, তা ইসলামের নবি ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলাম নয়— সে হচ্ছে ইয়াজিদ মারোয়ানের ইসলাম, পথভ্রষ্টদের ইসলাম। এবং এ কথা আজ বাংলার মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, বিকৃত ইসলামের অনুসারীরা পাকিস্তান নামক একটা তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রের কায়েমী ধারকবাহক। তাই তাদের বিরুদ্ধে বাংলার মুক্তিসংগ্রাম জেহাদের নামান্তর। এ সংগ্রাম মানবতার । বাংলার দুর্গত মানবতা এ সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের চূড়ান্ত বিজয়কে করেছে লক্ষ-কেন্দ্র ।

(রচনা ১০-৫-৭১। প্রচার ২০-৫-৭১)

২৮। বাংলার কথা (১৬)

ঘৃণাবশত হোক বা পাছে জঘন্য মিথ্যাশ্রয়ী প্রচারণায় মনোবল ক্ষুণ্ন হয়, এজন্যে আমাদের মধ্যে পাকিস্তান বেতারের অনুষ্ঠান আদৌ না-শোনার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাকপটুতা এবং পরিবেশনার অপকৌশল অনেক সময় নির্জলা মিথ্যাকেও এমন আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে, যা শুনে আপনার আমার সরল প্রাণ বিভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বলি, ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠানগুলো আপনারা বরং শুনুন— খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন, শুনে দেখুন। দেখবেন, একটা মিথ্যাকে প্রমাণ করার জন্যে হাজারটা মিথ্যার আমদানি

করতে গিয়ে তারা কিভাবে প্রতিদিন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বাংলার বিস্তৃত রণাঙ্গনে অবস্থান করে সেটা আপনার -আমার জন্যে নিঃসন্দেহে একটা সহজলভ্য হাসির খোরাক হবে ।

তাহলে বলি, বরাবর পাকিস্তান বেতার বলে এসেছে, বাংলাদেশ থেকে কোনো মানুষ নাকি ভারত বা অন্য কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলে যায়নি। ভারতে যে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মোহাজের তাদের এলাকায় গিয়েছে এবং অবস্থান করছে-আর তাদের ভরণপোষণের জন্যে ভারত দেশ-বিদেশের সাহায্য ও পাকিস্তানের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবির কথা বলছে, সেটাকে তারা ভারতের দুরভিসন্ধি বলে প্রচার করে আসছে। এমনকি, পাকিস্তান বেতার থেকে এরকম কথাও প্রচার করা হয়েছে, ভারতে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় যদি দুস্থ মানুষের ভিড় থেকেও থাকে, তবে তা নাকি ভারত নিজেদের অভ্যন্তরীণ এলাকাগুলো থেকে লোকজন নিয়ে এসে নকল মোহাজের-শিবির গড়ে তুলেছে। এ ছাড়া বাংলার মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্বকে তো পাকিস্তান বেতার পুরোপুরি অস্বীকার করে ‘কতিপয় দুষ্কৃতকারী’ এবং ‘তথাকথিত ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছে ।

কিন্তু যেখানে বাংলার মানুষ নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে, গ্রামকে-গ্রাম বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে, দলে দলে ছিন্নমূল নারী-পুরুষ শিশু- বৃদ্ধ নির্বিশেষে বাংলার বিপন্ন মানুষ প্রাণভয়ে নিকটবর্তী সীমান্ত এলাকার দিকে ছুটে চলছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের যুবকরা সংক্ষিপ্ত কোর্সে সামরিক ট্রেনিং নিচ্ছে এবং দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, এখানে-ওখানে তাদেরকে দারুণ নাজেহাল করছে-এসব নিজেদের চোখে দেখা সত্যকে যতো বিকৃত করে প্রচার করা হোক, তাকে তো আপনি-আমি আদৌ আমল দিতে পারিনে ।

আমরা শুধু মিথ্যা প্রচারণার অপূর্ব এই তোড়জোড় আর তুখোড় অপপ্রয়াসকে বড়ো কঠিন সময়েও ক্ষণিকের হাসির খোরাক হিসেবে মেনে নিতে পারি ।

সত্যি হাসি পেলো, যখন পাকিস্তান বেতারের তথাকথিত জাতীয় সংবাদে সেদিন বলা হলো, শুনতে পেলাম, ইতোমধ্যেই নাকি শতকরা নব্বই জন বাঙালি যার যার বাড়িঘরে ফিরে গিয়েছে। অর্থাৎ যারা ইতোপূর্বে উৎপীড়িত হয়ে বা বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বলিহারি, তোমরা তো বাংলা দেশের কোনো মানুষ দেশ ছেড়ে

বিদেশে চলে গিয়েছে বলে স্বীকারই করোনি এতোদিন। এভাবেই তোমরা সত্য-ন্যায়ের সামনে, বাংলার জনগণের কাছে নিজেদের মিথ্যাচারের ব্যাপারে বেফাঁস স্বীকারোক্তি করে যাবেই, আমরা জানি ।

সেজন্যেই বলেছিলাম, ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান বাংলার সচেতন মানুষের জীবন- জয়ের সংগ্রামকে কিছুতেই পারবে না বিভ্রান্ত করতে। নিজেদের কথার হেরফেরেই তাদের মিথ্যার মুখোশ বাঙালি শ্রোতাদের কাছে উন্মোচিত হবে— হতে বাধ্য ।

— (রচনা ১৯-৫-৭১ ! প্রচার ২০-৫-৭১)

২৯। যে সংগ্রাম চলতেই থাকবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেন অপরিহার্য, এ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময়ে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছি। আমরা বলেছি, গত তেইশ বছর ধরে বাঙালিদেরকে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সবরকমের শাসন-শোষণে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। বাঙালিদের শ্রমের মূল্য দেয়া হয়নি ন্যায়সঙ্গতভাবে— দেয়া হয়নি আমাদের জনমতের প্রতি কোনো মর্যাদা। বাংলার মানুষের সুখীসমৃদ্ধ জীবনযাত্রা বিঘ্নিত এবং বাঙালিরা রাষ্ট্রীয় জীবনে নিগৃহীত হয়েছে বংশানুক্রমিকভাবে ।

গণদাবির মাধ্যমেই বাংলার মানুষ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন তথা তাদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তার প্রতিকার করতে চেয়েছে। অশেষ সহনশীলতার পরিচয় দিয়েই এ অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থবাদীদের নগ্ন স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যেও নিয়মতান্ত্রিক সমাধানের জন্যে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু সব কিছু সীমা ছাড়িয়ে গেলো । যখন দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ করার পর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে বাংলাদেশে অতর্কিতে সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেয়া হলো। বাংলার মানুষের কাছে সেদিন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সব আশ্বাসই আসলে ছিল জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন শাসকচক্রের একটা হীন ষড়যন্ত্র । সে মুহূর্তে বাংলাদেশের .. আপামর জনসাধারণের অস্তিত্ব রক্ষার কারণেই স্বদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন আমাদের জন্যে হয়ে উঠলো অবশ্যম্ভাবী । সহজ কথায়, একটি অতর্কিত ও মানব-সভ্যতা বিবর্জিত হামলাকে প্রতিরোধ করে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্যেই আমাদেরকে

ঘোষণা করতে হলো স্বাধীনতা এবং ব্রতী হতে হলো সশস্ত্র যুদ্ধ-অভিযানে ।

আমরা আক্রমণ প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণ করে চলেছি আমাদের দেশের হানাদার শত্রুদেরকে ।কিন্তু দুর্বৃত্ত হানাদাররা যা করছে, সেটাই বড়ো বেশি দুর্ভাগ্যজনক। তারা করে চলেছে বাংলার এক–একটি সমৃদ্ধ জনপদকে বিরাণ— নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা, মালামাল লুটতরাজ-করে ফিরছে লোকালয়ে বসতঘরে অগ্নিসংযোগ, সতীসাধ্বী রমণীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার এবং বাংলাদেশের অগণিত আদি বাসিন্দাদেরকে নিঃসম্বল অবস্থায় দেশছাড়া ।

অধিক সংখ্যায় এবং উন্নত সামরিক সজ্জায় পাকিস্তানি সামরিক দুস্যরা প্রথমে আমাদের শহরগুলোতে এবং ক্রমেই শহরতলি ও গ্রামীণ এলাকাগুলোতে হত্যা ও ধ্বংস অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানেই তারা যাচ্ছে, রেখে যাচ্ছে, নিজেদের অপকীর্তির চিরস্থায়ী নির্মম স্বাক্ষর। এক-একটি এলাকা এক-একটি মাইলাই— শত শত মাইলাই- এর ঘটনাস্থল বাংলাদেশ। ঢাকার অদুরের কয়েকটি অঞ্চলের ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর মারফতে আমরা জানতে পেরেছি। চলতি মাসের ৭ তারিখে সেখানে কাপাসিয়া থানার একটি বাজারে পাকিস্তানি দস্যুরা প্রথম হানা দেয় । তারা বাজারের সব দোকনপাট এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে এবং ৬ জন বাসিন্দাকে পাকড়াও করে এনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে । ৯ মে দস্যুরা স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এলাকা ঘোড়াশালে হানা দিয়ে ৫ জন বয়স্ক লোককে হত্যা ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করে। সেখানেই তারা অস্থায়ী ছাউনি গেড়ে বসে এবং আশপাশের গ্রামবাসীদের মনে ত্রাস সঞ্চারকারী জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত হয় ।

১১ মে পাকিস্তানি দস্যুরা নরসিংদি শহরে ছাউনি গাড়ে এবং নিকটবর্তী গ্রামের মোট ১৬ জন অবিবাহিত মেয়েকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়, হতভাগিনীদের আর খবর পাওয়া যায়নি। তরুণ যুবকরা কেউ তাদের হাতে পড়লেই প্রাণ হারাচ্ছে। দুর্বৃত্তরা গত মাসের শেষ ভাগে বিভিন্ন বয়স ও পদমর্যাদার প্রায় ৫০০ ব্যক্তিকে ধরে এনে নরসিংদী থেকে ভৈরব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুদ্ধ সরঞ্জাম ও রসদপত্র বহন করে নিতে বাধ্য করেছিল । এঁদের মধ্যে অনেকেই জীবিত ফিরে আসেননি।

এ হচ্ছে অঞ্চলবিশেষের ভাসা-ভাসা প্রামাণ্য চিত্র। বাংলাদেশ যখন শত্রুমুক্ত হবে, তখন পাক দস্যুদের বর্বরতার শত শত নিদর্শন আমরা দেখতে পাবো।

আজ বাংলার প্রতিটি মানুষের মন উত্তরোত্তর ঘৃণায় বিষিয়ে উঠছে । এক-একটি আতঙ্ক আজ রূপায়িত হচ্ছে প্রতিহিংসায় ।

এতোকাল আমাদের সাথে যে বঞ্চনা করা হয়েছে, আমরা চেয়েছিলাম তার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিকার । কিন্তু এবার আমাদের ওপরে যে মানবেতিহাসের এক জঘন্যতম আচরণ করা হচ্ছে, তার একমাত্র প্রতিকার আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম— আমাদের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত তথা দেশ সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যে সংগ্রাম চলতেই থাকবে ।

(রচনা ২০-৫-৭১। পুনঃপ্রচার ১১-৭-৭১)

৩০ । বাংলার কথা (১৭)

'মুহমে শেখ ফরিদ বগলমে ইট'। কথাটির ভাষা বাংলা না হলেও বাঙালিমাত্রই এই বহুশ্রুত প্রবচনটির মর্মার্থ বোঝে। এই প্রবচনের বাংলা রূপায়ণ হচ্ছে- যেটাকে এক জাতীয় মানুষের সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহার করা হয়- যেমন, 'মুখে এক দিলে এক— তারে কয় মোনাফেক'।

মোনাফেককে কেউ ভালোও বাসে না, বিশ্বাসও করতে পারে না। মোনাফেকের মুখে 'হক কথা'ও বিষ লাগে। তুমি গাছের 'গোড়ায়' কেটে দিয়ে আবার 'আগায়' পানি ঢালবে, ওতে গাছের পাতা সজীব হবে কেন? বরং সেটা হবে তোমার শঠতার আর এক নির্লজ্জ পরিচয় ।

সেই উৎকট বেহায়াপনারই পরিচয় বহন করছে পাকিস্তানি সামরিক দস্যুদের অপপ্রচারযন্ত্র ঢাকা বেতার। রোজ রোজ সতেরো গণ্ডা মিথ্যা কথার ফাঁকে ফাঁকে এ বেতার কোনো দুঃসাহসে মানবতার ধর্ম ইসলামের আদর্শ প্রচার করে, সত্যি আমরা ভেবে পাইনে । হয়তো-বা মিথ্যাচারের পাপরাশি ঘনীভূত হয়ে ওদের বুকে জমাট পাথর হয়ে পড়েছে— যেমন আজাজীলের বুকের পাটা সীমাহীন। শয়তান আজাজীলের চরিত্র আমরা জানি, ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্যে মোল্লা-মৌলবির সঙ সেজেও নাকি সামনে এসে হাজির হয় ।

আর সত্যি বাহ্-বা দিতে হয় সামরিক দস্যুদের ঐ শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রকে । সত্যিকারভাবেই তারা কতিপয় ফতোয়াকারী মৌ-লোভীর সমাবেশ ঘটাতে পেরেছে। তারা বাড়তি খয়রাত বা নীলরঙা চেকের বিনিময়ে বিস্তর ওয়াজ-নসীহত করে বেড়াচ্ছে । বলছে : "আতি আল্লাহ্ আতিয়ার রসূল।" -আল্লাহকে

পেতে হলে আল্লাহর রসুলের তাবেদারী কর। আর একই প্রসঙ্গ বিস্তার করে বলছে, রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে চলা নাগরিকের কর্তব্য । সাধু-সাধু। মারহাবা মারহাবা। বিরাট বড়ো একখানা ইসলামী রাষ্ট্র, তার রাষ্ট্রনায়ক বিরাট বপু জল্লাদ কসাই ইয়াহিয়া-তাকে মান্য করা মানেই তো ইসলামী জিন্দেগি ।

অথবা ঢাকা বেতার কেন্দ্রের 'কোরআনে হাকিম ও আমাদের জিন্দেগি' অনুষ্ঠানের হেদায়াতনামার এই নমুনাকে আমরা যদি আজ 'মুমে শেখ ফরিদ বগলমে ইট' বা জঘন্য মোনাফেকি বলে মন্তব্য কবি, তাহলে কি আমাদের ইমান নষ্ট হবে? নিশ্চয় না । কেননা আমরা জানি, ইসলাম কোনো দিন গণহত্যা, বসতঘরে অগ্নিসংযোগ, নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার— এসব অনুমোদন করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে সামরিক প্রেসিডেন্টের পদই অবৈধ ! সামরিক গুণ্ডামি তো কুফরির চেয়ে জঘন্য। কাজেই সেই প্রেসিডেন্টের স্বপক্ষে ফতোয়া দানকারী বা সেই লুটেরার তহবিলের টাকা গ্রহণকারী মৌলবি-মৌলানারা কখনো নায়েবে রসূল হতে পারে না। তারা রসুলের নামে ‘আয়েব’– কলঙ্কিত-মোনাফেকের অধম— শয়তানের ভাই । হারামের টাকা খেয়ে যারা পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রয়োগ করে, তারা তো সেই আলেম, যাদের দুঃসাহসিক বেইমানি ধর্মপ্রাণ বাঙালিদের জন্যে আজ চরম দুঃখের কারণ হয়েছে। কেননা তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে এতোকাল এরাই তো ইসলামের উদার মানবতা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় শাসক পশুশক্তিকে সহায়তা দিয়ে এসেছে। এসব ধর্মব্যবসায়ী মৌলবিরাই এ যুগের 'রাশপুটিন'। রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা এখন বাংলাদেশে এসে আসন গেড়ে বসেছে। অর্থাৎ জারের সাম্রাজ্য থেকে ইয়াহিয়ার দুস্যু-শিবিরে ।

ঢাকা বেতারের কথাই বলছিলাম আমরা। দুর্ভাগ্যজনক ঠেকে, যখন ঐ বেতারে হামদ-নাত ইত্যাদি প্রচারিত হতে দেখি। বাংলার কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রাকে বিড়ম্বিত করে একই মুখে সে ব্যাপারে মিথ্যা ও বানোয়াট প্রচারণা এবং রহমানুর রহিম ও রাহমতুল্লিল আলামীনের নাম-কালাম প্রচার সত্যি দুঃখজনক ।

- (রচনা ২০-৫-৭১। প্রচার ২১-৫-৭১)

৩১। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার ও শ্রমের মর্যাদা

আপনার-আমার কায়িক শ্রমই দেশ বা রাষ্ট্রের শ্রমশক্তি তথা জনশক্তি।

এই জনশক্তি যে-কোনো দেশের একটা বিরাট সম্পদ। এবং সবচেয়ে যা লক্ষ্য করার মতো, তা হচ্ছে, দেশের প্রতিটি মানুষই জনশক্তির এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । দেশ ও জাতির জীবনে যে-কোনো রকমের উৎপাদনের কাজে কোনো-না-কোনোভাবে সবাই নিয়োজিত— আর এই নিয়োজিত থাকা প্রত্যেকের জন্যেই অপরিহার্য। আর একটা কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় পরিবেশে উৎপাদন বা উন্নয়নমূলক সব কাজই যেমন অপরিহার্য, তেমনি সকল পর্যায়ে কাজের লোক বা জনশক্তির সদ্ব্যবহারও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোনো কাজই যেমন অমূলক নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সব রকমের কাজের ব্যাপারেই যেমন আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, উদ্যোগী হতে হয়— ঠিক তেমনি স্বভাবতই সকল পর্যায়ে কাজের লোকের ওপরেও আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে হতে হয় নির্ভরশীল। সহজ কথায়, কর্মজীবনে বা বেঁচে থাকার প্রশ্নে আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই প্রত্যেকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, আমরা সবাই একে অন্যের কাজের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য।

এই সামগ্রিক যোগসাজসের বাধ্যবাধকতার কারণে যে-কোনো শ্রম বা যে-কোনো পর্যায়ে শ্রমজীবীরই রয়েছে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা।

বাংলাদেশের মানুষ এই মানবিক মর্যাদা কোনো দিনই পায়নি। বাংলাদেশের কৃষক- শ্রমিকরা নিজেদের শ্রমের মূল্য পায়নি কোনো দিনই। বরং পেয়ে এসেছে অমানুষিক অবহেলা। পাকিস্তানি শোষকরা বাংলার শ্রমজীবী মানুষদের রক্তসম্পদ শোষণ এবং তাদের মানবিক মর্যাদাকে উপেক্ষা করেছে কায়েমিভাবে।

শোষকরা আবার পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলেও দাবি করেছে। দাবি করেছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের স্বেচ্ছাচারের একটি ভূখণ্ডকে মুসলিম দেশ বলে । কিন্তু ইসলাম তো কোনো খানখানান খান্দানিপনাকে অনুমোদন করে না। ইসলাম তো সাম্য মৈত্রীকে শুধু কেবল নমাজের জমায়েতে সীমিত করে দেয়নি— বরং মানবতার সম্মান, শ্রমের মর্যাদাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে সমাজজীবনে । ইসলামের নবি বলেছেন : শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই তার পাওনা মিটিয়ে দাও।— নবি বলেছেন : তোমরা নিজেরা যা খাও, ঘরের কাজের লোকদেরও তা-ই খেতে দাও। নিজে যে কাপড় পরো, সেই একই কাপড় পরতে দাও কর্মচারী বা ফাইফরমায়েস-খাটা লোকটিকেও।

ইসলাম বলে : যারা পরের সম্পদ লুট করে, তারা মুসলমান নয়। যারা

মানুষের ওপর জুলুম করে, তারা মুসলমান নয় ।

তাহলে কোনো ধরনের মুসলিম রাষ্ট্র ঐ পাকিস্তান?

বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে আজ আর বুঝতে বাকি নেই, পাকিস্তানি চেতনা হচ্ছে পবিত্র ধর্মের নামে সীমাহীন নিচাশয়তা ।

পাকিস্তানি চেতনা হচ্ছে, সরলপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেবার এক ঘৃণ্য উদ্যোগ।

আর তাই এই অভিশপ্ত চেতনা বাংলার মানুষকে ভোলাতে পারবে না। বাংলার মানুষের চোখের সামনে আজ এক সুন্দর ভবিষ্যৎ। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করা। আমাদের জনগণ কি চায়? জনগণের মৌলিক চাহিদা বা দাবি কি? জনগণ চায় এমন একটি দেশপরিবেশ, যেখানে তারা অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সুকুমার বৃত্তির পাবে অবাধ স্বাধীনতা— সেখানে তারা বাঁচার মতো বাঁচবে, মানুষের মতো বাঁচবে— যে দেশের উন্মুক্ত প্রান্তর হবে প্রতিটি মানুষের জন্মগত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র ।

বাংলার মানুষ— যে যার কর্মদক্ষতা অনুযায়ী কাজ'করবে— সব কাজই বিবেচিত হবে বিশিষ্ট এবং মর্যাদার। সমাজের কাছে কোনো কাজই হবে না হেয় প্রতিপন্ন।

বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষের মানবিক মর্যাদা শুধু কেবল ধর্মীয় উপাসনালয়ে মসজিদে- মন্দিরে সীমাবদ্ধ হবে না— খাবার ঘর থেকে শুরু করে সমাজজীবনের সর্বস্তরে সত্যিকার অর্থে মানবতার সম্মানকে করা হবে বিন্যস্ত। মুসলিমপ্রধান এলাকা বাংলাদেশে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি পরিব্যপ্ত হবে প্রত্যেক পদক্ষেপে। এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আজ বাংলার শ্রমিক-কৃষক যুবক-বৃদ্ধ সবাই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে হয়েছে অবতীর্ণ।

(রচনা ও প্রচার ২৯-৫-৭১। পুনঃপ্রচার ২৪-৬-৭১)

৩২। আমরা বাঁচবো আমরা গড়বো (২)

লড়াই চলছে। লড়াই চলছে গ্রামবাংলার অলিতে গলিতে সড়কে জনপদে— নগর বন্দর লোকালয়ে।

লড়াই করছে বাংলার মুক্তিবাহিনী হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে। এ লড়াই

তাদের জীবন-মরণ প্রশ্ন— তাদের দেশ ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের সামনে এখানে-ওখানে নগ্ন আক্রমণকারীরা হচ্ছে বিধ্বস্ত। ক্রমেই তারা পিছু হটছে। আর মরণ-কামড় দিয়ে যাচ্ছে নিরীহ নিরপরাধ বেসামরিক জনপদে। বোমা আর কামানের সাহায্যে তারা বাংলার সবুজ শ্যামল অঙ্গন প্রাঙ্গণকে করে দিচ্ছে বিরাণ। হামলাবাজরা নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণের ওপর অত্যাচার চালিয়ে হাজার হাজার পরিবারকে করেছে উচ্ছন্ন, নারী-পুরুষ শিশুবৃদ্ধকে করছে ঘরছাড়া ।

শুধু কি তাই? বিতাড়িত জনগণকে তারা করে চলেছে নির্বিচারে হত্যা। তাদের হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না বাংলার অবলা নারী, অবোধ শিশু-কিশোররাও।

হত্যাকারী পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা নব-নব অজুহাত সৃষ্টি করে হত্যাকাণ্ডের পরিধি চলেছে বাড়িয়ে। বাংলাদেশ এলাকায় নাকি তারা দেখতে পায় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের। এবং এই অজুহাত দেখিয়ে তারা বাংলার যুবকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করছে।

কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষকে তারা কিছুতেই পারবে না নিশ্চিহ্ন করে দিতে। সাড়ে সাত কোটি মানুষ বাঁচবে। ধ্বংসের বুকে তারা গড়বে নতুন আবাদ। তারই তো সূচনা দেখতে পাই বাংলার লড়াই-এর মাঠে ময়দানে সড়কে জনপদে।

দুর্বৃত্ত হানাদাররা যাদের বিতাড়িত করছে, সেইসব নিরস্ত্র নিরীহ নারী-পুরুষরা দলে দলে এসে আশ্রয় নিচ্ছে মুক্তিবাহিনী-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় । এখানে এসে তারা ঠাঁই পাচ্ছে। বাংলার রমনী দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এসে পৌছাচ্ছে মুক্তিবাহিনীর শান্তির আশ্রয়ে। পা ফুলে গেছে। মুক্তিবাহিনীর জোয়ান ছেলেরা তাঁদের মায়ের পায়ে আদরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে । অনাথ শিশুকে তারা নিচ্ছে কোলে তুলে । সন্তানহারা মা-কে দিচ্ছে সান্ত্বনা । তারা সঞ্জীবিত রাখছে উৎপীড়িত নিপীড়িত মানুষের মনোবল। বলছে : এই দুঃখ, এই দুঃশাসন নয় চিরন্তন। জয়ী আমরা হবোই। আমরা বাঁচবো। আবার আমরা গড়বো ধ্বংসস্তূপের বুকে নতুন আবাদ ।

- (প্রচার তারিখ?)

৩৩। দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া

সমগ্র বিশ্ব আজ সোচ্চার— পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের প্রতিটি মানুষের কাছে আজ সবচেয়ে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে হচ্ছে 'স্বাধীন বাংলা'- বাংলাদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই জীবনজয়ের দুর্বার দুর্দম পদযাত্রায় সবাই আশাবাদী— এই জয়যাত্রা সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক আদর্শেরই এক গৌরবোজ্জ্বল বিজয়স্বাক্ষর। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশ বাংলার জয় বিশ্বের পৌণে চারশ' কোটি মানুষের জয় ।

মানুষ সব সইতে পারে— কিন্তু অশুভ শক্তির হাতে মানুষের, বিশেষ করে, নিরীহ নিরপরাধ মানুষের লাঞ্ছনা আর হত্যাকাণ্ড দেখে কোনো মানুষ নিতে পারে না নীরব দর্শকের ভূমিকা ।

তাই যেদিন থেকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ বাংলার মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় দুর্বৃত্ত দজ্জাল পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে জীবনপণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তাদের এই ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতি বহির্বিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন। কেউই সমর্থন দিতে পারেনি পাকিস্তান সরকারের এরকম সশস্ত্র হামলাকে— অস্ত্রের বলে একটি মুক্তিপাগল জনপদে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাকে, বাংলাদেশের বুকে এমনি নির্বিচার গণহত্যাকে।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মন্তব্য করেছে : বাংলাদেশের স্বাধীনতা : সার্বভৌমত্ব একটি বাস্তব সত্য। বর্তমান পর্যায়ে এক পাকিস্তানের তথাকথিত ঐক্য ও সংহতি আর সম্ভব নয় ।

লন্ডনের 'গার্ডিয়ান পত্রিকা এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি সামরিক চক্রের এরকম শক্তিপ্রয়োগকে নৃশংস এবং জঘন্য বলে মন্তব্য করেছে। বলা হয়েছে, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার কোনো মূল্যই থাকতে পারে না। পত্রিকার মতে, এ অবস্থা আরো চলতে দেয়া হলে, তা মানবজীবন ও মানবতার জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে ।

বাংলাদেশের বুকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অশুভ শক্তিপ্রয়োগের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। তাদের মতে, বাংলার বেসামরিক জনপদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হামলা একটি বিয়োগান্ত ঘটনা। বলা হয়েছে, এরকম হামলার ফলে 'এক পাকিস্তান' নীতি সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে

গেছে। ভাষা, ভূগোল ও লোকাচারগত দুই অঞ্চলের চিরাচরিত বা প্রকৃতিগত ব্যবধানের সঙ্গে এখন আর একটি ব্যবধান গড়ে উঠেছে— সেটা হচ্ছে ঘৃণা। হামলাকারীদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে উৎপীড়িত বাঙালিদের মনে জেগেছে বা জাগরুক থাকবে অশেষ ঘৃণা এবং তার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানি পশুশক্তিই দায়ী।

আমেরিকার দি টাইমস অব সিটি স্টার পত্রিকার মতে, দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধানকে উপক্ষো করে নির্বিচার অস্ত্রশক্তির সাহায্যে বাংলাদেশকে শাসন করার পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভঙ্গি একটা বাতুলতা ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে এরকম বর্বরোচিত ঘটনা এটাই প্রথম— যা বাংলাদেশের বুকে এখন ঘটছে, বলেছেন ভারতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ । একটি বেতার কথিকায় তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও ইতিহাসের কুখ্যাত হামলাবাজদের আক্রমণে যা হয়নি, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি ধ্বংসলীলা এখন পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা বাংলাদেশে সংঘটিত হচ্ছে।

অথচ কি অপরাধ করেছিল বাংলার মানুষ? বাংলার মানুষ বাঁচতে চেয়েছে— বাঁচবার জন্যে খাদ্যবস্ত্র চেয়েছে, কর্মসংস্থান চেয়েছে। বাংলার মানুষ চেয়েছে সুখী ও স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্যে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার— বাংলাভূমির স্বাধীনতা । তাদের এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব দাবি জাতিসংঘ সনদের একটি অনুচ্ছেদের আলোকে একান্তই বৈধ। তবু বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাশবিক শাসনের এই জঘন্যতম ও অস্বাভাবিক উপায় কেন পশ্চিম পাকিস্তানি জঙ্গি সরকার অবলম্বন করেছে, এই জিজ্ঞাসার জবাব কে দেবে? এর একমাত্র জবাব বাংলার মুক্তিবাহিনীর জীবনপণ অগ্রাভিযান। এই অভিযান বর্বরতার বিরুদ্ধে আত্মনির্ভরতার এই অভিযান অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের- মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনজয়ের ।

আর তাই বাংলার মানুষ যখন 'জয় জয়' ধ্বনি দেয়, তার প্রতিধ্বনি ওঠে সমগ্র বিশ্বের পথে-প্রত্যন্তে !

বাংলার মা-বোন, বাংলার বধূর কান্না বিশ্বের সকল জনপদে প্রতিটি মানবশিশুর চোখে বয়ে আনে অশ্রুবন্যা।

বাংলার মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানদের জন্যে রয়েছে বিশ্বের অগণিত মা-বোনের অশ্রু-আশিস ।

জয় স্বাধীন বাংলা।— (প্রচার তারিখ?)

৩৪ । একজন বীরাঙ্গনার কথা

বিদ্রোহী কবির ভাষায় :

"জগতের যতো বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান ।
কোনোকালে একা হয়নিক' জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।'

বাংলাদেশ থেকে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতাড়িত করার সংগ্রামে বাংলার মেয়েরাও আজ এগিয়ে এসেছেন। আমাদের মা-বোনরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্যে অশেষ ত্যাগ ও তিতিক্ষা প্রদর্শন করে চলেছেন।

বাংলার অবলা রমণী আজ নিজের ভাইকে, নিজের সন্তানকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করতে পাঠিয়ে দিয়েই কর্তব্য শেষ করছেন না, দুশমন নিধনের কাজেও করছেন আত্মনিয়োগ । এ এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শত্রুকবলিত অঞ্চলগুলোতে আজ চলেছে এক ত্রাসের রাজত্ব। মুক্তিবাহিনীর বীর সৈন্যদের গেরিলা আক্রমণে অহরহ পর্যুদস্ত হয়ে হানাদাররা নিজেদের বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছে নিরস্ত্র নিরপরাধ জনপদে হামলা চালিয়ে। বাংলার বেসামরিক মানুষকে হত্যা, জনসাধারণের মালামাল লুটতরাজ এবং নারী নির্যাতন— এসবই হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের দৈনন্দিন কর্মসূচি।

পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে । বাংলাদেশের সর্বত্র। আমাদের মুক্তিবাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে নাজেহাল করছে। যেখানেই শত্রুবাহিনী ঘাঁটি গেড়ে বসছে, এক দণ্ডও স্বস্তিতে থাকতে পারছে না— প্রতি মুহূর্তেই তারা সন্ত্রস্ত ।

পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপই আজ তাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কারণ হয়েছে। বাংলাদেশের ওপর সামরিক শক্তি প্রয়োগ

করতে গিয়ে তারা আজ বড়ো বেসামাল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের নামে তারা করে চলেছে বিবেক- বিবর্জিত ও পশুসুলভ আচরণ। অধিকৃত অঞ্চলের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণকে নির্বিচারে হত্যা, বসতঘরে অগ্নিসংযোগ এবং নিষ্পাপ নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে তারা বাংলার মানুষ তথা বিশ্ববাসীর কাছে অশেষ ঘৃণা ও কলঙ্কভাজন হয়েছে। বাংলার নারী- পুরুষ সবাই আজ পাকিস্তানি দস্যুদের উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ— যে-কোনো মূল্যে হানাদার বর্বরদের ওপর প্রতিশোধ নিতে সবাই বদ্ধ পরিকর। জালেমের ওপর প্রতিশোধ নেবার এই প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্ত । যখন যেভাবে পারা যায়, দুশমনকে তার দুষ্কর্মের জন্যে সাজা দিতেই হবে। মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি বীর সৈনিক জীবনপণ করে তারই ব্যবস্থা করছে। শত্রুকে ঘায়েল করার মহান কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়েছে প্রতিটি বাঙালি। মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র শপথ, দেশ ও জাতির জন্যে আমরা মরবো— তবে মরবার আগে দুশমনদের একজনকে হলেও মারবো।

এই কঠিন কঠোর শপথ নিয়ে একজন দুর্বৃত্ত পাকবাহিনীর মেজরকে সম্প্রতি হত্যা করেছেন বাংলার এক বীরাঙ্গনা নারী । সে এক আশ্চর্যরকম ত্যাগ ও দুঃসাহসের কাহিনী । বেইমান চরিত্রহীন পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের অধিকৃত এলাকায় অকথ্যভাবে নারী নির্যাতন চালিয়েছে গোড়া থেকেই। কতো নিষ্পাপ রমণী তাদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে, তার হিসাব নেই। তাদের বর্বরতার হাত থেকে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে বিভিন্ন ছাত্রীনিবাস, নার্সেস কোয়ার্টার ও বাড়িঘরের অসহায় মেয়েরা হয়তো আত্মহত্যাও করেছেন । কিন্তু গত ১৭ মে ঢাকা টেলিফোন বিভাগের কর্মচারী বাংলার এক বীরাঙ্গনা নারী নিজের নারীত্বের অপমানের শোধ নিয়েছেন জনৈক পাকিস্তানি মেজরকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে। মেজরটি সেই মহিলাকে জোর করে ধরে নিয়ে ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীর একটি গৃহে আটক করে রাখে। অসহায় মহিলা সেই মুহূর্তে নিজের অবস্থা বিবেচনা করে দুর্বৃত্ত মেজরটির সঙ্গে ভাব করে ফেলেন। তারপর সুযোগ বুঝে তিনদিন পর মেজরের পিস্তলটি হস্তগত করেন এবং তা-ই দিয়ে মেজরকে গুলি করেন । এভাবেই তিনি তাঁর নারীত্বের অবমাননার চরম প্রতিশোধ নেন।

পরমুহূর্তেই পাহারাদার পাকসৈন্যের গুলিতে মহিলাটিকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কিন্তু সে মৃত্যু ছিল সুখের । কেননা জীবনের বিনিময়ে তিনি একজন উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি দুশমনকে নিজের হাতে হত্যা করতে পেরেছেন ।

একজন বাঙালি ললনার এই ধৈর্য ও ত্যাগ স্বাধীন বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার পথযাত্রায় অবশম্ভাবী সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করছে।

-(রচনা ও প্রচার ৮-৬-৭১)

৩৫ । দর্পণ (১)

হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি সামান্য কিছু অস্ত্র আর অগণিত মানুষকে সম্বল করে। আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর। আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে এক সুশৃঙ্খল পশুশক্তির, বিবেকবর্জিত নির্মম লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদলের।

হানাদারদের হাতে আছে কামান, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, রকেট, বিমান, গানবোট. যুদ্ধ- জাহাজ, মর্টার, মাইন— সব রকমের অস্ত্রই তাদের আছে। আর আছে এসব অস্ত্র পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। তারা হচ্ছে প্লাটুন, কোম্পানি, ব্যাটালিয়ান, ব্রিগেড, রেজিমেন্ট, ডিভিশন ইত্যাদি সুশৃঙ্খল স্তরে স্তরে নিয়োজিত দানবের দল। তাদের রয়েছে, যোগাযোগ রক্ষা বা খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্যে টেলিফোন, ওয়ারলেস, ট্রান্সমিটার আক্রমণ পরিচালনার জন্যে ট্রাক, লঞ্চ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন। এমনি সর্বাত্মক ও সর্বমুখি প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও ছ'মাসের যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে, দিনদিনই বাংলাদেশের রণাঙ্গনে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী হীনবল হচ্ছে এবং আমাদের .একরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা মুক্তিবাহিনীর সাফল্যজনক তৎপরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সাফল্যের মুলে কি রয়েছে? এর মূলে রয়েছে বর্তমান যুদ্ধের তিনটি বৈশিষ্ট্য— যেগুলো একান্তভাবেই আমাদের মুক্তিবাহিনীর অনুকূল।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে, এক— লক্ষ লক্ষ হানাদার সৈন্য সমাবেশ। অর্থাৎ বাংলাদেশে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষকে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের খাদ্য ও পোশাক যোগাতে হচ্ছে, অপরিমিত গুলিগোলা যোগাতে হচ্ছে, ব্যবস্থা করতে হচ্ছে হাসপাতাল, ছাউনি ও সুরক্ষিত স্থানের।

দুই- রণাঙ্গনের ব্যাপ্তি। সমগ্র বাংলাদেশই আজ বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র। অর্থাৎ পাকিস্তানি হানাদারদের জন্যে যাবতীয় যুদ্ধসরঞ্জাম ও রসদপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে শত শত মাইল এলাকায়।

তিন—যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতা। একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়। এক দু'সপ্তাহের নয়।

মাসের পর মাস পাকিস্তানি হানাদারদের বাংলাদেশে বর্বর অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছে।

এই তিন অবস্থার চাপে বিদেশী দুর্বৃত্তরা স্বভাবতই এখানে বিপাকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণত অধিকসংখ্যক সৈন্যের বিস্তৃত রণাঙ্গনে দীর্ঘসূত্রী আক্রমণ-অভিযান পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন জনসমর্থন। আর সেই জনসমর্থনের দিক থেকে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী একেবারেই দেউলিয়া। অন্যদিকে বাংলার মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানরা প্রাণঢালা সমর্থন ও সহানুভূতি পাচ্ছেন আপামর জনাসাধারণের ।

বাংলার রণাঙ্গন আজ একান্তভাবে সাধারণ মানুষের ওপর নির্ভরশীল। শুধু নির্ভরশীল নয়, এ যুদ্ধের ওপর আমাদের জনগণের রয়েছে সামগ্রিক আধিপত্য। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিবাহিনীতে রয়েছেন বাংলার সর্বশ্রেণীর যুবকররা। আমাদের চাষি-তাঁতি, মাঝি, জেলে, কামার-কুমোর, ছাত্র-শিক্ষক— সবাই আজ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন দলে দলে । অকৃত্রিম প্রাণের টানে, বাংলার জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় এ যুদ্ধে দেশের প্রতিটি মানুষই মুক্তিবাহিনীর প্রতি পোষণ করছেন আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ থেকে হানাদারদের নির্মূল করা এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করার এই সংগ্রাম পরিণত হয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল জনযুদ্ধে। অর্থাৎ আমাদের জনগণ যুদ্ধ করছেন একটি ক্ষমতাদর্পী বর্বর হানাদার পশুশক্তির বিরুদ্ধে।

যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞদের মতে, 'যদি কোনো দানবীয় সৈন্যবাহিনী অপর দেশ ও জাতিকে পদানত করতে চায়, সে দেশের মানুষ যদি বিদ্রোহী হয়ে রুখে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে হবে, সে দানবীয় শক্তি আত্মহত্যা করতে এসেছে। যে যুদ্ধ সাধারণ মানুষের সাহায্য, সহানুভূতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়, সে যুদ্ধে কোনো দানবীয় শক্তি কেমন করে আশেপাশে সামনে-পেছনে বিদ্রোহী জনসাধারণকে রেখে তার বাহিনী পরিচালনা করবে কিংবা তার রসদ, খাদ্য সরবরাহ করবে ও আশ্রয় যোগাবে?

দানবীয় শক্তি যতো বলশালীই হোক, তার অস্ত্রের ঝনঝনানিতে যতোই আমাদের কান ঝালাপালা করুক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে আজ জনগণের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ।

আর তারই ফলে ইতিহাসের বর্বরতম আক্রমণ-অভিযানে পাকিস্তানি সামরিক

বাহিনী পূর্ণাঙ্গ আধুনিক সমরসজ্জা নিয়ে অতর্কিতে এগিয়ে এসেও, বাংলার মুক্তিবাহিনীর হাতে চরম মার খেয়ে যাচ্ছে ।

দুর্বৃত্তরা চেয়েছিল নারকীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন করে জাগ্রত জনগণকে দমিয়ে দিতে। কিন্তু এখনো তাদের বোঝা উচিত, মা-বোন ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করে কোনো দেশের মানুষের মাথা নোয়ানো যায় না। বোমার আঘাতে গৃহ আঙ্গিনা ছারখার করেও মানুষকে করা যায় না ভীত পরাভূত। পৃথিবীর ইতিহাস এ ব্যাপারে বহুবারই সাক্ষ্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে। দস্যুতা অনাচার সাধারণ মানুষকে বরং করে তোলে ইস্পাতকঠিন। বাংলার প্রতিটি মানুষ আজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে শত্রুহননের প্রশ্নে ইস্পাতকঠিন শপথে ঐক্যবদ্ধ।

— (রচনা ৪-৮-৭১)

৩৬ । দর্পণ (২)

বিশ্ব ইতিহাসের ন্যক্কারজনক অধ্যায়ের আজ এক কলঙ্কিত দিন— আজ হিরোসিমা দিবস। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট শক্তিমদমত্ততার উন্মাদনায় অন্ধ সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন প্রভুদের নৃশংসতার শিকারে পরিণত হয় জাপানের হিরোসিমা শহর। অনেক আশা আনন্দ আর ঐশ্বর্যসম্ভারে সমৃদ্ধ জনপদ হিরোসিমা সেদিন একটি আণবিক বোমার আঘাতে হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। জাপানের আর একটি সমৃদ্ধ নগরী নাগাসাকিতেও নিক্ষিপ্ত হয় আণবিক বোমা। আণবিক আক্রমণে শহর দুটি মুহূর্তে রূপায়িত হয় ধ্বসস্তূপে। দুটি শহরে দু'লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। যারা প্রাণে বেঁচে যায়, কিন্তু বাঁচতে পারে না Radio Acitve Ashes — পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার অশুভ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির জনপদে আজো বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক ও দুরারোগ্য জন্মব্যাধি নিয়ে জন্মায় মানব শিশু ।

সেদিনের হিরোসিমা এক সীমাহীন বর্বরতার পরিচয় বহন করছে আজকের দিনেও । এবং আজকের দিনে বাংলাদেশের বুকে পাকিস্তানি সামরিক পশুশক্তি যে ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করছে, তার আর এক নাম অগণিত হিরোসিমা। হাজার হাজার মাইলাই ।

পাকিস্তানি আক্রমনে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল সদর করে বিশ্বব্যাঙ্ক মিশানের প্রতিনিধি বলেছেন : বাংলাদেশের প্রতিটি আক্রান্ত শহর স্মরণ

করিয়ে দেয় আণবিক বোমা বিধ্বস্ত হিরোশিমায় সকালকে ।

পাকিস্তানি বর্বরতার চিহ্ন আকাঁ হয়ে গেছে বাংলাদেশে প্রধান প্রধান শহর বন্দরগুলোতে। এই অমানবিক আক্রমণ সেদিনের হামলাকেও করে দিয়েছে ম্লান । সেদিনের নৃশংসতা জাপানের দু'টি শহরের ওপর দিয়ে যে সর্বনাশা ঝড় বইয়ে দিয়েছে, যে হারে গণহত্যা সংঘটিত করেছে, এবারে বাংলাদেশের বহুবিস্তৃত এলাকায় ঘটানো হয়েছে আরো নৃশংস, জঘন্য— তিলে তিলে গণহনন। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যতো মানুষ সেদিন করুণ মৃত্যু বরণ করেছে, বাংলাদেশের বুকে দুর্বৃত্ত হানাদারশক্তির আক্রমণের মুখে রক্তাহুতি দিয়েছে তার বহগুণ বেশি মানুষ। হিরোশিমার জনারণ্যে পশুশক্তির নগ্ন হামলাকে বিশ্ব ইতিহাসে চিরন্তন নিন্দার্হ করে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আজকের আক্রান্ত বিপর্যস্ত বাংলার দুশমনদের ন্যক্কারজনক কার্যকলাপকে কোনো ভাষায় বিবৃত করা হবে, আমরা বলতে পারি না।

কেননা সেদিনের আণবিক বোমবিধ্বস্ত হিরোশিমার সকাল বাংলাদেশে বর্বর হানাদার শক্তির বিরুদ্ধে এক অপূর্ব প্রাণোন্মাদনা এবং প্রতিরোধের প্রেরণা বহন করে এনেছে। এখানে ধ্বংসের আড়ালে দেখতে পাই নবোদিত সূর্য । তাই আমরা ধ্বংসকে ভয় করি না ।

- (রচনা ও প্রচার ৫-৮-৭১)

৩৭ । দর্পণ (৩)

একটি মারমুখী পশুশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমাদের জনসাধারণ। বাংলাদেশে এখন পরিচালিত হচ্ছে ব্যাপকভিত্তিক গেরিলা-যুদ্ধ। এই গেরিলাযুদ্ধ জনযুদ্ধ। দেশের প্রতিটি মানুষই যোদ্ধা। তারা যোদ্ধা, যেহেতু তারা হানাদার দুশমনদেরকে অতর্কিত আক্রমণে নাজেহাল করে দিচ্ছে। তারা যোদ্ধা,যেহেতু তারা বিদেশী বর্বরদের গতিরোধ করছে যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়ে । তারা কোনোরকম সহায়তা দিচ্ছে না দুর্বৃত্ত হানাদারদের। এবং সবার ওপরে, আমাদের জনসাধারণ মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানদের সহযোগিতা করছে যথাসাধ্য ।

শত্রুর হাতে রয়েছে সবরকমের মারণাস্ত্র, কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের হাতে কি আছে? অতি সামান্য অস্ত্রশস্ত্র আমাদের সম্বল। আমাদের প্রধান সম্বল বর্তমান যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর স্বপক্ষে বাংলার গণসমর্থন । আমাদের সম্বল,

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে ব্যাপক গণজাগরণ ।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা শুরু করেছিলাম যে-যুদ্ধ, সে-যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় শেষ হয়েছে। আমরা এখন সঙ্ঘবদ্ধ । আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে এখন অস্ত্র এসে গেছে— অস্ত্র আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি বিভিন্ন রণাঙ্গনে খণ্ডযুদ্ধে পরাভূত শত্রুদের কাছ থেকে ।

যে দুশমনরা ইতিপূর্বে আমাদের মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রমকে বেমালুম চেপে যেতে চেষ্টা করেছে, এখন তারা দিন দিনই ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকৃত কোনো এলাকাতেই আজ আর দুশমনরা নিরাপত্তা বোধ করছে না। কেননা সর্বত্রই তাদের বিরুদ্ধে সূচিত হয়েছে গণজাগরণ। গেরিলা যুদ্ধের প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে গণজাগরণ । বাংলাদেশ আজ বিরাট এক গেরিলা যুদ্ধক্ষেত্র। বাংলাদেশের মানুষ চারদিক থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে আঘাত হানছে শত্রুদেরকে।

গেরিলা-যুদ্ধের সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন গেরিলা বাহিনীর প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের আনুকূল্য। সম্ভবপক্ষে এ বাহিনী স্থানীয় যুবকদের সমন্বয়েই গঠন করা প্রয়োজন। এদিক থেকে আমাদের প্রস্তুতি ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। সঙ্ঘবদ্ধ একটি বিশাল বাহিনী হিসেবে নয়, বরং ছোট ছোট দলে আমাদের গেরিলারা বাংলাদেশের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্রই তারা দুশমনদের ঘায়েল করার কাজে তৎপর। কোনো সীমাবদ্ধ এলাকায় নয়, বরং বিস্তীর্ণ এলাকায় গেরিলাদের ছোট ছোট দল অহরহ অগণিত পাকিস্তানি সৈন্যকে খতম করে চলেছে।

জনবহুল অথচ দুর্গম স্থানগুলো গেরিলা-যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা হাতবোমা, রাইফেল ইত্যাদি হাল্কা যুদ্ধসরঞ্জাম নিয়ে যেমন নিজেদের চেনাজানা পথঘাটে চলাফেরা করতে পারে এবং সাফল্যজনক আক্রমণ অভিযান চালাতে পারে, তেমন তো আর বিদেশী বর্বর সৈন্যরা পারে না। দুর্গম পথে তাদের ভারি যুদ্ধাস্ত্র ও যানবাহন চলাচল সম্ভব নয় ।

আমাদের মুক্তিবাহিনীর জন্যে গেরিলা-যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যা সহায়ক হয়েছে, তা হচ্ছে আমাদের বাহিনীর জোয়ানদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের ভৌগোলিক জ্ঞান বা স্থানবিচরণের জ্ঞান। আমাদের জোয়ানদের জানা আছে তাদের কর্মক্ষেত্রের ও আশপাশের অঞ্চলের প্রতিটি খুঁটিনাটি

বিষয়ের খবর— নদী-নালা, টিবি - বিল, বাওড় গ্রাম বাড়ি রাস্তাঘাট ঝোপঝাড় সব কিছুই তারা চেনে জানে। বিশেষ করে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করার সোজা পথগুলো আমাদের জোয়ানদেরই তো জানা আছে। সোজা পথ জানা থাকায় শত্রুকে তারা সহজেই ঘায়েল করতে পারছে।

গেরিলা যুদ্ধের সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন অধিকসংখ্যক মানুষের এ বাহিনীতে যোগদান। এদিক থেকে আমরা দিন দিনই সফলকাম হচ্ছি। আমাদের মুক্ত অঞ্চলগুলোতে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ সংক্ষিপ্ত কোর্সে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। এ সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সমগ্র জনসাধারণ দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আজ প্রতিটি বাঙালি যেন রক্তবীজের বংশধর ।

— (রচনা ও প্রচার ১৩-৮-৭১। পুনঃপ্রচার ৮-১০-৭১)

৩৮ ।মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি থেকে (১)

যখন শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজি, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ওদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করি, সেই অবকাশে এক-এক সময় মনে হয়, দু'হাতের একটি মামুলি আগ্নেয়াস্ত্র সম্বল করে এমন স্বল্পমেয়াদি যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে এই আমি কিসের জোরে সম্মুখীন হচ্ছি একটি সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর? কিছুদিন আগেও ছিলাম ছাত্র অথবা শ্রমিক, ছিলাম চাষী কিংবা দোকানদার । কেউ ছিলাম বড়োঘরের আদরের দুলাল, কেউ-বা গৃহভৃত্য । আজ আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। আজ সকলের এক নাম, এক খাদ্য, একই ক্যাম্প-জীবন এবং একই বাঙ্কার ।

আমাদের প্রত্যেকেরই এক লক্ষ্য, দেশ থেকে হানাদারদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা— দেশকে শত্রুমুক্ত করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের প্রতিটি প্রতিরোধ অভিযান— পালন করছি একনিষ্ঠ শত্রুহনন-যজ্ঞ।

আমাদের সংগ্রামী জীবনের আর এক নাম স্বদেশের স্বাধীনতা। দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ অথবা মৃত্যুবরণ ।

অথচ তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, এই জীবনযুদ্ধের প্রস্তুতি আমার কতটুকু?

কি আমার আছে? কি দিয়ে আমি ঠেকাবো এই বিকট বীভৎস পশুশক্তিকে? বিবেক বিবর্জিত একদঙ্গল খুনি লুটেরা লম্পটকে দমন করার জন্যে উপযুক্ত হাত আর হাতিয়ার যে আমার নেই। বুনো ওলের জন্যে বাঘা তেঁতুল অথবা যেমন কুকুর, তার জন্যে তেমন মুগুর আমার কোথায়?

কিন্তু কে বলে আমার শক্তি সামর্থ্যের অভাব? আমার শক্তি আমাদের ঐক্যবোধ— আমার শক্তি আমাদের সংগঠন। আমি আজ ছাত্র নই, শ্রমিক নই শিক্ষক চাষি-দোকানি নই, ধনীর দুলাল যা গৃহভৃত্য নই । আমাদের এক পরিচয়, আমরা মুক্তিযোদ্ধা । আমাদের এক শত্রু । পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। বাংলাদেশের জনগণের শত্রু, আমাদের শত্রু ।

আর জনগণ? বাংলার জনগণের আর এক পরিচয় সাড়ে সাত কোটি মুক্তিযোদ্ধা সবাই আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমি মুক্তিযোদ্ধা, আমার ভাই মুক্তিযোদ্ধা। আমার পিতা মুক্তিযোদ্ধা। আমার বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা আমার বোন, আমার মা। মা আমাকে দেশের জন্যে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিতে উৎসাহ দিয়েছেন। বোন আমাকে চোখের জলে সিক্ত হয়ে অভিষিক্ত করেছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। বাংলার গ্রামবাসী বৃদ্ধ লাঠি-ভর দিয়ে বাঙ্কারে আমার খাবার দিয়ে গেছেন। গৃহবধূ হাঁড়ি থেকে বেছে বেছে ভালো আনাজ তরকারি তুলে দিয়েছেন আমার টিফিন ক্যারিয়ারে। নতুন যে সেক্টরে আমি গিয়েছি, আশ্রয় দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পজিশন নেবার জন্যে অলিগলি পথ চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। একজন মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ করে তাঁরাও সবাই নিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধার সক্রিয় ভূমিকা। সবাই এখানে মুক্তিযোদ্ধা। সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি জাতি-মুক্তিযোদ্ধা । সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি দেশ এক বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র।

আমরা তো জানি, আমাদের বাবা-মায়েরা গ্রামবাংলার অধিকৃত এলাকায় আমাদের পথ চেয়ে প্রহর গুনছেন। আমরা তাঁদের সন্তান- আমরা ট্রেনিং নিয়েছি, যোদ্ধা হয়েছি। শত্রু হননের কাজের জন্যে আমরা বাবা-মায়েদের কাছ থেকে দুরে সরে রয়েছি। ওঁরা যখন শুনতে পান আমরা গ্রামবাংলার এখানে-ওখানে শত্রুদের নাজেহাল করে ছাড়ছি, শত্রুদের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিচ্ছি, তখন তো গর্বে তাঁদের বুক ফুলে ওঠে। ওঁরা ভাবেন, এর চেয়ে সুখের আর কি আছে, আমাদের ছেলেরা দেশের জন্যে লড়ছে মায়ের ইজ্জত, বোনের সম্ভ্রম, দেশের মানুষের জন্মগত অধিকার রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব

আমাদের ছেলেরাই আজ গ্রহণ করেছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে? মা-বাবার মনের খবর আমি আমার অনুভবের মধ্যেই পাই। আর সে মুহূর্তে মনে হয়, আমার অসহায় বোধ করা শোভা পায় না ।

যুদ্ধের জন্যে পর্যাপ্ত অস্ত্রের অভাব বা পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং-এর অভাব আদৌ আমাকে হীনবল প্রতিপন্ন করছে না। আমি যে একটি দেশ, একটি জাতির বড় অন্তরঙ্গ- একটি দেশ-রণাঙ্গনে একটি যোদ্ধা জাতির আমি যে এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ ।

ঘৃণার্হ সামরিক জান্তা আমার হাতে ঘায়েল হচ্ছে ক্রমাগত। ওরা বাংলার শত্রু- ওদেরকে ঘৃণা করতে শিক্ষা করেই আমি আমার জন্ম ও লালনভূমি, কর্ম ও যুদ্ধক্ষেত্র বাংলাদেশকে ভালোবাসতে শিখেছি আরো গভীর, আরো নিবিড়ভাবে।

(রচনা ২৪-৮-৭১। প্রচার ২৫-৮-৭১। পুনঃপ্রচার ৫-৯-৭১ ও ১২-৯-৭১)

৩৯। মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরি থেকে (২)

একটু আগেই ফিরেছি আপারেশন থেকে। এবারের অপারেশনটি ছিল আকস্মিক।

আমাদের টহলদারি কর্মীরা দুশমনের গতিবিধি টের পেয়ে ক্যাম্পে খবর দেন। হাতে সময় পেয়েছিলাম খুব কম। আমরা মাত্র ৫ জন হাতবোমা আর রাইফেল-কার্তুজ নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই নির্দিষ্ট স্থানে। রাস্তার পাশেই একটা সুবিধাজনক ঝোপঝাড়— রাস্তার লেবেল থেকে বেশ একটু উঁচু। দু'দিকে শহরতলির সরল প্রশস্ত রাস্তার অনেক দূর অবধি দেখা যায় ওখানে বসেই। আমরা শিকারি বাঘের মতো ওঁৎ পেতে বসে রইলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয় ।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। একজন বৃদ্ধ লোক আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। নিজেই তিনি ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাদের ইশারা করলেন চুপ করতে । বললেন : তোমাদের পেছনে আমি এগোচ্ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে— পেছন থেকে ডাকিনি। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক ।

প্রশ্ন করলাম : আপনি কে?

বললেন : আমি একজন বাঙালি। বয়স হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। তাই তোমাদের

মতো কাঁধে রাইফেল বইবার শক্তি নেই। বাড়ির জোয়ান ছেলেদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছি ।

আমার সঙ্গীদের একজন জিজ্ঞেস করলেন : আপনার বাড়ি কি কাছেই, দাদু?

: হ্যাঁ, ভাই! ঐ যে পাড়াটা, ওখানে আমার বাড়ি ।

আমি বললাম : আপনি আমাদের জন্যে দোয়া করুন। এ পথ দিয়ে শত্রুর গাড়ি যাবে— আমরা ওদের খতম করার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি । আপনার জন্যে এখানে থাকা নিরাপদ নয়, আপনি বাড়ি যান ।

: হ্যাঁ, ভাই! আমি বাড়িতেই ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ভালোয় ভালোয় কাজ শেষ করো। আর আমার একটা অনুরোধ-

: কি, বলুন ।

: দুশমনদের উচিত সাজা দিয়ে যখন তোমরা ক্যাম্পে ফিরে যাবে-পথে আমার বাড়িতে দু'টি ডাল-ভাত খেয়ে যাবে। আমি একটু দূরেই অপেক্ষা করছি তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ।

এমন সময় দূর থেকে গাড়ির শব্দ ভেসে এসেছিল। আমরা সবাই সচেতন হয়ে উঠলাম । শব্দ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। আরো কাছে এগিয়ে আসছে দুশমনদের গাড়ি । একই সঙ্গে পাঁচটি হাতের মুঠোতে পাঁচটি হ্যান্ড গ্রেনেড-পাঁচটি নিরাপদ পিনের বালা আমাদের প্রত্যেকের দাঁতের কামড়ে বিচ্যুত হলো । প্রচণ্ড পাঁচটি শব্দ একযোগে প্রচণ্ডতম হয়ে মাটিতে কম্পন তুললো। শত্রুসৈন্য ও রসদবাহী দু'টি ট্রাক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হলো।

হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়েই আমরা উঁচু জায়গাটির উল্টো ঢালুতে নেমে গিয়েছিলাম । আমাদের একজন বেসামাল হয়ে পায়ে একটু চোট পেয়েছিল। তেমন কিছু নয়-বন্ধুটি আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে পারছিল।

ইতোমধ্যে আমাদের দু'জন গ্রেনেড-বিধ্বস্ত স্থানের অবস্থাটা একটু দেখে আসতে গিয়ে হাসিমুখে ফিরে এলো। আমাদের অপারেশন আশাতীতভাবেই সফল হয়েছে। শহর থেকে এ পথ দিয়ে যাবার ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে । আমরা ফিরে চললাম

ক্যাম্পের দিকে। বেশি দূর যেতে হলো না। বহু মানুষের একটা জটলা

দেখতে পেলাম অদূরে। সবাই ফিসফিস করে কি সব বলাবলি করছে; আমরা কাছে যেতেই সেই দল থেকে বেরিয়ে এলেন সেই বৃদ্ধ লোকটি। একে একে আমাদের সবাইকে বুকে জড়িয়ে কপালে চুমো খেলেন। যে বন্ধুটির পায়ে চোট লেগেছিল, তাকে বৃদ্ধের ইঙ্গিতে কয়েকজন মাঝবয়সী গ্রামবাসী পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন এবং কাছেই বৃদ্ধের বাড়ি পর্যন্ত পৌছিয়ে দিলেন ।

বাঙালির প্রিয় মাছভাত— তাই দিয়ে বৃদ্ধের গৃহিণী আমাদের আপ্যায়ন করলেন। ভাতের পর দুধ । দেখলাম বাড়ির অন্য অংশীদারদের ঘর থেকেই দুধটা এসেছে।

আমরা বেশি দেরি করতে পারছিলাম না। ক্যাম্পে ফিরে আসতে চাইলাম। কিন্তু বৃদ্ধ কোনো অবস্থাতেই আমাদের আহত বন্ধুটিকে বিদায় দিতে চাইলেন না। যদিও আঘাতটি ছিল অত্যন্ত মামুলি — তবু বৃদ্ধের আগ্রহে রাতটি তাকে ওখানেই কাটিয়ে যেতে হবে । আমরা তা-ই মেনে নিয়েছিলাম ।

আমাদের গেরিলা পদ্ধতির অপারেশনটির সাফল্যের জন্যে আমরা আজ যে সংবর্ধনা পেলাম, এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। জয়ধ্বনি দিয়ে ওরা আমাদের নিয়ে আনন্দ উল্লাস করেননি, নীরব ভাষায় প্রকাশ করেছেন কৃতজ্ঞতা। দেশের মুক্তিসংগ্রামী যুবকদের এর চেয়ে বেশি আর কি কাম্য থাকতে পারে! যে অঞ্চলেই ছোটোখাটো অপারেশনে আমাদের যে ক্ষুদ্র দলটি যায়, স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাণঢালা সহানুভুতি আর সহাযোগিতায় তা হয়ে ওঠে সফল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের পথে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো সম্বল।

আমাদের আজকের সফল অপারেশনটির মূলে ছিল টহলদারি গেরিলা কর্মীর সঠিক তথ্যনির্দেশ । ইতোমধ্যে আমাদের টহলদারি কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় উপযুক্ত ট্রেনিং নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে। নিয়মিতই তারা আমাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে খবর দিচ্ছে, কোথায় কোনো এলাকায় দুশমনরা ঘাঁটি গেড়েছে, কোনো সময়ে কোনো পথ দিয়ে হানাদাররা চলাচল করতে পারে, ওদের আনুমানিক সংখ্যা কতো ইত্যাদি ।

প্রতিটি সফল অপারেশন শেষে মনে এ বিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, আমাদের বিজয় সত্যি ঘনিয়ে আসছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দাবিকে কোনো হানাদার দস্যুশক্তিই আর পারবে না ঠেকিয়ে রাখতে ।

রচনা ৮-৯-৭১ । প্রচার ৯-৯-৭১ । পুনঃপ্রচার ৭-১০-৭১)

৪০ । বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায়

বাংলাদেশে গেরিলা বাহিনীর হাতে সর্বত্র নাজেহাল হয়ে দুর্বৃত্ত পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নতুনভাবে আবার আমাদের বিভিন্ন জনপদে বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করেছে। আমাদের দুঃসাহসী গেরিলা কর্মীদের হাত থেকে নিজেদের অধিকৃত এলাকায় দখল এবং নিরস্ত্র জনগণের ওপর উৎপীড়ন অভিযান অব্যাহত রাখার জন্যে হানাদার দস্যুরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এ মুহূর্তে আমাদের গেরিলা বাহিনীর এবং সংগ্রামী জনগণের আত্মরক্ষার প্রশ্ন ও পাল্টা আক্রমণ পরিচালনার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে আমাদের বীর গেরিলারা যেখানে জড়ো হয়ে অবস্থান করতে বাধ্য হবেন, সেই স্থানেই বিমান আক্রমণ করে দুর্বৃত্তরা আমাদের ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করবে।

বিমান আক্রমণের সম্মুখে আত্মরক্ষার জন্যে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, আত্মগোপন করা । শত্রুর বিমান গৃধিনী-শকুনির মতো বাংলাদেশের মানুষকে মারতে আসছে— কিন্তু শকুনি হয়েও সে শকুনির মতো চক্ষুর অধিকারী নয়, কারণ বিমান মাটি ছেড়ে কিছু ওপরে উঠে গেলেই নিচে সবই আবছায়া হয়ে আসবে। বোমারু চালক বেগবতি বিমানের ওপর থেকে দুরবীণের সাহায্য নিতে পারে না। খোলা চোখেও দৃষ্টি বেশি দূর চলে না। এই বাস্তব দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বিমান আক্রমণের সময় আত্মগোপন করা খুবই সহজ- বিশেষ করে আমাদের গেরিলা বাহিনীর ছোট ছোট দলের পক্ষে।

বোমারু বিমান উড়ে আসছে দেখতে পেলেই আত্মগোপনের সহজ উপায় হিসেবে নড়াচড়া বা চলাফেরা বন্ধ করে একই স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে । খোলা মাঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ওপর থেকে লক্ষ্য করা সাধারণত সম্ভব নয় ।

শত্রুর বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে সময় পাওয়া গেলে গেরিলাদের একস্থানে জড়ো হয়ে না থেকে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পরা দরকার । অনেকগুলো অস্পষ্ট ছোট বিন্দু একত্রিত না থেকে যদি ছড়িয়ে থাকে, তবে সহজে নজরে আসে না। প্রত্যেকের অন্তত ৮/১০ হাত দূরে দূরে আঁকাবাঁকা

লাইন করে থাকা দরকার। কোনো বড়ো গাছ, দেয়াল বা বাড়ির ছায়ায় থাকলে বোমারু চালক এক হাজার ফিট ওপর থেকেও নজর করতে পারবে না ।

আমাদের দেশের গ্রামীণ এলাকায় বন-ঝোপের অভাব নেই। বনাঞ্চলের আড়ালে আশ্রয় নিলে বিমানকে বোকা বানানো সহজ। তবে বনের মধ্যেকার খোলা মাঠ বা রাস্তা ওপর থেকে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। সেজন্যে বোমারু মাথার ওপর থাকা অবস্থায় গাছের আড়াল ছেড়ে রাস্তায় ওঠা ঠিক নয়। তবে রাস্তার পাশে গাছের ভালো ছায়া থাকলে তার আড়ালে নির্বিবাদে আত্মগোপন করে গেরিলারা চলাফেরা করতে পারেন ।

একা আত্মগোপন করার প্রশ্নে প্রথমে নিজের পোশাকের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। দূর থেকে লাল রং বেশ ভালো দেখা যায়-এর পর নীল এবং হলুদ। এ ছাড়া অন্যান্য রং যেমন ধূসর, খাকি বা সবুজ রং আদৌ দূর থেকে নজরে আসে না। আবশ্য একটা জিনিস লক্ষ্য রাখা দরকার-সেটা হচ্ছে, আমরা যেখান থেকে চলাফেরা করব, সে স্থানের ঘাস বা ক্ষেতের ফসল বা মাটির রং অনুযায়ী পোশাকের রং করতে পারলে আত্মগোপন করা খুবই সহজ। বিমান তো দূরের কথা, গেরিলারা গাছের গুঁড়ির মতো হাবিজাবি রঙের পোশাক পরে পথের পাশে গাছের গুঁড়ির নিকটে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত সাইকেল বা মোটর যাত্রী শত্রুর দৃষ্টি এড়াতে পর্যন্ত সক্ষম।

দূর বা উপর থেকে সাধারণত মানুষের মুখমণ্ডলই সহজে নজরে আসে। সেজন্যে বিমান হামলার সময় গেরিলারা নাকের ওপর দিকে খাকি রঙের রুমাল বেঁধে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবেন : আমাদের দেশে যেখানে-সেখানে লতাগাছ পাওয়া যায়—এই লতা মুখে জড়িয়ে রাখলে কাজ হাসিল হতে পারে। বিশেষ করে মাথার কালো চুলকে ঢাকবার

জন্যে লতাপাতার সাহায্য নিলেই চলবে । খোলা হাত বা মুখমণ্ডলকে গোপন করার জন্যে রঙের গুঁড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে । এই রং মাখবার উপায় হলো, এক বা দুই ইঞ্চি চওড়া একটি বা দুটি রেখা মুখের ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা বা কোনোাকুনি করে টেনে দিতে হবে। মুখের সর্বত্র রঙের প্রলেপ দিলে কাজ হবে না-গাঢ় রঙের রেখায় মুখের আকৃতিকে বিকৃত করাই হচ্ছে াসল উদ্দেশ্য। এ ছাড়া 'মাসিনার' কাল রং-এ হাত-মুখ রাঙিয়ে বিকৃত করে নিলে বোমারু চালককে শুধু বিভ্রান্ত করা নয়, বরং অন্ধকারে শত্রুর সামনে দিয়েই আত্মগোপন করে চলাফেরা করা সম্ভব ।

আত্মগোপন করে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত অতিক্রম করার সময় ওপরে হামলাকারী বিমান এসে পড়লে এমনভাবে শুয়ে পড়তে হবে, যাতে ওপর থেকে দেহের আকৃতি স্পষ্টভাবে নজরে না আসে অর্থাৎ হাত-পা গুটিয়ে পড়ে থাকতে হবে। ওপর থেকে মনে হবে, হয়তো-বা কৃষকের ফসলের বস্তা বা কাটা শস্যের আঁটি পড়ে আছে ।

আত্মগোপনের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে গেরিলাদের সঙ্গে একখণ্ড হালকা সবুজ রঙের কাপড় অবশ্যই রাখা দরকার। ঝোঁপের আড়ালে হোক, খোলা মাঠে হোক, চাষ করা জমির আলের ওপরেই হোক— বাংলার যে কোনো স্থানে হালকা সবুজ রঙের কাপড়ে নিজেকে ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকলে, বোমারু বিমান কেন যে কোনো চলতি যান থেকে ও দুশমনরা আমাদের সহজে দেখতে পাবে না ।

বিমান হামলার সময় পূর্বপ্রস্তুতির একান্ত অভাব হলে মাটি কামড়িয়ে পড়ে থাকাই হচ্ছে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। গ্রাম-বাংলার মাঠে ঘাটে গর্ত, নালা এবং উঁচু নিচু ঢালুর অভাব নেই । একেই আশ্রয় করে পড়ে থাকতে হবে। শিশু যেমন মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়, আমরাও তেমনি আশ্রয় নেবে। দেশের মাটির বুকে ।

প্রসঙ্গত গত মহাযুদ্ধের সময় একজন জার্মান সৈনিক মাটি কামড়িয়ে পড়ে থেকে বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরে বলে উঠেছিলেন : আহা, কে জানতো, মাটি-মায়ের কোলে এতো নিরাপদ আশ্রয় মিলতে পারে! মাটিকে এর আগে কখনো এতো ভালোবাসতে শিখি নাই ।

আমাদের দেশের মাটিকেও আমরা আজ নতুন পরিচয়ে ভালোবাসতে শিখলাম এতো নিবিড় এতো গভীরভাবে ।

— (রচনা ও প্রচার ৯-৯-৭১ । পুনঃপ্রচার ১১-৯-৭১)

৪১। বিমান হামলাকালে পাল্টা আক্রমণ

পাকিস্তানি বর্বর শক্তির আধুনিক সর্বনাশা বিমান হামলার মোকাবিলায় আমাদের নগণ্য অস্ত্রসম্ভার নিয়ে প্রথমত, আত্মরক্ষার প্রশ্নটি বেশি করে ভাবতে হবে। তবু আমরা রয়েছি মাটিতে এবং শত্রু আকাশ-পথে এ অবস্থায় তাদের জীবনই তুলনামূলকভাবে বেশি বিপদাপন্ন, মনে করতে হবে। আর সেই

দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই হামলাকারী শত্রুকে ঘায়েল করার চেষ্টা করতে হবে।

বোমারুরা সাধারণত অনেক ওপর থেকেই বোমা ফেলতে পারে। কাজেই তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু 'ফাইটার' বিমান যখন মেশিনগান চালিয়ে আমাদের মারতে আসে, তখন তাকে নিম্নগামী হয়ে ছোঁ মারার মতো করেই মেশিনগান চালাতে হয় ।

আমাদের গেরিলাদল কোনো খোলা মাঠে অবস্থানকালে ‘ফাইটার' বিমান হামলার মুখে পড়ে গেলে এবং আত্মগোপন করার সুযোগ না পেলে, সেই মুহূর্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। কেননা তখন অবস্থা বিপাকে পড়ে গিয়ে তা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না।

গেরিলাদের হাতে অবশ্যই রাইফেল থাকবে এবং মনে রাখতে হবে, বিমানের মতো মারণযন্ত্রও রাইফেলের গুলিতে কাবু হতে পারে।

কোনো বিমান যখন ৩০০ গজের অধিক ওপরে থাকে, তখন গুলি খরচ করে লাভ নেই। তবে সৈন্যবাহী বিমান অল্পেতে ধ্বংস হয় বলে ৬০০ গজের মধ্যে পেলেও গুলি করার চেষ্টা করা উচিত। বোমারু বা ফাইটার বিমান যখন সোজা মাটির সমান্তরালে বেগে ছুটতে থাকে, তখন তাক করে লাভ নেই। কেননা, তখন বিমানের গতি থাকে সাধারণত ৩০০ মাইল । এতো দ্রুত গতিসম্পন্ন লক্ষ্যকে ভেদ করা সত্যি কঠিন— যাঁরা উড়ন্ত পাখি শিকার করতে অভ্যস্ত, তাঁরা এটা বুঝতে পারবেন ।

প্রথমেই যেদিক বরাবর বিমান ছোঁ মারবে, সেই লাইন ধরে দু-তিনটি ছোট ছোট দলে গেরিলাদের কিছু দূর অন্তর অন্তর মাটিতে শুয়ে তৈরি হতে হবে : ছোঁ মারবার উদ্দেশ্যে বিমানগুলো ঢেউ তুলে উঁচু-নিচু হবার সময় দেখা যায়, তারা কোনো কোনো বিন্দুতে আমাদের গুলির সোজা লাইন অতিক্রম না করে সেই লাইন বরাবর কিছুটা সময় নামতে বা উঠতে থাকে। এটাই হচ্ছে বিমানকে গুলি করবার প্রকৃত সময় ও সুযোগ। আমাদের রাইফেলের টার্গেট বা লক্ষ্য হবে বিমানের দেহ— পাখা নয়। গুলি করার অল্প আগে থেকেই উড়ন্ত বিমানের সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের নলকে সরাতে হবে। বিমান যদি খুব কাছাকাছি এসে পড়ে, তবে বিমানের নাক বরাবর গুলি ছুঁড়তে হবে । যদি দূরে থাকে, তবে নাকের খানিকটা সামনের অংশে লক্ষ্য করা দরকার ।

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বিমান থেকে ছত্রী- সৈন্য নামাবার দু:সাহসও প্রদর্শন

করতে পারে। বিশেষ করে আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছাউনি এলাকাতে হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত ছত্রীসৈন্য নামিয়ে দিয়ে তারা বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা করতে পারে। প্যারাস্যুটের সাহায্যে ছত্রী-সৈন্যরা বিমান থেকে অবতরণ করতে থাকে। এরকম অবতরণের আভাস পাওয়া মাত্র আমাদের গেরিলারা তৈরি হতে পারলে দুর্বৃত্তদের খতম করা খুবই সহজ । কারণ প্যারাস্যুট বা ছাতা মেলে এরা যখন শূন্যে দুলতে থাকবে, তখন নিচে থেকে গুলি করে ছাতা ফুটো করে দিলেই কাজ হলো । অমনি হানাদার ছত্রী-সৈন্যটি ঝুপ করে পড়ে মরবে।

অবশ্য এক রকমের প্যারাস্যুট আছে-যার সাহায্যে বিমান থেকে মাটিতে নামতে মাত্র ৫ সেকেন্ড সময় লাগে। কাজেই ছাতা গুলিবিদ্ধ করে এদেরকে ভূপাতিত করার অবকাশ মিলবে না। তবে আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে, মাটিতে পৌছানো মাত্রই দুর্বৃত্ত ছত্রী-সৈন্যকে খতম করা সম্ভব। যতো দ্রুতই ছত্রী-সৈন্য মাটিতে অবতরণ করুক, কিন্তু গা-ঝাড়া দিয়ে আত্মসংবরণ ও হাতে অস্ত্র তুলে নেবার আগেই আমাদের গেরিলারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বা তার দিকে গুলি ছুড়ে তার দফা রফা করে দিতে পারেন!

আমাদের দেশ নদীনালার দেশ। এখানে সী-প্লেনের সাহায্যে হানাদাররা আর এক রকমের আক্রমণাত্মক তৎপরতা গ্রহণ করতে পারে। যেমন সী-প্লেন বা জলচর বিমানে সোজা কোনো নদীর বুকে সৈন্য নামিয়ে রাবার বোটের সাহায্যে ছোট ছোট দলকে দুই তীরে ছড়িয়ে দেয়া । এ ব্যবস্থায় শত্রুদেরকে নদীর বুক থেকে রাবার বোটে চেপে আদৌ গা-ঢাকা না দিয়ে তীরের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে হবে। কাজেই সতর্ক গেরিলাবাহিনীর হাতে এদের নিস্তার পাবার আশা মোটেই থাকার কথা নয় ।

আমাদের গেরিলাদের সব সময়েই শত্রুর বিমানের চলাফেরার দিকে নজর রাখতে হবে। বিমানের আনাগোনো সম্পর্কে সজাগ থাকা বেশ সহজ— কেননা বিমান শব্দ না করে চলতে পারে না। বিমান হামলার এই বাস্তব দুর্বলতা নিঃসন্দেহে আমাদের গেরিলাদের স্বার্থের অনুকূল। অবশ্য বর্বর পাকিস্তানি বিমান হামলাকারীরা আমাদের সজাগ দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অনেক উঁচুতে বিমান উড়িয়ে এগিয়ে আসতে পারে। গন্তব্যস্থানের ১০০ মাইল দূরে খুব উঁচুতে উঠে গিয়ে সেখান থেকে হাত-পা ছড়িয়ে দেবার মতো মেশিন বন্ধ করে gliding করে বা ধীরে ধীরে ভেসে এসে তারা গন্তব্যবস্থানে পৌঁছানোর অপকৌশল

অবলম্বন করতে পারে । এ উপায়ে অতর্কিত বিমান হামলা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু শত্রুর যে-কোনো অতর্কিত হামলার যোগ্য জবাব দেবার জন্যে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা আজ সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। যে-কোনো আক্রমণের পাল্টা আক্রমণ সার্থকভাবেই সম্পাদন করছে আমাদের মুক্তিবাহিনী ।

— (রচনা ১১-৯-৭১। প্রচার ১২-৯-৭১)

৪২। আমরা গেরিলা (১)

আমরা পরিণত হয়েছি একটি যোদ্ধা জাতিতে। একান্তই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে আমাদের মুক্তিবাহিনী— আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছি চার/পাঁচ জনের এক-একটি দুর্ধর্ষ গেরিলা দলে।

আমাদের এক-একটি দল সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত শক্তির এক-একটি উজ্জ্বল প্রতীক— দেশ ও জাতির আশা-আনন্দের উৎস, দেশ থেকে হানাদার দস্যুসৈন্যদের নির্মূল করার এক-একটি প্রবল অবলম্বন ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার এই দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতিই যে একমাত্র উপযুক্ত, একথা আজ দেশের প্রতিটি মানুষই উপলব্ধি করেন । আমরা আক্রান্ত হয়েছি— আক্রান্ত হয়েছি অতর্কিতে একটি লুটেরা লম্পট হানাদার সেনাবাহিনী কর্তৃক। তারা হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধসজ্জিত এবং দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। অন্যদিকে আমরা ছিলাম প্রথম দিকে একেবারেই নিরস্ত্র এবং তখন আমাদের আদৌ ছিল না কোনো সামরিক শিক্ষা। আমরা তখন একরকম খালি হাতেই আত্মরক্ষার নিস্ফল চেষ্টা করেছি। এবং অসম্ভবরকম মার খেয়ে অগণিত সংখ্যায় মৃত্যুবরণ করে নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে হয়ে উঠেছি মারমুখি। অবস্থার চাপে পড়ে আমরা দলবদ্ধভাবে গড়ে তুলেছি প্রতিরোধ । প্রথমদিকে আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র ছিল লাঠি, ছুরি, দা, কুড়ালি নিদেনপক্ষে হাতের কাছে পাওয়া পাখিমারা বন্দুক এবং নিজেদের তৈরি হাতবোমা। শত্রুর কামান, মর্টার আর মেশিনগানের সামনে এসবের কিই-বা শক্তি !

এই অসম শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই আমরা বেছে নিয়েছি যুদ্ধের গেরিলা পদ্ধতি । নিজেদের অস্ত্রশক্তির দুর্বলতা আমরা ঘুচিয়েছি জনবল দিয়ে— দিনে দিনে বৃদ্ধি করেছি আমাদের সংখ্যা, বিস্তৃত করেছি দেশব্যাপী আমাদের রণাঙ্গন।

বাংলাদেশব্যাপী এক সুবিস্তৃত রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছি আমরা ছোট ছোট

গেরিলা দলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ; আমরা হঠাৎ আক্রমণ এবং শত্রুর সরবরাহ ও যাতায়াত ব্যবস্থা বানচাল করে সরে পড়ার নীতি গ্রহণ করেছি। আর এ পদ্ধতিতে শত্রুনিধন ও শত্রুকে ঘায়েল করার কাজে আমরা অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা পাচ্ছি দেশের আপামর জনসাধারণের। আমরা জানি, আমাদের জয়-পরাজয় নির্ভরশীল জন-সমর্থনের ওপর। আমরা বাংলারই সন্তান। বাংলার মা-বোন আমাদেরই মা-বোন। আমাদের মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্যেই আমরা একদল পশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছি। বাংলার মানুষের ধনসম্পদ আমাদের পবিত্র আমানত। সেই ধনসম্পদ একদল লুটেরার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই আমরা সংগ্রাম করছি।

শত্রুকে ঘায়েল করার জন্যে আমরা অনেক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করছি। পুল উড়িয়ে দিচ্ছি, রেললাইন তুলে ফেলছি। এতে আমাদের জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধাই সুচিত হচ্ছে। কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে জনগণ এই সাময়িক অসুবিধাকে অকাতরে মেনে নেন। পুল ওড়াবার কাজে স্থানীয় জনসাধারণ আমাদের সাহায্য-সহযোগিতাও দিয়ে থাকেন ।

শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে আমরা ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম মেনে চলতে পারি না— সেটা সম্ভবও নয়। আমরা উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে এবং স্থানীয় জনসাধারণের পরামর্শ নিয়ে শত্রুর ছাউনিতে অতর্কিতে আক্রমণ পরিচালনা করি। কখনো-বা শত্রুর অস্ত্র ও রসদ-বোঝাই গাড়িতে বোমা মেরে ক্ষতি সাধন করি ।

আমাদের একতার মূল উৎস, যুদ্ধের সর্বশেষ লক্ষ্যের প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে শত্রুমুক্ত করা। গত ২৪ বছর ধরে তথাকথিত স্বাধীনতার নামে যে পাকিস্তানি প্রশাসন ও সামরিক চক্র বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করেছে এবং পঁচিশে মার্চের রাতে বাংলার নিরস্ত্র জনগণকে আক্রমণ করেছে, নারীর সম্ভ্রম বিনষ্ট করেছে, লুণ্ঠন করেছে বাংলার সম্পদ, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা এবং অগণিত বাঙালিকে নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়ণ করে করেছে বাস্তহারা, দেশছাড়া, সেই দস্যুশক্তিকে সমূলে ধ্বংস করাই আমাদের লক্ষ্য ।

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বাংলার মুক্তিবাহিনী আজ যুদ্ধলিপ্ত। আমাদের জীবনজয়ী গেরিলা সৈনিকরা দীর্ঘসূত্রী মরণপণ সংগ্রামে রয়েছে নিয়োজিত।

— (রচনা ১৬-৯-৭১ । প্রচার ১৮-৯-৭১। পুনঃপ্রচার ১৯-১০-৭১)

৪৩। আমরা গেরিলা (2)

গে-রি-লা। তিন অক্ষরের একটি শব্দ। শব্দটি আজ আমাদের দেশের মানুষের কাছে বড়ো প্রিয়—বড়ো পরিচিত। এই শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মা-বোন পিতা-পিতামহের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আশা-আনন্দে, গর্বে ফুলে ওঠে বুকে । অকৃত্রিম আশিস ঝরে পড়ে প্রতিটি বাঙালির অন্তরের অন্তস্থল হতে।

নতুন একটি শব্দ, অতি সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রচলিত এই 'গেরিলা' শব্দটির এতো আবেদন কেন? কারণ অত্যন্ত সহজ। এই শব্দটি এককভাবে আমার আদরের সন্তান, আমার বোনের স্নেহের ভাই, আমার পিতা-পিতামহের আত্মজের পরিচয় বহন করছে— তিন অক্ষরের এই একটি শব্দের মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পান বাংলার কোটি পরিবারের অগণিত দামাল ছেলের অস্তিত্ব।

বাংলার মুক্তিবাহিনীর এক-একজন গেরিলা বাংলার মুক্তিযুদ্ধের এক-একটি ইস্পাত কঠিন ব্যারিকেড।

আমরা গেরিলা— আমাদের মা-বোন আমাদের বিজয়ের গরবে গরবিনী ।

আমাদের দেশে একদল লুটেরা লম্পট এসে অতর্কিতে হানা দিয়েছিল— দখলদার হয়ে আমাদের দেশের বুকে তারা সৃষ্টি করেছে ত্রাসের রাজত্ব। তারা আমাদের মা- বোনকে করেছে উৎপীড়ন, আমাদের দেশের ধন-সম্পদ করেছে লুণ্ঠন। আমরা তাই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠেছি— দুর্বৃত্তদের মানবতা বিবর্জিত আচরণের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে চলেছি আমরা। হিংস্র দানব রূপে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীকে ঘায়েল করার জন্যে আমরা আমাদের শক্তির ভারসাম্য বিচার করে গেরিলা পদ্ধতিকেই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছি । নিজেদের কম ক্ষতি স্বীকার করে দুশমনদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করার এই হচ্ছে উত্তম পন্থা।

আমাদের জন্যে সবদিক থেকেই অনুকূল প্রমাণিত হয়েছে এই গেরিলা পদ্ধতি। শত্রুর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা ও শত্রুকে অতর্কিতে আঘাত করার পরিবেশ এবং অধিকৃত জনপদে নিজেদের অপারেশন-পূর্ব বা প্রস্তুতিগ্রহণকালীন অবস্থানের নিরাপত্তা সবই আমাদের রয়েছে। বাংলাদেশের

প্রতিটি ঘরই আমাদের জন্যে সুরক্ষিত দুর্গ। প্রতিটি গৃহবাসীই আমাদের আত্মার আত্মীয়। দুর্বৃত্ত পাকিস্তানিরা যে বঙ্গললনার সম্ভ্রম নষ্ট করেছে, সেই রমণীই তো আমাদের মা-বোন! আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই মায়ের আদর, বোনের সেবা। তাঁরা আমাদের কল্যাণ কামনায় বিগলিত-প্রাণ। দুর্বৃত্ত পাকিস্তানি যে গৃহস্বামীর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছেন, তিনি তো আমাদেরই পিতা-পিতৃব্য। আমরা তাঁর সম্পদকে মনে করি আমাদের পবিত্র আমানত । তাঁর সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালন করছি আমরা। তিনি আমাদের কাজের প্রতি আশাবাদী— আমাদের জন্যে তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত।

গেরিলা বাহিনী । ইতিহাসের এক দুর্ধর্ষ বাহিনীর নাম গেরিলা বাহিনী । এরা ধ্বংসের ভেতরে ঘটায় সৃষ্টির উন্মেষ। এরা শত্রুকে ঘায়েল করতে গিয়ে নিজের প্রাণ অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে। শত্রুর যাতায়াত ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল করার বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে এরা ক্ষুদ্রতর বিবেচনা করে রেলপথ উপড়ে ফেলাকে, ব্রিজ উড়িয়ে দেয়াকে ।

আজকের বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে আমরাও তা-ই করছি। আমরা গেরিলারা ধ্বংসকে ভয় করি না। মেঘ দেখে ভয় পাই না— কেননা মেঘের আড়ালে সূর্যের হাসি আমরা দেখতে পাই ।

আমরা দেশকে ভালবাসি, দেশের মানুষকে ভালোবাসি। আর তাই দু'হাতে কুড়াই দেশবাসীর ভালোবাসা। আমাদের তিন অক্ষরের ‘গেরিলা' নাম সকলের প্রিয়, একান্ত পরিচিত একটি নাম ।

- (রচনা ২০-৯-৭১। প্রচার ২১-৯-৭১। পুনঃপ্রচার ২০-১০-৭১)

৪৪ । আমরা গেরিলা (৩)

দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শহর ও গুরুত্বপূর্ণ বহু এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের ছলে গণহত্যা, লুটতরাজ ও অন্যান্য অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে, তখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে যতোই তাদেরকে এখানে- সেখানে ঘায়েল করে ফিরছি, কিন্তু তাতে আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্য অর্জন কিভাবে এবং কতোদিনে সম্ভবপর, আমাদের গেরিলাদের এ এক আত্মজিজ্ঞাসা। এ প্রসঙ্গে হানাদারদের আধুনিক সমরসজ্জা ও পরিকল্পিত প্রস্তুতির সঙ্গে আমাদের শক্তিসামর্থ্যের ভারসাম্যের প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য ।

এর জবাবে আমরা প্রথমেই যে অবস্থার আনুকূল্য লাভ করতে পারি, তা হচ্ছে শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা সীমিত, অন্যদিকে আমরা অগণিত। দ্বিতীয়ত, শত্রু সৈন্যরা ভিনদেশি, তাদেরকে নৌপথে বা বিমানযোগে তিন হাজার মাইল দূর থেকে এসে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এমন একটি এলাকায়, যেখানকার জনসাধারণ তাদের প্রতি আদৌ সহানুভূতিশীল নয় । বরং তাদের অত্যাচার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ জনসাধারণ প্রতি মুহূর্তেই তাদের ধ্বংস কামনা করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে বর্বররা বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে। আর আমরা বাংলার বীর তরুণরা নিজেদের মাতৃভূমিতে থেকে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করছি।

অন্যদিকে দুর্বৃত্তরা চাকরিজীবী যোদ্ধা হিসেবে নিজেদের কর্তব্য করছে। কিন্তু আমরা বাংলার মুক্তিবাহিনীর গেরিলা সৈনিকরা আত্মরক্ষা আর অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছি। এই দৃঢ়তা একান্তই স্বতঃস্ফূর্ত। কেননা আমরা যে চোখের সামনে আমাদের দেশের সম্পদ লুণ্ঠিত হতে দিতে পারিনে। আমরা পারিনে আমাদের দেশের মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলতে দিতে। পারিনে আমাদের মা-বোনের বেইজ্জতি হতে দিতে। যে-কোনো মূল্যে আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করতেই হবে, এটাই শুধু আমরা বুঝি। আমরা গেরিলারা বাংলাদেশের আলো-বাতাসে লালিত বাংলা মায়েরই সন্তান । আমাদের কাছে বাংলার মাটি প্রাণের চেয়েও পবিত্র আমানত। বাংলার প্রতিটি রমণীই আমাদের মা-বোন। আমাদের মা-বোনের ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ।

বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রবলই প্রধান অবলম্বন। উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের পবিত্রতা আমাদেরকে প্রতি পদেই সৎসাহস, প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাচ্ছে— আমাদের বিজয়কে করছে সুনিশ্চিত।

সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, আমরা কোনো বৈদেশিক এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করছি না। আমরা কোনো নিরস্ত্র নিরীহ বাসিন্দার গৃহে আগুন দিচ্ছি না, শিশুহত্যা করছি না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, দেশকে শত্রুমুক্ত করা। এজন্যে আমরা হানাদার শত্রুদের হত্যা করছি— হত্যা করছি শত্রুর দালালদের। শত্রুর সরবরাহ বন্ধ করার জন্যে হয়তো বা কোথাও কোথাও রেললাইন উপড়ে ফেলছি, পুল উড়িয়ে দিচ্ছি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিকল করে দিচ্ছি। আমাদের সব কথার এক কথা হচ্ছে, আমাদের মাতৃভূমি থেকে

দখলদার পশুশক্তিকে নির্মূল করা। আর এজন্যে যা যা করা দরকার, তাই আমরা করছি সর্বশক্তি দিয়ে— জীবনের বিনিময়ে। ঠিক যেভাবে আমরা অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কম ক্ষতি স্বীকার করে শত্রুর বেশি ক্ষতি করার জন্যে 'অতর্কিতে আক্রমণ ও দ্রুত সরে পড়া'র নীতি অনুসরণ করছি, এতে বিদেশী সৈন্য সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। আরো নতুন সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনিয়ে নেবার সুবিধাও তারা ক্রমেই হারাচ্ছে। অন্যদিকে আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে প্রতিদিনই নব্যযুবকরা উপযুক্ত ট্রেনিং নিয়ে বেরুচ্ছে অগণিত সংখ্যায়। যতোই দিন যাচ্ছে, ওরা হীনবল হচ্ছে, অন্যদিকে আমাদের হচ্ছে শক্তিবৃদ্ধি। আমাদের হাতে এসে যাচ্ছে দুর্বৃত্তদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুগঠিত এবং সুসজ্জিত হচ্ছি। দীর্ঘসূত্রিতা এবং গেরিলা পদ্ধতি এই দুইই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে করে তুলেছে অবশ্যম্ভাবী।

(রচা ২৩-৯-৭১ । প্রচার ২৪-৯-৭১)

৪৫। আমরা গেরিলা (৪)

হানাদার শত্রুদের গতিবিধির ওপর সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত থাকা এবং প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদেরকে আঘাত করা ও দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে পড়া এই হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন রণকৌশল। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদানের জন্যে আমরা শুধু নিজেদের অস্ত্রবিদ্যার ওপর নির্ভর করতে পারি না বরং আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় সৎসাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও সার্বিকভাবে স্থানীয় জনসাধারণের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ও সমর্থনের ওপর।

সবার ওপরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে অকৃত্রিম ঐক্যবোধ। আজ মুক্তিবাহিনীতে যেমন দেশের সর্বস্তরের মানুষ ধর্ম-বর্ণ শ্রেণী ও বিত্ত নির্বিশেষে বাংলার সকল ঘরের সন্তানদের সমাবেশ ঘটেছে, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক দলমতের ভেদাভেদও সম্পূর্ণরূপে গৌণ হয়ে পড়েছে বাংলার বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে । আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে কে কোনো মতবাদে বিশ্বাসী, তার চেয়ে বড়ো ও একাত্মক প্রশ্নটি হচ্ছে, আমাদের এক লক্ষ্য, এক শত্রু । আমাদের লক্ষ্য, দেশ থেকে পাকিস্তানি তস্করদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা। আমাদের শত্রু হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, হানাদার বাহিনীর দালাল যতো পা-চাটা কুকুর। একটি পবিত্র লক্ষ্য কেন্দ্রকে সামনে রেখে দমন করছি এক দঙ্গল দস্যু, এক জাতের ঘৃণ্য গণদুশমনদের ।

বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি গেরিলা সৈনিক এক আর অভিন্ন সত্তার অধিকারী। একটি শত্রুর পিছনে আমরা একযোগে ধাওয়া করছি— একটি লক্ষ্য অর্জনের আনন্দে আমরা সমস্বরে স্লোগান দিচ্ছি : রক্তের বদলে রক্ত চাই। হানাদারদের ক্ষমা নাই— ক্ষমা নাই ।

আমাদের শক্তি আমাদের প্রতি বাংলার হৃদয়-মনের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা— আমাদের পাথেয় আপামর জনসাধারণের উদার আশাবাদ— সন্তানদের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ।

দেশের অধিকৃত এলাকায় এতো দুঃখ এতো নির্যাতন ভোগের পরও আমাদের যে- জনগণ হতাশ হননি, তাঁদের প্রতি আমাদের করণীয় কি আছে? তাঁদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব অশেষ। তাঁদের ভালোবাসার মূল্য আমরা দিয়ে যাই প্রতি পদক্ষেপে ।

গ্রামেগঞ্জে যেখানেই আমরা যাই কোনো অপারেশন চালাতে— অবসর সময়টুকু আমরা বসে কাটাতে পারি না। আমরা গ্রামবাসীদের দেয়া খাবার খাই— বিনিময়ে তাদের গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করি। ক্ষেতের কাজে চাষী ভাইকে, ঘর বাঁধার কাজে গৃহস্থকে সাহায্য করে আমরা নিজেদের অবসর সময়টুকুকে করে তুলি কর্মচঞ্চল ।

পথে-বিপথে চলতে গিয়ে আমরা রসদের প্রয়োজন বোধ করি । আর সে প্রয়োজন মেটাবার জন্যে আমাদের আত্মপরিচয়ই যথেষ্ট। আমরা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে নিজেদের পরিচয় বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসেন স্বেচ্ছায়। হানাদার দস্যুদের মতো আমাদেরকে নিরীহ মানুষের ঘর থেকে খাদ্যশস্য ছিনিয়ে নিতে হয় না। কেন তা করতে হবে? আমরা যে এই সব বাড়ি-ঘরেরই ছেলে। বাংলার প্রতিটি পরিবারের ছেলেরা গেরিলা । প্রতিটি পরিবারের মা-বোন গেরিলাদের মা- বোন। বাংলার প্রতিটি জনপদেই আমাদের মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-পরিজনদের বসবাস। আমাদের শক্তি অফুরন্ত— আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

— (রচনা ও প্রচার ৪-১০-৭১। পুনঃপ্রচার ২৩-১০-৭১)

৪৬। আমরা গেরিলা (৫)

চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছুবার পথে আমাদের সামনে উদ্ভব হচ্ছে দু'একটি

সমস্যার— যুদ্ধের নিয়মেই উদ্ভূত এসব সমস্যা এবং এসবের সমধানও আমাদেরকে করতে হচ্ছে দ্রুত ও উপস্থিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একটি সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মা- বোনের শত্রু, আমাদের জীবনের শত্রু, জাতির শত্রু পাকিস্তান বাহিনীর হীনবল সৈন্যরা বিপুল সংখ্যায় আজ আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে— আত্মসমর্পণ করছে হানাদার পশুশক্তির দালালরাও দলে দলে। এসব আত্মসমর্থনকারী শত্রুদের সঙ্গে আমরা কেমন ব্যবহার করবো?

আত্মসমর্পণকারী শত্রুদেরকে আমরা আটক করে রাখি— কেননা এখন থেকে তারা আর আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারছে না । আমরা তো জানি, চাকরিজীবী হিসেবেই তারা তাদের বর্বর প্রভূদের আদেশে আমাদের দেশের ওপর হামলা করেছে। আমরা তো জানি, পাকিস্তানি সামরিক দস্যু সর্দারদের প্ররোচনায় এসব বেতনভুক সৈনিকরা আমাদের দেশের বুকে নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অমানুষিক কাজ করছে। এ ছাড়া ইতোমধ্যেই এখানে অহরহ আমাদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে পাকিস্তানি হানাদাররা অসম্ভবরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছে— ঊর্ধ্বতন সামরিক বর্বরদের আদেশে তারা অকাতরে প্রাণ দিতে আর রাজি নয় । তাই তো তারা আত্মসমর্পণ করছে— আমাদের বিরুদ্ধতার অবশ্যম্ভাবী ফল যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার আশায় তারা হাতের অস্ত্র ফেলে দু'হাত তুলে দাঁড়াচ্ছে। আর আমরা তাই এসব আত্মসমর্পণকারী শত্রুসৈন্যকে আটক রাখাই সমীচীন মনে করি। এদেরকে হত্যা করা বা এদের ওপর নির্যাতন চালানো আমাদের বিবেচনায় অমূলক । আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের শত্রুতা করার পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিচারে ওরা আর আমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয় ।

আমাদের কাছে শত্রুপক্ষের দালাল অর্থাৎ বাঙালি হয়েও যারা ব্যক্তিস্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে আমাদের প্রতি চরম শত্রুতা করেছে, তারা যখন আত্মসমর্পণ করে, তখনো আমরা সমস্যাগ্রস্ত হই— আমাদের ভাবনা হয়, এসব কুলাঙ্গারদের কতোটা কঠোর সাজা দেবো? কেননা বিদেশী শত্রুকে এরাই তো পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে বাংলার জনপদে অলিতে-গলিতে— নিজেদের মা-বোনকে তুলে দিয়েছে লম্পট পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে। এসব জাতিদ্রোহীকে কোনো বিচারে আমরা ক্ষমা করবো? কিন্তু না, আত্মসর্পণকারী দালালদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই হোক আমাদের আদর্শ। সাময়িক ভুলে ওরা যে জঘন্য অপরাধ করেছে আজ সে জন্যে অনুতপ্ত হয়েই তো ওরা আত্মসর্পণ

করছে এবং এতোকাল ওরা ওদের যে শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে দুশমনদের সহায়তা করেছে, আজ সে শক্তি ও প্রতিভাকে ওরা দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্যেই খাটাতে চাইছে। ওরা অনুতপ্ত, তাই ক্ষমার যোগ্য। আমরা গেরিলারা আত্মসমর্পণকারী শত্রুদের করুণা করি এবং ক্ষমা প্রদর্শন করি আমাদের কাছে আত্মসমর্পণকারী শত্রুপক্ষের দালালদেরকে ।

বর্তমানে দেশের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে অপারেশন চালাতে গিয়ে আমরা মাঝে মাঝে আর-এক জটিল সমস্যার সন্মুখীন হই— তা হচ্ছে, কোনো পরিবারের একজন শত্রুপক্ষের দালালি করে, তাকে শায়েস্তা করতে গিয়ে পাছে পরিবারের নিরপরাধ অন্যান্যদের দুর্ভোগের কারণ ঘটিয়ে বসি। কেননা, দালালকে ঘায়েল করতে গিয়ে আমরা যে অস্ত্র ছুড়ে মারবো, সে অস্ত্র দালালের নিরপরাধ ভাইকে আঘাত করে বসতে পারে । আমাদের দেশে যেমন একটা কথা আছে : 'একে নষ্ট, সবে দুঃখ পায়।' কিন্তু এ রকমটি যাতে না হতে পারে, সে জন্যে আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অপারেশন পরিচালনা করার চেষ্টা করি। আমরা চেষ্টা করি যেন এক কুলাঙ্গার ভাই-এর অপরাধের সাজা নিরপরাধ অন্যান্য গৃহপরিজনদের ওপরে না বর্তায়। যে সত্যিকারের অপরাধী, সেই আমাদের শত্রু, তাকেই শুধু আমরা খতম করবো।

এভাবে যুদ্ধকালীন যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সেসব সমস্যার সঠিক সমাধান করার সুশিক্ষাই আমরা পেয়ে আসছি আমাদের সুসংবদ্ধ গেরিলা শিক্ষাশিবিরে আমাদের সুযোগ্য কমাণ্ডারদের কাছ থেকে ।

— (রচনা ও প্রচার ১১-১০-৭১)

৪৭। আমরা গেরিলা (৬)

আমরা গেরিলা। আমরা বিশ্বাস করি, কোনো অভ্যুত্থান নিয়ে খেলা করতে নেই। আমরা যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি— দেশ-রণাঙ্গন বাংলাদেশে আজ যে যুদ্ধ-তৎপরতা সূচিত হয়েছে, এর আর বিরতি দেয়া চলতে পারে না। দেশকে সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত করার মহান লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছুতে হবে। একথা সত্য যে, একেবারেই আকস্মিকভাবে একটি পূর্বপরিকল্পিত সামরিক হামলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাদেরকে। আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, অন্যদিকে আক্রমণকারী শত্রুপক্ষ আধুনিক মারণাস্ত্রসজ্জিত এবং যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী একদল হানাদার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া আমরা

হচ্ছি নিজের দেশ ও জাতির অস্বিত্বরক্ষার খাতিরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আত্মসচেতন, অন্যদিকে শত্রুপক্ষ একটি জাতির ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সংস্কৃতি ও সমাজ- রাজনীতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবার অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত— আর সে জন্যেই সমরনীতি ও মানবতার আদর্শকে বেমালুম উপেক্ষা করে অসামরিক জনপদে আক্রমণ পরিচালনা, গণহত্যা, শিশুহত্যা ও নারী নির্যাতন ইত্যাদি ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর আচরণে লিপ্ত । এ অবস্থায় আমাদের শক্তির ভারসাম্য রক্ষার অনন্য উপায় হিসেবে শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতির আক্রমণ অভিযান শুরু করতে হয়েছে। আমাদের অপ্রস্তুতিকালীন ধকল কাটিয়ে ওঠার এটাই হচ্ছে সহজতম পন্থা। গেরিলা পদ্ধতিতে প্রথম দিকে আমরা হাতের কাছে পাওয়া যে-কোনো মামুলি সরঞ্জামকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছি— পরে আমাদের হাতে এসেছে শত্রুর পরিত্যক্ত বহু অস্ত্রশস্ত্র, যা আমরা বেশির ভাগই পরাজিত হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। সীমিত এবং তুলনায় যথেষ্ট অসম হয়েও আমরা গেরিলা পদ্ধতির আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদেরকে ইতোমধ্যেই অত্যন্ত হীনবল ও অসম্ভবরকম ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছি। এ পদ্ধতির অভিযান পরিচালনা করে আমরা নিজেদের অতি অল্প ক্ষতি স্বীকার করে শত্রুর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পেরেছি। হানাদার সৈন্যরা এখন আমাদের হাতে মার খেয়ে খেয়ে ক্রমেই বিভিন্ন সুরক্ষিত ছাউনিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

আমাদের দেশের ওপর অন্যায়ভাবে জনমতকে উপেক্ষা করে জোরদখল বজায় রাখার সকল অপচেষ্টাই এখন তাদের বাচাল হতে চলেছে। আমাদের প্রতিরোধমূলক ও পাল্টা আক্রমণাত্মক তৎপরতার ফলে দুর্বৃত্তদের এখান থেকে অচিরেই সরে পড়ার অবস্থা এসে যাচ্ছে। আমাদের দেশ ও জাতির ওপর বর্বর হামলা পরিচালনার মাসুল হিসেবে প্রতিটি হানাদার সৈন্যকেই বাংলার মাটিতে অপমৃত্যু বরণ করতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই ।

অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি, গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধ আমাদের দেশ থেকে হানাদার দস্যুদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার তথা যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পর্যাপ্ত নয়। সেজন্যে প্রয়োজন নিয়মিত যুদ্ধের। গেরিলা পদ্ধতিতে শত্রুদেরকে হীনবল ও ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়ে আমরা নিয়মিত যুদ্ধের মাধ্যমেই আমাদের বিজয়কে সফল করে তুলবো।

আমরা বাংলার সন্তান— বাংলার আলো-হাওয়ায় লালিত। বাংলার নারী

আমাদের মা-বোন, বাংলার মানুষ আমাদের আত্মজন। বাংলার প্রতি গৃহস্থ-ঘর আমাদেরই বাসভিটি, ধনসম্পদ আমাদের পবিত্র আমানত। মা-বোন ও আত্মজনদের আশিস এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার সৎসাহস সম্বল করে আমরা যুদ্ধ করছি। এ কিছু ছেলে খেলা নয়। এ যুদ্ধ সচেতন বুদ্ধির প্রকাশ। এ যুদ্ধে আমাদের জয় দুর্গত মানবতার জয় আমাদের জয় একটি দেশ ও জাতির জয়. বাংলার মা-বোনের জয়, আপামর জনসাধারণের জয়।

- (রচনা ৪-১১-৭১। প্রচার ৫-১১-৭১)

অনুষঙ্গ-২

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বেলাল মোহাম্মদের তাৎক্ষণিক রচিত/ প্রচারিত একগুচ্ছ কবিতা—শেষতম কবিতাটি সিদ্দিকুর রহমান সম্পাদিত ‘স্বাধীনতার কবিতা (১৯৮৩) গ্রন্থে সংকলিত :

কণ্ঠস্বর— শব্দ সৈনিকের

১

মা আমার— আমার প্রিয়তমা,

প্রিয়তমা মা আমার

আমার জন্মজীবন আর লালনভূমি বাংলাদেশ ।

জীবন-জয়ের সংগ্রাম যখন আমাকে

বিচ্ছিন্ন করে দেয় আমার মায়ের স্নেহের স্পর্শ থেকে,

যখন আমাকে সরিয়ে রাখে প্রিয়তমার

কবোষ্ণ সান্নিধ্য থেকে,

তখনো আমার জীবনে অনন্ত প্রাণোন্মাদনা-

অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের অকৃত্রিম আনন্দের ।

মা আমার— আমার প্রিয়তমা,

আমার বাংলাদেশ ।
এবং মানুষের পৃথিবী, শোনো—
আমার মা-বোনের কান্না শোনো—
কান পেতে শোনো আমার শিশুসন্তানের আর্তরব ।
দেখো চেয়ে দেখো, মানুষের পৃথিবী,
আমার প্রিয়তমার অশ্রুসিক্ত অবয়ব।
এখানে আমার সবুজ শ্যামল বনানীতে অগ্নিশিখা দেখো,
আমার খাল-বিল নদ-নদীতে দেখো রক্তবন্যা।
আমার ধানক্ষেত পাটক্ষেত দেখো—
দেখো—আমার বিরাণ মাঠঘাট জনপদ ।
আর দেখো দেখো, মানুষের পৃথিবী ।
গ্রামবাংলার সোনার ফসলে কারা আগুন ধরালো?
কারা আজ লুণ্ঠন করলো বাংলার বধূর প্রাণ-সম্পদ?
কারা আজ মায়ের বুক খালি করে দিল?
আমাদের মসজিদ মন্দির গির্জায়,
আমাদের স্কুল কলেজ ছাত্রাবাসে,
আমাদের গণপথে ঘরে ঘরে
কারা আজ ঘটালো নির্মম ধ্বংসলীলা?
আমি আজ নিজ দেশে পরবাসী!
আমার মায়ের স্নেহের স্পর্শ থেকে,
প্রিয়তমার কবোষ্ণ সান্নিধ্য থেকে আজ আমি কতো দূরে।

অথচ কি আশ্চর্য প্রাণোন্মদনায় আমি আজ জীবন-চঞ্চল
আমার অন্তর জুড়ে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের
দৃঢ় প্রত্যয়ের অকৃত্রিম আনন্দ ।
মা আমার—আমার প্রিয়তমা— প্রিয়তমা মা আমার,
আমার শ্যামলী সুশোভনা স্বাধীন বাংলাদেশ ।
৫-৪-৭১, মুজিবনগর

২

আমার মাতামহ পিতামহ প্রপিতামহ-রা কেউ আজ
বেঁচে নেই— ওঁরা বলতেন—যা বলতেন,
শুনেছি আমি আমার মায়ের কাছে
এবং আমার মা-ও যা বলেছেন বহুবার ।
বলেছেন : ঐ দেখো, আকাশে দেও-দানো পিশাচের
সমাবেশ— ওরা সব শয়তান —
ধমকাচ্ছে আমাদের সুন্দর পৃথিবীকে ।
আর এই দেখো, সেই সাথে সহসা চমকাচ্ছে তীক্ষ্ণধার
বিজলির তীর—— শয়তান দেও-দানোদের মৃত্যুবাণ ।
এই তীর ছুঁড়ছেন বিরাট বিচারক ।
এবং এই সুন্দর পৃথিবীর মানুষরা সবাই
সেই সুমহান বিচারকের একান্ত পূজারী।
আমার মাতামহ পিতামহ প্রপিতামহরা বলতেন—

বলেছেন আমার মা, যখন মায়ের কোলে চড়ে
স্কন্ধদেশে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।
আর আকাশের সেই দেও-দানো মেঘগুলো কখন
ঘনীভূত হতো, বাজ পড়তো, বিজলি চমকাতো,
বৃষ্টি নামতো আমার গভীর নিদ্রার অন্তরালে ।
বিচারকের অমোঘ বিধানে আমি তখন
সকল ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে
আমার পিতা আজ বেঁচে নেই— বেঁচে আছেন
আমার মা, বেঁচে আছেন বাংলাদেশের এক প্রান্তে
সন্তানবিচ্ছেদের মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে !
কেননা আমার মায়ের ঘুমপাড়ানি রূপকথার
সেই সব দেও-দানো আজ নেমে এসেছে আমাদের পৃথিবীতে
এবং ধমকাচ্ছে ওরা বোমা আর কামানের শব্দে
বাংলাদেশের শহর বন্দর গ্রাম জনপদে
সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ।
আজ আর তাই আমি পারিনি ঘুমিয়ে পড়তে,
আমার সকল শক্তির ব্যারিকেড রচনার কাজে আমি আজ
ঘরছাড়া— আজ আমি আমার মায়ের দুরন্ত সন্তান ।
এখন আমি একটি ক্ষুরধার তীর চাই—
একটি তীর, যা দেও-দানো শয়তানের মৃত্যুবাণ হবে ।
এবং এখন কোথায় তুমি,

আমার পিতৃ-প্রপিতামহদের বিশ্বাসের বিচারক তীরন্দাজ?
কোথায় তুমি, বিচারক ?
প্রতিটি উষ্ণ মুহূর্ত এখানে এই বাংলাদেশে আজ
বড়ো বেশি নির্মম।
বিচারক, আমাকে বাঁচাও !
সুন্দর জীবনের আশ্বাসে আমাকে করো অভিষিক্ত।
বিচারক, আমার পূর্বপুরুষের বিশ্বাসের অস্তিত্বে
তুমি প্রতিভাত হও!
এখানে এই পৃথিবীর সসাগরা সুজলা সুফলা
আমার শ্যামলী প্রিয়ার দেশ— আমার মায়ের দেশ
এই বাংলার স্বাধীনতা তুমি ফিরিয়ে দাও, বিচারক !
এই আর-এক বর্গির হাঙ্গামা— চেঙ্গিস, হালাকু খানের
দৌরাত্ম থেকে আমাকে বাঁচাও, বিচারক!
আমার পূর্বপুরুষের বিশ্বাসের শপথ,
সোনার বাংলাকে হতে দিও না আরেক ভিয়েনাম ।
অথবা তোমার হয়ে, বিচারক— গণতান্ত্রিক বিশ্বকে করো
কর্তব্য-নির্দেশ, আনুকূল্য দিতে সাড়ে সাত কোটি মানুষের
জীবন-জয়ের সংগ্রামে ।

৬-৪-৭১ মুজিবনগর

৩

আকাশে উড়িয়ে দিলাম আমার কথার কপোত,
আমার কবিতার কথা, কণ্ঠস্বর-
তুমি কি শুনতে পাও, প্রিয়তমা?
আমার সাড়ে সাত কোটি সন্তানের জননী
শ্যামলী কোমলাঙ্গী প্রিয়তমা ।
তুমি কি শুনতে পাও আমার প্রাণ-নিঙড়ানো কণ্ঠস্বর?
অথবা তোমার সন্তানদের একজনও যতোদিন থাকবে জীবিত,
থাকবে সক্রিয় সে তোমার মাতৃত্বের গৌরব প্রতিষ্ঠায় ।
আমার প্রিয়তমা— আমার সাড়ে সাত কোটি সন্তানের জননী
শ্যামলী কোমলাঙ্গী প্রিয়তমা।
একটু ধৈর্য ধরো,
একটু বুক বাঁধো—
আমাদের মুক্তিবাহিনী এখন অগ্রগামী দৃপ্ত পদভরে ।
আর দেরি নেই— তোমার সর্বাঙ্গীন বন্দিদশা
ঘুচবার আর বেশি দেরি নেই ।
আমার কথা শোনো, প্রিয়তমা—
আস্থা রাখো আমার কথায় ।
এবং খবরদার, একটুও তুমি শুনতে চেয়ো না
ঐ পাকিস্তানি বেতারের খবর—
খবর প্রচারের নামে ঐ সবই মিথ্যাচার ।

ও-সব শুনে অহেতুক তোমার মনে জাগতে পারে হতাশা ।
অথবা শুনেই দেখো তুমি—
দেখবে, তোমার ঘরে তোমার চোখের সামনে
ওরা যে করে ফিরছে রাহাজানি..
ওরা যে নিরস্ত্রদের করে ফিরছে হতাহত,
পাকিস্তানি বেতারের খবরে তার উল্লেখ নেই ।
এবং আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে ওরা যে ক্রমেই
পরাজয় মেনে নিচ্ছে, সে তথ্যের সমাবেশ নেই ঐ খবরে।
আমার প্রিয়তমা— আমার সাড়ে সাত কোটি সন্তানের জননী ।
শ্যামলী কোমলাঙ্গী প্রিয়তমা!
সেই পরিকল্পিত মিথ্যাচারের প্রচারযন্ত্রের সাথে আজ
আমাকে পাল্লা দিতে হচ্ছে এক আকস্মিকতার দৈন্যগ্রস্ত
অথচ কী প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর ‘স্বাধীন বাংলা বেতার' যন্ত্র নিয়ে।
তুমি কি শুনতে পাও আমার কণ্ঠ?
তুমি কি শুনতে পাও, প্রিয়তমা !
কথায় কবিতায় এই যে আমি বলছি :
আমার বাংলাদেশ জেগেছে— আমার বাংলার ঘরে ঘরে
শিশু বৃদ্ধ নরনারী একযোগে জেগেছে—
ঘনকৃষ্ণ দুই যুগের মোহনিদ্রা কাটিয়ে
জেগেছে আমার ভাই
জেগেছে আমার বোন

জেগেছে বন্ধু স্বজন
জেগেছে— সবাই জেগেছে ।
সবাই এখানে এক প্রাণ এক দেহ,
সকলের একক আকাঙ্ক্ষা— স্বাধীনতা, বাংলার স্বাধীনতা।
এই স্বাধীনতার জন্যে সবাই সমস্বরে হয়েছে মুখর
প্রতিটি সড়ক আজ জীবন্ত, নগর-বন্দর-গ্রাম
প্রতিটি জনপদ আজ প্রাণচঞ্চল ।
কান পেতে শোনো, প্রিয়তমা!
আমার সাড়ে সাত কোটি সন্তানের জননী
শ্যামলী কোমলঙ্গী প্রিয়তমা!
ঐ শোনো,
কি অপূর্ব জয় জয় বিজয়োল্লাসে
তোমার প্রতিটি সন্তান আজ সৈনিক।
এবং তাদের কাছে ব্যূহবন্দি আজ দুর্বৃত্ত হানাদাররা
তুমি কি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাও, প্রিয়তমা?
তবে শোনো, আমার কণ্ঠের ধ্বনি আজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
সমগ্র বিশ্বের পথে-প্রত্যন্তে— আমার বোনের কান্না
সমগ্র বিশ্বের চোখে বয়ে আনছে অশ্রুবন্যা ।
গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে বড়ো বেশি আশাপ্রদ
এই বর্বরতার বিরুদ্ধে আত্মনির্ভরতার সংগ্রাম
এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে

জীবন-জয়ের সংগ্রাম ।
একটু ধৈর্য ধরো,
একটু বুক বাঁধো, প্রিয়তমা!
তোমার সর্বাঙ্গী বন্দিদশা ঘুচবার আর বেশি দেরি নেই—
আস্থা রাখো তুমি আমার কথায়, প্রিয়তমা!
৭-৪-৭১, মুজিবনগর

৪
আজ কিংবা এই দিনে এ তারিখে
বাংলাদেশে দ্বীপাঞ্চলে
জন্মাস আমার পুত্র তুই,
আমার আনন্দ তুই—
এবং এমন দিনে আজ যদি
পিতা তোর নিরুদ্দেশ,
আজ তোর জন্মদিনে
পিতার স্নেহের হাত করলো না স্পর্শ তোরে,
বাংলাদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে
কোথায় হারিয়ে আছে
তোর প্রিয় বিদগ্ধ জনক—
হয়তো অনেক দুঃখ তার জন্যে তোর মনে
গ্রামবাংলার এক মুক্ত এলাকায় ।

তার জন্যে দুঃখ নেই—

বলি শোন, আমার আনন্দ তুই,

আমার একান্ত উত্তরাধিকার।

স্বাধীন বাংলার এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

আমার অধীর—

অনন্ত শুভেচ্ছা তোর জন্যে, বাংলার শিশুদের জন্যে ।

আজ এই দিনে কিংবা এই শতাব্দীর

এ একাত্তরের আরক্ত প্রথম ভাগে

অথবা ১৩ই এপ্রিলে বাংলাদেশে

যতো শিশু জন্মালো উজ্জ্বল,

আমাদের একান্ত সে উত্তরাধিকার—

এই দিন, যেদিন জানলো বিশ্ব

স্বাধীন বাংলার অনন্য সরকারের নাম ।

বড়ো প্রিয় জন্মের ঘোষণা—

আমার অশেষ আনন্দ তোর বাঞ্ছিত জন্মের মতো ।

এবং এমন দিনে আজ যদি পিতা তোর নিরুদ্দেশ,

তোর জন্মদিনে পিতার স্নেহের হাত

যদিও করলো না স্পর্শ তোরে,

তার জন্যে দুঃখ নেই—

কেননা বাংলার যুদ্ধক্ষেত্রে

এই দিনে পিতা তোর প্রাণান্ত সৈনিক ।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোর জন্যে তার অনুরাগ—
এ দেশের এ জাতির অস্তিত্বের মতো,
বাংলার স্বাধীনতা সমৃদ্ধির মতো—
এই এক আনন্দের উত্তরাধিকার।
১৩-৪-৭১, মুজিবনগর

৫
দেখো দেখো, কি অসীম সাহসে এগিয়ে চলে
যুদ্ধের সড়ক বেয়ে কি-উল্লাসে দৃপ্ত পদভরে
আমাদের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিসেনা—
চেয়ে দেখো, এখন এখানে রাত্রি দিন প্রহরে প্রহরে
জীবনের যৌবনের উন্মাদনা কি অনন্ত ।
এখানে চলেছে যুদ্ধ— কী ভীষণ ভয়াবহ
এখন চলেছে যুদ্ধ— কি অবাক দেখো দেখো,
দুর্বিনীতা মায়ের দুরন্ত সন্তান এরা
কেমন হটিয়ে দিচ্ছে হানাদার শত্রুদের ।
তোমার-আমার আজ জীবন-মরণ প্রশ্ন
স্বাধীনতা— অস্তমিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের।
অনেক বঞ্চনাশেষে রাত্রিশেষে এই দিন
সূর্যদিন স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসচেতন
বাংলার জনপদে সড়কে বাজারে গৃহ-আঙ্গিনায়

ধ্বংসস্তূপে নতুন আবাদ গড়ার এ উদ্যম ।
এবং কি চায় ওরা? কি যে ওরা ভাবে?
ওরা চায়, দুঃসাহস— সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে
উৎখাত নিশ্চিহ্ন করে দিতে।
ওরা ভাবে, এখনো ওদের ধর্ম-ব্যবসায়
খাটবে এখানে । আজকের দিনে বাঙালিরা
জেনেছে একথা, ধর্মের বন্ধন দিয়ে
ভূগোলের সীমানাকে যায় না পাল্টানো,
যায় না বহতা কোনো নদীকে ফেরানো ।
এবং তা যদি হতো—
ধর্ম যদি রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হতো,
মধ্যপ্রাচ্য এক দেশ হতো।
আর তাই আজ দেখো, বাংলার ধর্মপ্রাণ
মানুষের সন্তানরা— কি আশ্চর্য, নিজেদের
স্বাধীনতা সমৃদ্ধির জন্যে যুদ্ধরত। মোনাফেক
ধর্ম-ব্যবসায়ী হানাদাররা যা ভাবে যা চায়,
তাকে ব্যর্থ করে দিয়ে এরা দৃপ্ত পদভরে
অগ্রগামী মৃত্যুপণ— দেখো, কি আশ্চর্য ।

১৪-৪-৭১, মুজিবনগর

৬

কবিতা শ্যামলী মেয়ে—

কবিতা সবুজ লাল নীল হলুদের স্নিগ্ধতা।

কবিতা বৃক্ষলতা পত্রপুষ্প ধানদূর্বা সজীবতা ।

কবিতার অনুপ্রাসে শব্দহীন নির্জনতা—

নৃত্যছন্দ আনন্দের গভীরতা ।

এখন এখানে নেই নীল নীল সবুজের সমারোহ,

পত্র নেই, পুষ্প নেই, শ্যামলী মেয়েটি নেই ।

আজ এইখানে বাংলাদেশে

গ্রাম-গ্রাম দূর বহুদূর অগ্নিদগ্ধ

বিক্ষত উর্বর মাটি শস্যক্ষেত্র

এবং বিক্ষুব্ধ তাই জনপদ জীবন মানস

হায় রে, বাংলার গান সারি-জারি-ভাটিয়ালি

মেঠোসুর— মুহুর্মুহু কামানের শব্দে বিদীর্ণ।

হায় রে, বিবর্ণ এখানে নীল নীল সবুজ প্রাঙ্গণ

বিমানের আগুন বৃষ্টিতে ।

কবিতা, আমার কবিতা !

কবিতা শ্যামলী মেয়ে— কবিতার সঙ্গীতের বাংলাদেশ।

আমি জানি, এসব মরা গাছে ফুল আমি ফোটাবোই ।

কবিতা বাংলার স্বাধীনতা,

শিশুর সরল কান্না,

রমণীর হাসি ভালোবাসা—
শ্যামলী মেয়ের প্রেমে একটি কবিতা আমি লিখবোই ।

১৬-৪-৭১, মুজিবনগর

৭

আমার শ্রমের হাত ইস্পাত
আমার বাহুর বল সম্বল—
তা-ই নিয়ে আমি আজ বুকটান করে দাঁড়ালাম,
হানাদার শত্রুর পথরোধ করে আমি দাঁড়ালাম ।
এই গ্রামবাংলার গণপথ,
এই দেশ পরিবেশ জনপদ সবখানে যুদ্ধ—
আমিও যোদ্ধা আজ ।
আমার শ্রমের হাত ইস্পাত
আমার বাহুর বল সম্বল—
সেই বলে বলীয়ান আমি আজ
বুকটান করে দাঁড়ালাম,
হানাদার শত্রুর পথরোধ করে আমি দাঁড়ালাম ।
এখন এপ্রিল-মে রাতদিন আমাদের দিন,
আজ তো ১লা মে, এই দিন
শ্রমের আনন্দ-রাঙা দিন—
প্রতিদিন আমি আজ শ্রমবীর ।

কেননা আমার দেশে দস্যু দিয়েছে হানা,

এই গ্রাম বাংলার গণপথ

এই দেশ পরিবেশে এখন বেধেছে যুদ্ধ ।

আমিও মেতেছি যুদ্ধে ।

প্রত্যেক শ্রমিক আজ সৈনিক ।

আমার শ্রমের হাত ইস্পাত

আমার বাহুর বল সম্বল-

তাই নিয়ে আমি আজ বুকটান করে দাঁড়ালাম ।

১-৫-৭১, মুজিবনগর

৮

যদি পেতাম এমন কোনো ভাষা,

যার কশাঘাতে নিতে পারতাম প্রতিশোধ ।

হায়রে, আমার মমতাময়ী মা-জননী ।

আমাকে তুমি শেখাওনি কোনো গালিগালাজ—

হায়রে, আমার বাংলা ভাষা !

তুমি শুধু মধুর মধুর।

এবং বাংলার বনের পাখির কূজনে

খুঁজে পেলাম না কঠোরতা।

শুধু কোমল কোমল

সবুজে শ্যামলে আমার জন্ম-জীবন ।

তবু জানি, আমার অস্তিত্বের আলোকে
আজ আমি উদ্ভাসিত ।
আমার গাছের শাখায় শাখায়
লাল লাল ফুলগুলো তাজা রক্ত হয়েছে।
আমার ভালোবাসার চাহনিতে আজ রক্ত।
আমার বোনের সম্ভ্রম,
প্রিয়তমার বিরহ,
আর ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধ সব একাকার হয়ে
প্রতিশোধের ভাষা হয়েছে ।
প্রতিশোধ নিতে হবে একদল বর্বরের ওপর,
একদল খুনি লুটেরা লম্পটের ওপর।
হায়রে, আমার মমতাময়ী মা-জননী ।
তুমি কি জানতে, তোমার নিরীহ
সন্তানরা প্রয়োজনে এমন মুখর
এমন কঠোর হবে কোনোদিন ।
১৬-৫-৭১, মুজিবনগর

৯
তোমাকে নিবিড় করে পেতে মন চায়—
মন চায়, তোমাকে নিয়ে পৃথিবীর
বিরাট প্রান্তর দেশ ঘুরে ফিরি ।

যাযাবর এক শয্যায় শুয়ে, মন চায়,
গল্প করি যুগ যুগ আমৃত্যু দিনরাত ।
যখন এখানে আমার ধানের দেশে
বৃষ্টি নামলো আগুনের,
আগুন আগুন
এখানে রক্তের আগুন,
বন্দুক বেয়নেট বোমার আগুন ।
এবং আগুন আগুন
আমাদের সাত কোটি আশা আনন্দের,
আমাদের জীবনের অগ্নিশিখা ।
সে আগুনে আমি আজ ঝলসে গেলাম ।
তারপর কিছুই জানি নে
শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ ।
যুদ্ধের উদার মাঠ একটি দেশ,
এক গুচ্ছ জনতা
আমাকে ভুল বুঝো না তুমি—
আমি আজো ফুরিয়ে যাইনি ।
আমি শুধু দুস্তর পথের হয়েছি পথচারী।
এ পথ আমার অচেনা নয়-
এ পথ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে
এক অনন্য সুন্দর লক্ষ্যের দিকে।

প্রতিদিন আমি অনেক চড়াই-উত্রাই করে
এগিয়ে চলেছি তোমার দিকে ।
তোমার ফুলের মালা শুকোতে দিও না, বাংলাদেশ!
অশ্রু রক্তে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তাজা রেখো
প্রতিটি পাপড়ি ।
ও-মালায় তুমি ঢেকে দেবে আমার এতোকাল
শিকল-পরা গলার ক্ষতচিহ্ন—
যখন তোমাকে নিয়ে আমি পৃথিবীর
বিরাট প্রান্তর দেশে জীবন কুড়াবো ॥

৩১-৫-৭১, মুজিবনগর

অনুষঙ্গ—৩

পরিচিতি

আবদুল্লাহ আল ফারুক, এম-এ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাত্র কিছুকাল আগেই রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রে প্রোগ্রাম প্রডিউসার পদে যোগদান করেন ।

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বি-এ (সম্মান), এমএ (বাংলা)। জন্ম ১ এপ্রিল ১৯৪৪। চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি । দৈনিক আজাদীর আগামীদের আসর' পরিচালক। সাক্ষরতা অভিযানের একজন স্বতঃস্ফূর্ত কর্মী। ১৯৬৯ সালে বেলাল মোহাম্মদ ও তাঁর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সন্দ্বীপ সন্দর্শন' ঐতিহাসিক গবেষণা নিবন্ধ সংকলন। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে ফটিকছড়ি কলেজে সহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন ।

আ ম শারফুজ্জামান। জন্ম ঢাকা ১ নভেম্বর ১৯৪৬। ১৯৬২ সালে জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নকালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করার অপরাধে কারাবরণ, ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের

(অখণ্ড সর্বশেষ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। গেণ্ডারিয়া খেলাঘরের বিশিষ্ট কর্মী। রেডিও পাকিস্তানে টেকনিক্যাল অপারেটর হিসেবে প্রথম সরকারি চাকরিতে যোগদান ।

কাজী হাবিবউদ্দীন আহমদ (মণি)। জন্ম ৯ মার্চ ১৯৪৭, ঝাউতলা, কলকাতা। কুমিল্লা জেলার চিওড়া-র কাজী পরিবারের সন্তান। ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের কর্মী হিসেবে ঢাকায় মিছিল থেকে গ্রেফতার ও প্রায় তিন মাস কারাভোগ। ১ জুন ১৯৭১ তারিখে মুজিবনগরে সরকারি চাকরিতে প্রথম নিযুক্তি লাভ।

বেলাল মোহাম্মদ। জন্ম ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬, সন্দ্বীপ। ১৯৫২ সালে ঢাকার দৈনিক ইনসাফ-এর সহ-সম্পাদক, ১৯৫৩-৫৪ সালে চট্টগ্রামের সাপ্তাহিক কোহিনূর-এর সম্পাদনা সহযোগী ও দৈনিক আজান-এর সাহিত্য সম্পাদক। চট্টগ্রাম কলেজে আই-এ ক্লাশে অধ্যয়নকালে (১৯৫৪) ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং প্রথম জেলা কমিটির কনিষ্ঠতম সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬৪ সালে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিজস্ব লেখক শিল্পী হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হন।

মুস্তফা আনোয়ার (আনু), এম-এ (বাংলা)। জন্ম ১৪ জুলাই ১৯৪০ । ছাত্র ইউনিয়ন ও যুবলীগের কর্মী। ১৯৫৫ সালে ৯২ (ক) ধারার সময় দেড় মাস কারাভোগ— তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। তাঁর কারাসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী ও অধ্যাপক বদরুল হাসান। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রে প্রোগ্রাম প্রডিউসার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মোহাম্মদ আমিনুর রহমান, বি এস-সি। জন্ম ১৬ জুন ১৯৪৮, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ছাত্র জীবনে ১৯৬২ সালের হামাদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে থার্ড ডিভিশন মুভমেন্টে অংশগ্রহণকালে কারারুদ্ধ হন । ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে মার্কসীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত সভা থেকে অন্যান্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে গ্রেফতার হন এবং গোলটেবিলের পূর্বশর্তের প্রভাবে মুক্তি পান। বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা শাখা ও চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র সংগঠন ইউ-এস-পি-পি-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ২৪ মার্চ ১৯৭০-এ রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম কেন্দ্রে টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান করেন।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী (লিলু), বি এস-সি । জন্ম ১২ জুলাই ১৯৪৮, গাইবান্ধা, রংপুর। ১৯৬৫ সালে সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ। মাসিক ‘গতি' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯৬৬ সালে আই-এস-সি পাশ করার পর রেডিও পাকিস্তানের টেকনিক্যাল অপারেটর পদে যোগদান এবং চাকরিরত অবস্থায় চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে ১৯৭০ সালে গ্রাজুয়েট হন ।

রাশেদুল হোসেন (মোঃ রাশিদুল হোসেন, বি এস-সি)। জন্ম ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। ১৫ মার্চ ১৯৬৮ তারিখে রেডিও পাকিস্তানে টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান করেন ।

সৈয়দ আব্দুল শাকের, বি এস-সি। জন্ম ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩, রামকৃষ্ণপুর, হোমনা, কুমিল্লা । ৩ জুন ১৯৬৬ তারিখে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান এবং ৩ নভেম্বর ১৯৬৮ তারিখে রেডিও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পদোন্নতি পান ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বদলি হন ।